অর্থনীতিবিদদের যুগ

ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড

অর্থনীতিবিদদের যুগ

মূল
ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড
মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদ
ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৯৮/সেপ্টেম্বর ১৯৯১

বাএ ২৫৮৫

মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

ARTHONITIBIDDER JUG, revised Bengali translation of the book, THE AGE OF THE ECONOMIST by Daniel R. Fusfeld.
Authorized translation from the English-language edition published by Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois, United States of America. Copyright © 1982 in the United Sates of America by Scott. Foresman and Company. All rights reserved.
Book published by Gholam Moyenuddin, Director, Text Book Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. Bangla Academy edition, September 1991. Price Tk. 35.00

ISBN 984-07-2594-7

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

একালে অর্থনীতি শাস্ত্র যেমন বিশাল এবং জটিল, তেমনি যে কোন দেশেই সমাজের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক বা প্রশাসকদের পক্ষে এই শাস্ত্রের চলনসই জ্ঞান থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আবার ইতিহাসের আলোকে না দেখলে অর্থনীতির বক্তব্য এবং বিতর্কেরও অনেক কিছুই বুঝতে পারা কঠিন। কিন্তু অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই আকারে অত্যন্ত বড় বা ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত, যা আমাদের দেশে অর্থনীতির ছাত্রদের পক্ষেও আয়ত্তে আনা পরিশ্রম সাপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী ইউনিভারসিটি অব মিসিগানের (অ্যান আরবর) অর্থনীতির অধ্যাপক ড্যানিয়েল রোলাণ্ড ফাস্‌ফেল্ড (জন্ম ১৯২২) রচিত অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস বিষয়ক বর্তমান গ্রন্থ 'দি এজ অব দি ইকনমিস্ট' যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা, যা সাধারণ পাঠক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ, উভয়ের জন্যই একটি অত্যন্ত সার্থক এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। অধ্যাপক ফাস্‌ফেল্ডের এই ছোট্ট বইটিতে অর্থনীতির শুরু থেকে হাল শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোর সবই মোটামুটি পক্ষপাতহীনভাবে তথ্য হিসেবে আলোচিত হয়েছে। যারা এই শাস্ত্রের অধিক অনুশীলনে আগ্রহী, তাদের জন্য লেখক গ্রন্থের শেষে একটি মূল্যবান 'অধ্যয়ন-ইঙ্গিত' দিয়েছেন। তাই বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ একটি সময়োপযোগী কাজ হিসেবে গণ্য হবে, অন্তত: এই কারণে যে অনেকেই শুধু এই একটি গ্রন্থ ভালভাবে বুঝে পড়লে একাধারে অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রধান বিষয়বস্তু এবং তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, রাজনীতিক শিল্প এবং ব্যবসায়ে যাঁরা উদ্যোগী এবং ব্যবস্থাপক, সকলেই এই গ্রন্থটির অধ্যয়নে উপকৃত হবেন, মনে করি।

এই অনুবাদে যেখানেই কোন সংজ্ঞামূলক বা টেকনিক্যাল কথার বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে শুরুতে অন্তত: একবার বন্ধনীতে মূল ইংরেজি কথাটা লিখে দেয়া হয়েছে। এই পন্থার দুটি সুবিধে, প্রথমতঃ যারা ইংরেজিতে অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থগুলোর সাথে পূর্ব-পরিচিত, তারা যাতে অনুবাদের পরিভাষায় বিব্রত বোধ না করে এতে তা সম্ভব হবে; দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ অনুবাদকের নির্বাচিত পরিভাষাগুলো গ্রহণযোগ্য বলে মনে নাও করে,

www.pathagar.com

তাদের পক্ষেও এ অনুবাদ পড়ে বুঝতে এই পদ্ধতিতে কোন অসুবিধে হবে না। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর অনুবাদ অনেক সময় নির্ভুলতা রক্ষার প্রয়োজনে ভাষার দিক দিয়ে মনোরম করা সহজ হয় না। এই অনুবাদে মূল লেখকের বক্তব্যটা তাঁর মত করেই প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে বক্তব্যটার তাৎপর্য ভুল বুঝবার সম্ভাবনা কম থাকে। বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য মনে হলে তা একাধিকবার পড়া বাঞ্ছনীয় হবে। মনে রাখতে হবে, মূল লেখক বইটি লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রে বসে এবং প্রধানতঃ সেই দেশেরই সাধারণ পাঠক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য, অনুবাদে শুধু কথাগুলো ইংরেজির বদলে বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে। সব জায়গায় তা ইংরেজির মত সহজ বোধ্য না হলে সেটা অনুবাদকের অক্ষমতার কারণে। দুই একটি কথা ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে, বুঝবার সুবিধার জন্য; ডলারকে ডলার বলা বা নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিকে নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতি বলাটা ভাল অনুবাদ কি না, সেটা বিতর্কমূলক মনে হলেও ক্ষেত্র বিশেষে, তাই করা হয়েছে। 'অধ্যয়ন-ইঙ্গিতে' গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং লেখকদের নাম ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে, যাতে ছাত্রদের পক্ষে মূল গ্রন্থগুলো প্রয়োজনে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

ফাসফেল্ডের 'অর্থনীতিবিদদের যুগ' গ্রন্থটি বিদেশে রাশিয়ান সহ অনেক ভাষাতেই অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদটা ছাপা হয় ১৯৮৪ সনে এবং ১৯৮৬ সনের মধ্যেই সবগুলো কপিই নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যেসব ছাত্রের এটা পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তাদের ব্যয়বহুল ফটো কপি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সে সময় বহু ছাপার ভুল থেকে গিয়েছিল। এবার নিজে প্রুফ দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং অনুবাদের কোন কোন অংশ আরো নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্প্রতি যে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে এবং ঐ রাষ্ট্রের খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার বিষয়টা নব্বুইয়ের দশকে ঘটেছে বলে মূল গ্রন্থের (১৯৮২) আলোচনায় এই নাটকীয় প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নাই।

বর্তমান বাংলা একাডেমী সংস্করণ প্রকাশের জন্য কপিরাইটের অনুমতিসহ অন্যান্য সহযোগিতা দানের জন্য আমি ঢাকাস্থ মারকিন কাল্‌চারাল সেন্টারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটা সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন বাংলা একাডেমী। সে জন্য তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক শ্রেণীর কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হলে অনুবাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

বাণিজ্য অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

আবদুল্লাহ ফারুক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা–১

১. অর্থনীতিশাস্ত্র এবং বাজার অর্থনীতি–১০
বাজার–অর্থনীতির শুরু–১০
ধর্ম আর অর্থনৈতিক জীবন–১৩

২. প্রারম্ভিক দিনগুলি–১৮
মার্কেন্টাইলিস্টগণ–১৯
মার্কেন্টাইলিজমের প্রতিবাদ–২৫
ফিজিওক্রাটদের কথা–২৭
অর্থনৈতিক উদারপন্থী দল–২৮

৩. অ্যাডাম স্মিথ–৩৩
দার্শনিকের জীবন–৩৪
সামাজিক দর্শনের সমস্যাঃ শৃঙ্খলা বনাম বিশৃঙ্খলা–৩৬
ইংরেজদের জীবনে ব্যক্তিতাবাদ–৩৭
প্রাকৃতিক নিয়মঃ বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রনীতির তত্ত্বে–৪০
স্মিথের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভিত্তিক ব্যবস্থা–৪২
স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার–৪৫
দুটি ব্যতিক্রম–৪৮
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি–৫০
স্মিথের অবদান–৫২

৪. প্রাচীন অর্থনীতি–৫৪
ইংল্যান্ডে ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া–৫৫
ম্যালথাস এবং জনসংখ্যা তত্ত্ব–৫৭
রিকার্ডো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি–৬১
আন্তর্জাতিক অর্থনীতি–৬৫
সে'র বাজার সম্পর্কিত সূত্র–৬৭
বেন্থাম এবং মধ্যবর্তীকালীন (হস্তক্ষেপ–সমর্থক) উদারপন্থীবাদ–৭৩
আজকের দিনে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি–৭৮

www.pathagar.com

৫. সমাজতন্ত্র ও কার্ল মার্কস—৮০
সমাজতন্ত্র ও সমসাময়িক মতামত–৮১
রবার্ট ওয়েন, নিখুঁত রাষ্ট্রের কল্পনাবাদী–৮৩
কার্ল মার্কস, বিপ্লবী–৮৬
পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের মত–৮৯
পুঁজিবাদের পতন–৯২
পুঁজিবাদ বিকাশের মার্কসীয় তত্ত্বের পরিকাল্পনিক নক্‌শা– ৯৫
পুঁজিবাদী উন্নয়ন পদ্ধতি–৯৫
মার্কসীয় কল্পনা–৯৬
মার্কস কি ঠিক বলেছেন –৯৮

৬. ব্যক্তিতাবাদের দর্শন—১০১
দর্শন–১০২
ব্যক্তিতাবাদ এবং আইন–১০৫
ব্যক্তিতাবাদের লোকাচার–১০৮
ব্যক্তিতাবাদের ফলাফল–১১২
ব্যক্তিতাবাদের সীমাবদ্ধতা–১১৬

৭. প্রাচীন অর্থনীতির পুনরভ্যুদয়—১১৮
প্রান্তিক উপযোগ এবং ব্যক্তির কল্যাণ–১১৯
অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারঃ আয় বন্টন–১২৩
উন্নতি আর মন্দা ঃ ব্যবসায়ের চক্র–১২৫
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি–১২৮
পুঁজিবাদের চিন্তাধারা–১৩২

৮. মানব পরিবার—১৩৬
পোপের অর্থনীতি–১৩৮
জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের দার্শনিকগণ–১৪১
ভেবলেন্ এবং কমনস্–১৪৫
দি নিউ–ডিল–১৫২

৯. কেইন্‌সীয় বিপ্লব—১৫৯
জন মেনার্ড কেইন্‌স–১৬০
ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের জনমত–১৬৪
দি জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট–১৬৯

www.pathagar.com

কেইনসের তত্ত্বের পরিকল্পনীয় নক্‌শা–১৭২
মৌলিক সম্পর্কসমূহ–১৭২
কেইন্‌সীয় অর্থনীতির অর্থ–১৭৪

১০. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা–১৭৬
সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিকল্পনা–১৭৭
পরিকল্পনার তত্ত্ব–১৮৪
স্বল্পোন্নত জাতিসমূহের পরিকল্পনা–১৮৮
চীন দেশের অর্থনীতি–১৯৩
ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতির পরিকল্পনা–১৯৬

১১. মিশ্র অর্থনীতি–২০০
ধনতন্ত্র কি টিকে থাকবে –২০১
পরিবর্তনশীল অর্থনীতি–২০৪
বৃহৎ ব্যবসা, বৃহৎ–শ্রমিক আর বৃহৎ–সরকার–২০৮
নিও–ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ–২১৪
রক্ষণশীলদের ভিন্নমত–২২০
জন কেনেথ গলব্রেথ ঃ উদারপন্থী সমালোচক–২২৫
আমূল–সংস্কারমূলক অর্থনীতি–২২৮

১২. সাম্প্রতিক সংকট–২৩৪
বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি–২৩৬
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমস্যা–২৪০
আন্তর্জাতিক অর্থনীতি–২৪৩
মতবাদের সংঘাত এবং সামরিক ব্যয়–২৫০
তিনটি চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব–২৫২
একটি নতুন দৃষ্টান্ত–২৫৯
পুরনো মদের জন্য নতুন বোতল–২৬৪
ভবিষ্যতের অর্থনীতি–২৬৭

অধ্যয়ন ইঙ্গিত–২৭১

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

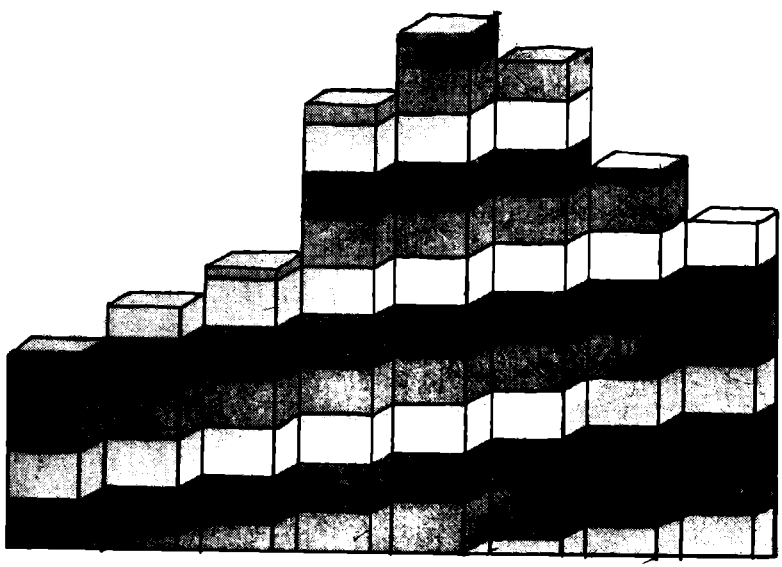

এডমন্ড বার্ক অষ্টাদশ শতাব্দীকে "অর্থনীতিবিদদের যুগ" আখ্যা দিয়েছিলেন এবং কথাটা আমাদের বর্তমান সময়ের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। বিগত দু'শ বছরের প্রধান সামাজিক দর্শনসমূহ অর্থনীতিবিদদের লেখার দ্বারাই সংজ্ঞায়িত হয়েছে। আধুনিক কালের প্রধান মতাদর্শগত বিতর্কের সাথে অ্যাডাম স্মিথ, কার্ল মার্কস এবং জন মেনার্ড কেইনসের মত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের মৌলিক চিন্তাধারা জড়িত রয়েছে; এঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কারণে নয়, বরং প্রধানত তাঁদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সামাজিক দর্শনের জন্যই।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা কেইন্‌স নিজেও ভালভাবেই বুঝেছিলেন এবং যে-সকল মতবাদকে তিনি ভুল এবং ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করতেন, তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ

"সাধারণত অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে লোকে যতটুকু প্রভাবশালী বলে মনে করে, আসলে প্রভাবটা তার চেয়ে অনেক বেশী, তা সেগুলো সঠিকই হোক আর ভ্রান্তই হোক। সত্য বলতে কি, দুনিয়াটা এর দ্বারাই চালিত হচ্ছে। আটপৌরে মানুষেরা অনেকেই মনে করে যে তারা মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না, কিন্তু দেখা যাবে আসলে তারা কোন না কোন ভুলে-যাওয়া অর্থনীতিবিদের অন্ধ ভক্ত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অনেক উন্মাদই যখন ধারণা দেয় যেন সে গায়েবী আওয়াজ শুনছে, একটু তলিয়ে দেখলেই জানবেন, আসলে সে কয়েক বছর আগের কোন পণ্ডিত লেখকের কথা পাতন করেই নিজের উন্মাদনা রচনা করছে।"

অর্থ, সম্পদ আর ভোগ্য সামগ্রীর আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ এই পৃথিবীতে অর্থনীতিবিদরাই হয়ে পড়েন মহা পুরোহিত। মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মত তাঁরাই বলে দিলেন যে ধর্মনিরপেক্ষ জগতে জনগোষ্ঠী, ব্যক্তি এবং প্রকৃতির মধ্যে অথবা ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত। প্রায়শঃ তাঁদের ঐ রহস্যমূলক আর জটিল সব তত্ত্বকথাকে লক্ষ মানুষের বোধগম্য লোকাচারবিদ্যা আর জাতিসমূহের গৃহীত কর্মপন্থায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। যদিও সাধারণতঃ তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি পরিবেশে, কিন্তু হালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদেরকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল হতেও দেখা গেছে। বস্তুতঃ আধুনিক জগতের উপর অন্য যে কোন একটি শাস্ত্রেরই এতটা প্রভাব খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এমনটা কিন্তু চিরকাল ছিল না। মাত্র দু'শো বছর আগেই অর্থনীতিবিদ বলতে তেমন নাম করা কেউই ছিল না, এবং তখন অর্থনীতি শাস্ত্রটা ছিল নৈতিক দর্শনের একটি শাখা মাত্র। আজকের দিনে অর্থনীতি বলতে আমরা যা বুঝি, তা তখন ছিলই না, যা ছিল সেটাকে বলা হতো 'পোলিটিক্যাল ইকনমি' অর্থাৎ এটা ছিল প্রধানতঃ জাতীয় নীতি বা কর্মপন্থার একটি অঙ্গ এবং এতে বিবেচনার বিষয়গুলি ছিল কর-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, বৈদেশিক বাণিজ্য বা ঐ ধরনের কিছু।

অল্প কিছু দিন আগে পর্যন্তও অর্থনীতিই ছিল একমাত্র সামাজিক বিজ্ঞান, যাতে একটা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বমালা গড়ে উঠেছিল। যেগুলি প্রত্যেক

www.pathagar.com

পেশাধারী ব্যক্তিই স্বীকার করে নিতেন। অবশ্য এটা ঠিক যে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ছিল এবং তাঁরা রসিকতা করে বলতেন যে কোন একটা প্রসংগে চারজন অর্থনীতিবিদকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা পাঁচ রকম মত দেবেন ; কিংবা সেই যে বুড়ো অধ্যাপকের গল্প আছে, যিনি ফি বছর ছাত্রদের পরীক্ষায় একই প্রশ্ন করতেন। কিন্তু উত্তর বদলাতে হতো। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক কোন্দল ছিল, অবশ্য সেটা এই বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলির বিষয়ে নয়। মত পার্থক্য ছিল নীতির প্রয়োগ নিয়ে, বিশেষ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মপন্থা নিয়ে এবং একটি পরিস্থিতিতে কোন উপাদানটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে।

এই নিয়মের একটি প্রধান ব্যতিক্রম ছিল, সে হলো মার্কস্‌বাদীরা, যারা মনে করতো যে পাশ্চাত্য অর্থনীতি শাস্ত্রটাই হচ্ছে একটি শোষণমূলক ব্যবস্থার সমর্থনে খাড়া-করা যুক্তিবিশেষ। তারা মনে করতো, পুঁজিবাদের সম্পর্কে তাদের নিজেদের বিশ্লেষণটাই ঠিক, যাতে পরিষ্কার দেখা যেত যে ঐ অর্থনীতির ত্রুটিগুলিই একদিন গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবে। পাশ্চাত্য অর্থনীতির প্রতি তাঁদের এই ঘৃণার জবাবে নিষ্ঠাবান অর্থনীতিবিদদের মনোভাবও ছিল একই রকম তীব্র, তাঁদের বিবেচনায় মার্কসবাদের তত্ত্ব এতই ভুল ছিল যে তাঁরা আর ওটা কখনো পড়ে দেখাও উপযুক্ত মনে করলেন না।

এখন অবশ্যই সেই গোঁড়া অর্থনীতির স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলিই বিপদের সম্মুখীন। এতে যেসব প্রশ্নের এবং সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতো, যেমন খোলা বাজারের অর্থনীতির কার্যক্রম, কিভাবে প্রাচুর্য অটুট রাখা যায়, এ সবের বদলে এখন নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার উত্তর এই শাস্ত্রে উপস্থিত পাওয়া যাচ্ছে না। বৃহদাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বৃহদাকার সরকার আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃহদাকারের ইউনিয়ন এ কালে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আসল নিয়ন্ত্রকরূপে সামনে এনে দিয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর প্রাচুর্য সাথে করে আনে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ (pollution) আর জ্বালানী শক্তির সমস্যা। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ব্যাপারটাতো বিশেষভাবে এমন একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে, যার সমাধান দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ যেহেতু সসীম, সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধিরও একটা সীমা আছে বলে মনে হয়। তার অর্থ এই যে, আমাদের কর্তব্য উন্নয়ন কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ভাবনা না করে, তার বদলে সীমিত সম্পদ কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হওয়া। মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে আয়-সম্পদের বৈষম্য অধিক হলে তা থেকে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক আর মতাদর্শগত বিতর্ক উঠে পড়ে। তা হলে অর্থনৈতিক সুযোগের বন্টন কিভাবে ঘটে থাকে? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই এর ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর পরিবর্তন হচ্ছে, তাই তার সমস্যাগুলিরও পরিবর্তন হচ্ছে, আর তাই আমাদের এই শাস্ত্রেরও সামনে আসছে নতুন সমস্যা। আজকের এই ঘটনা-প্রবাহের চুল্লিতেই আকার পাবে ভবিষ্যতের অর্থনীতি শাস্ত্র। তা ছাড়া গোঁড়া অর্থনীতিবিদরা তাদের মতাদর্শের সমালোচকদের এই চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবিলা করবেন, তার উপরই নির্ভর করে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন আর চেহারা।

এই প্রক্রিয়াতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই, কারণ অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান আর এর ক্রমবিকাশে আদর্শগত বিতর্কটা সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে যে, সামাজিক কর্মপন্থা সম্পর্কিত রাজনৈতিক বিতর্ক থেকেই জন্ম নিল অর্থনীতি শাস্ত্রের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান। এ দিক দিয়ে পদার্থবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যার মত যেসব বিজ্ঞানে কোন ঘটনা থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একের পর এক তত্ত্ব এসেছে, আবার ঐ আবিষ্কৃত তত্ত্ব থেকে পুনরায় পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন বড় তত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে, সেগুলির সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসহ অর্থনীতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান এবং পদার্থ বিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রেই কতকগুলি পরস্পর সম্পর্কিত অংশের ব্যাখ্যা করার জন্য খণ্ড খণ্ড চিন্তাধারার বা 'সিস্টেমের' একত্রীকরণের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। জড় বিষয়ক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিরাট কাঠামোর উদ্ভব হয়েছে মূলতঃ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা এবং তার প্রমাণগুলিকে সাজানো বা শ্রেণীবদ্ধ করার মাধ্যমে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এই উৎসের সাথে যোগ করা হয়েছে সুপরিচিত রাজনৈতিক আর দার্শনিক বিতর্ক সমূহ।

মতাদর্শগত ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেমের (পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত যুক্তি জালে) নিজস্ব সংজ্ঞা, প্রমাণাদি এবং যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বমালা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আজকের অর্থনীতির অনেক মূল্যবান অংশ।

অ্যাডাম স্মিথ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ ধরনেরই একটি 'সিস্টেম' হিসেবে তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করেছিলেন এবং বাজার সম্পর্কের ওপর তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন সেইগুলির দ্বারাই গড়ে উঠেছিল আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের সর্ব প্রথম গ্রহণযোগ্য সাধারণ নীতিমালা। মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা (laissez faire) মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই যুক্তিমালা উনবিংশ শতাব্দীর

www.pathagar.com

মাঝামাঝি সময়ে মার্কস্ এবং অন্যান্য কর্তৃক অস্বীকৃত হয়, আর শতাব্দীর শেষের দিকে কিছুটা পুনর্গঠন করে নেবার পর একটা নয়া গোঁড়া মতবাদ হিসেবে ১৯৩০ সন পর্যন্ত চালু থাকে। অতঃপর জন মেনার্ড কেইন্স প্রায় সম্পূর্ণ এককভাবেই জাতীয় আয় সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেন এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের নীতির যৌক্তিকতা দেখান। শেষে উল্লিখিত এই দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে কয়েক ধরনের লেখক তৎকালীন অর্থনৈতিক সমাজ ও তত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে এ কালের জনকল্যাণ-মূলক নীতিগুলির ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে সেগুলি হয় তদানীন্তন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আয় এবং সম্পদের বন্টন এবং তার ক্ষমতার কাঠামোকে সমর্থন করা, না হয় তার সামালোচনা। তবুও এসব যুক্তিতর্ক অর্থনৈতিক জীবনের জটিলতাকে বুঝতে এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে সহায়ক হয়।

তাই এটা মানতেই হবে যে অর্থনীতির বিকাশে মতাদর্শ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ। মতাদর্শ ছাড়া বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতো না এবং যেহেতু বৈজ্ঞানিক অর্থনীতি মতাদর্শ ঘটিত বিতর্কের আগুনে পুড়েই তার আকার প্রাপ্ত হয়, তাই এতে সর্বদাই উচ্ছ্বাসের প্রকাশ থাকবেই, তা এর প্রবক্তারা একে যত 'খাঁটিই' করে রাখার চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ হলো অর্থনৈতিক তত্ত্ব আর বাস্তব জগতের সমস্যাগুলির মাঝে সম্পর্ক। সর্বত্রই মানুষ খুঁজেছে প্রাচুর্য, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা আর শৃংখলা, আত্মোন্নতি আর সামাজিক মংগল। এ সকল উদ্দেশ্য যা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী (অর্থাৎ একটি পেতে চাইলে অপরটি পাওয়া যায় না) সেগুলি পেতে হলে পছন্দ বা বাছাই করার দরকার পড়ে এবং এ পছন্দ করার তত্ত্ব (Theory of Choice) হলো অর্থনীতির একটি প্রধান অংশ। অর্থনীতি বিজ্ঞানের একটি সূত্র এই যে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তটা যত বড় হবে, আমাদের পছন্দ করবার জন্য তত অধিক পরিমাণে বিকল্প পাওয়া যাবে, আর সহজতর হবে একাধিক আকাঙ্ক্ষার পূরণ। সমাজ অবাধ্য প্রকৃতিকে যত দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলো, অর্থনৈতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর সম্ভাব্য পন্থাগুলিও ততই বেশী হতে লাগলো, আর সেই জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্মনীতিও ততই অধিক গুরুত্ব লাভ করলো। নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থেকে আসে বেছে নেবার সুযোগ, আর এই পছন্দ করার সুযোগ থেকেই এলো রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা ! কর্মপন্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ডাক পড়লো অর্থনীতিবিদদের,

www.pathagar.com

যাতে তারা বিশ্লেষণ করে উপদেশ দিতে পারে, এবং বেছে নেবার উপায় হিসাবে বিজ্ঞানসম্মত পন্থাও উচ্চারণ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আমেরিকানরা একটি বিতর্কের সম্মুখীন হয়। ইউরোপের পূনর্গঠনের সাহায্য হিসেবে একটি ব্যাপক ঋণদান প্রকল্প চালু করা উচিত হবে কি না। অবশ্য, এই বিতর্ক শুধু পণ্ডিতদের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো, যদি যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন নিজের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর পর তার বৈদেশিক সাহায্য দেবার মত কিছু উদ্বৃত্ত না থাকতো। যেহেতু তেমন বাড়তি বা উদ্বৃত্ত ছিল, তাই অর্থনীতিবিদদের ডাকা হলো, যাতে তাঁরা উপদেশ দিতে পারেন, সর্বোত্তম কোন উপায়ে এটা সরবরাহ করা উচিত (সরকারী অথবা বেসরকারী মাধ্যমে) এর প্রকৃতি কেমন হবে (ঋণ হিসাবে না দান হিসাবে দেওয়া হবে), আর এটা বিতরণ করা হবে কিভাবে (এতে ভোগ্যপণ্য অথবা কলকব্জা কিম্বা উভয় রকমই থাকবে)। এগুলো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এখানে কাজটা হচ্ছে একাধিক বিকল্প পন্থা থেকে কিছু বেছে নেয়া।

অর্থনীতি শাস্ত্রের উন্নয়নে তৃতীয় প্রসংগটি (theme) হলো প্রচলিত জনমতের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একটি সমস্যার বিশ্লেষণ কখনো শূন্যের মধ্যে হতে পারে না। তত্ত্ব বা থিওরীর কাজ ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যকে একটি নিয়মের মাধ্যমে সংগঠিত করবার পটভূমি তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু সমস্যার যে সমাধান দেওয়া হবে, তা বাস্তব ভিত্তিক এবং তা জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে হবে। অর্থনীতি শাস্ত্রকে যদি প্রয়োজনীয় করে তুলতে হয় তবে যে কোন যুগের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলিকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আর ভাবনার সাথে সম্পর্কিত থাকতে হবে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় আর যুক্তিসংগত ফল পাওয়া চাই। এ দিক থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রটা সর্বদাই ছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy)।

পণ্ডিতরা অনেক সময় এই মতামতের আবহাওয়াটাকে উপেক্ষা করে থাকেন। তাঁরা ধারণা বা মতবাদের উৎস অনুসন্ধান করেন তাঁদের পূর্বসূরী পণ্ডিতদের কাজের অগ্রগতিতে; অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের ধারণার ক্রমবিকাশ হয়েছে যেভাবে, সেভাবে সকল আধুনিক ধ্যান-ধারণার উৎস পাওয়া যাবে যেমন হয় ওল্ড টেস্টামেন্টে, ঈসপের গল্পে নয়তো উপনিষদে। এক হিসেবে কাজটা যুক্তিসংগতই, কারণ সেকালের লোকেরা তো আমাদের মতই বুদ্ধিমান ছিল; অনেক ক্ষেত্রেই তো দেখা যায় যে

www.pathagar.com

কোন ধারণা যদি ভাল হয়, তবে কথাটা আগেও কেউ ভেবেছে। কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা মানতেই হবে যে মতবাদটা প্রথমে কবে সৃষ্টি হয়েছিল, তার চেয়ে বরং আজকে কেন তা এত গুরুত্বপূর্ণ এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন। পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে, ঐ মতবাদ এখন কি কাজে লাগবে, যারা ওটা সমর্থন করবে তাদের ওতে কি উপকার হবে তার উপর। আর সমাজে যারা ঐ মতবাদের প্রভাবে পড়বে তাদের অন্যান্য ধারণা বা বিশ্বাসের সাথে ওটা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না ইত্যাদি সুবিধের উপর। মতবাদের যুক্তিযুক্ততার চাইতে তার টিকে থাকার জন্য বেশী দরকার মতামতের ঐ পরিবেশটার সমর্থন, সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তুলনায় অর্থনীতি শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এটা বেশী কার্যকর। তার কারণ অর্থনীতি আর রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অর্থনীতিবিদরা যে যুগে বাস করেন সেটা অস্বীকার করা বা এড়িয়ে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, বলতে গেলে প্রশ্নটা সময়ই তুলে ধরে, আর সমাজের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই অন্ততঃ কিছুটা এক-এক জন অর্থনীতিবিদও বটে।

চতুর্থ প্রসঙ্গ হচ্ছে অর্থনীতিকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলা। আড়াইশ বছরে অর্থাৎ এক মিলেনিয়ামের চতুর্থাংশ সময় ধরে কিভাবে বাজার কাজ করে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধর্ম, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিমাণ নির্ধারক চালকসমূহ ইত্যাদি বহু বিষয়েরই একটি মৌলিক নীতিমালা গড়ে উঠেছে। অপরাপর বিজ্ঞানের মতই অর্থনীতিতেও একটি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণাগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং যে-নিয়মের মাধ্যমে অনুমান বা হাইপোথিসিসগুলির পরীক্ষা, পরিবর্তন বা সমর্থন করা যাবে তা স্থির করা হয়েছে। কয়েক পুরুষ ধরে তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদরা একটি নিয়মমাফিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, প্রমাণিত সিদ্ধান্তসমূহ এবং কতকগুলি ব্যাপক-ভিত্তিক সূত্র গড় তুলেছেন।

কোন শাস্ত্রের ইতিহাস লেখার সময় অনেকে এমন ধরে নেন, যেন সম্পূর্ণ অতীতটাই একটি গৌরচন্দ্রিকা, যার শেষে অনিবার্যভাবে বর্তমানের স্বীকৃত সত্যগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে অর্থাৎ কি না ভবিষ্যতেও এই ধারাটা চলতেই থাকবে এবং বিজ্ঞানীরা ক্রমশঃ বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধির দিকে এগোতে থাকবেন। অর্থনীতি শাস্ত্রের জন্য এটা কিছুটা সত্য। বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি কিভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে একশ বা দু'শ বছর আগে আমরা যা জানতাম তার চেয়ে এখন আমরা অনেক বেশি জানি। কিন্তু এই ধারণাটাকে বেশী সহজ করে দেখা হচ্ছে। অতীতের মানুষেরা আমাদের মতই বুদ্ধিসম্পন্ন

www.pathagar.com

ছিল, আর যদিও সে সময় প্রকৌশল ছিল একালের তুলনায় অনেক সরল তবুও তাদের জীবনের সমস্যাগুলি কিন্তু ছিল একালের মতই জটিল। সে দিনের দুনিয়া আজকের দুনিয়া থেকে আলাদা ছিল আর সেই দুনিয়া সম্পর্কে তাদের মতামত ছিল আমাদের থেকে ভিন্ন। কাজেই সেকালের সামাজিক তত্ত্বগুলিও আমাদের একালের তত্ত্ব থেকে ছিল আলাদা। আর আমাদের তত্ত্বগুলি তাদের চেয়ে ভাল কি না সেটা বিতর্কমূলক।

উদাহরণস্বরূপ, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে 'ক্লাসিক্যাল' বা প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা তাঁদের বিশ্লেষণে উৎপাদন এবং বন্টনের উপর জোর দিতেন এবং ধরে নিতেন যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রাটা কোন ভাববার মত সমস্যা নয়। আজকের দিনে সেই মত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং উৎপাদনের উপর জোর না দিয়ে বরং বিনিময়ের উপর জোর দেয়া হচ্ছে, চেষ্টা হচ্ছে কিভাবে উৎপাদনের পরিমাণকে "পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ" (full employment) মাত্রায় রাখা যায়। কেউ অবশ্য দাবী করতে পারে যে প্রাচীন (classical) অর্থনীতি ছিল আমাদের আজকের আবিস্কৃত সত্যের গৌরচন্দ্রিকা। কিন্তু সেটা হবে সেকালের আর একালের উভয় অর্থনীতিরই ভুল ব্যাখ্যা। আর যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা বাজার ভিত্তিক অর্থনীতির সম্পর্কে বর্তমান সিদ্ধান্তসমূহে পৌছেছি, তারও হবে এটা একটা অপব্যাখ্যা। তার ফলে আমাদের ভবিষ্যৎকে বুঝবার পথও ভুল হয়ে যাবে। কারণ অতীত যদি সত্যই প্রস্তাবনা মাত্র হয়, তবে আমরা জানি, আজকের দিনের অনেক সত্যই ভবিষ্যতে মিথ্যে বলে গণ্য হবে।

অর্থনীতি একটা চির-পরিবর্তনশীল শাস্ত্র। মানব-সমাজ কিভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত সেই মহান বিতর্কেরই অংশ হিসেবে এই শাস্ত্রের জন্ম, কিন্তু সে বিতর্কের ফলাফলও অনেকটা এই শাস্ত্রের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে। অর্থনীতি আংশিকভাবে ভাবাত্মক সত্যের তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও এর মূলে রয়েছে সরকারী কর্মপন্থার বাস্তবতা আর জনমতের পরিবেশ। যদিও একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (system) কিভাবে এবং কেন কাজ করে, অর্থনীতি তার ব্যাখ্যা দেয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বারা এ শাস্ত্র প্রভাবিতও হচ্ছে। অর্থনীতি শাস্ত্রটা ধরতে গেলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক মতবাদ, রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা আর স্বীকৃত সত্যসমূহের এক জটিল মিশ্রণ।

তবুও বহু সাধারণ এবং অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম ছাড়া এ শাস্ত্রটি তার বর্তমান উন্নয়নের স্তরে পৌছতে পারতো না। অর্থনীতির কাহিনী যুগপৎ কোন স্কটিশ্ দার্শনিক, লন্ডনের শেয়ার-বাজারের কোন দালাল, বিশপ ধর্মযাজক,

www.pathagar.com

জার্মান দার্শনিক, একজন বিপ্লবী, কেমব্রীজের অধ্যাপক, নরওয়েজাত-মার্কিন সন্দেহবাদী এবং অমন আরও অনেকেরই কাহিনী। এই কাহিনীতে তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস, তাঁদের শক্তি, দুর্বলতা, তাঁদের সাফল্য এবং পরাজয়সমূহের প্রতিফলন রয়েছে। বর্তমান আলোচ্যটা তাঁদের কাজের বর্ণনা এবং যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান ও বিধি-নিয়ম গড়ে উঠেছে সে-সবের বর্ণনা। এতে আরও থাকবে আমাদের জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আমাদের যে বর্তমান চিন্তাধারা, সেই পর্যায়ে কেমন করে আমরা পৌঁছলাম তার কথা।

আজকের দিনে উপরোক্ত সবগুলো শক্তিই কাজ করে চলেছে, কারণ অতীতে অর্থনীতি শাস্ত্র সময় সময় যেমন সংকটে পড়েছে এবং যার ফলে এই শাস্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, আজ আবার তেমনি তা এক সংকটের সম্মুখীন পরিবর্তনশীল জগতে নতুন সব প্রশ্নের উদ্ভব, আদর্শগত দ্বন্দ্ব আর জ্ঞান সীমান্তের বিরামহীন তাত্ত্বিক অগ্রগতি, এসবের মাঝে অর্থনীতিবিদগণ তাঁদের কতকগুলো মৌলিক ধারণা এবং সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। আগের দিনের অনেক ধারণাই অবশ্য এখনো কাজে লাগছে বা সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। আজকের দিনে এই গোটা শাস্ত্রটাই এক দিশেহারা অবস্থায় পড়েছে, আর সারা পৃথিবীর অর্থনীতিবিদরা একালের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বিজ্ঞানের প্রধান সূত্রগুলো পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে আরম্ভ করেছেন। আর এই প্রক্রিয়া থেকেই জন্ম নিচ্ছে আগামী দিনের অর্থনীতি শাস্ত্র।

www.pathagar.com

১

অর্থনীতি শাস্ত্র এবং বাজার-অর্থনীতি

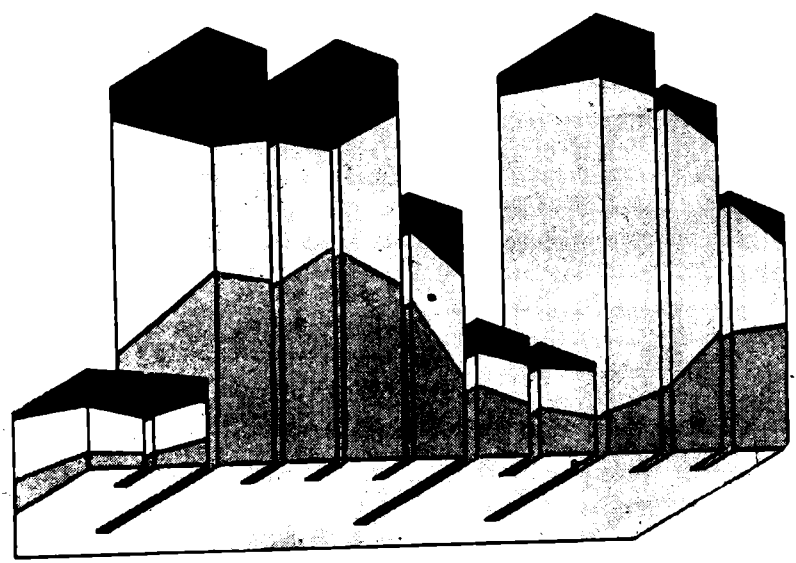

বাজার-অর্থনীতির শুরু

আধুনিক বাজার–অর্থনীতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে অনেকে বুঝতেই পারেন না যে এটা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ব্যাপার। পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত একটা বাজার–ব্যবস্থা, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠান। যে বাজারের মাধ্যমে

www.pathagar.com

জিনিসের দাম, উৎপাদনের পরিমাণ আর প্রত্যেকের উপার্জন নির্ধারিত হচ্ছে, এমন একটা ব্যবস্থায় যেখানে ব্যক্তি বিশেষের একক প্রভাব নেই, ব্যাপক আকারে এই অর্থে বাজার ব্যবস্থাটা কিন্তু মধ্যযুগ শেষ হবার পর অর্থাৎ মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে দেখা যাচ্ছে। তার আগে ইউরোপের বেশীর ভাগ লোকেরাই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাস করতো, তার ভিত্তি ছিল এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে অর্জন-প্রবণ মুনাফা-কেন্দ্রিক ক্রয়-বিক্রয় প্রধান অর্থনীতির বদলে প্রত্যেক মানুষের ছিল কতকগুলো অধিকার ও প্রতিদানে ছিল কিছু কর্তব্য বা দায়িত্ব।

সমাজ ও অর্থনীতির এই রূপান্তর তৎকালীন কারো কারো চোখেও পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, টমাস বেকন্ নামক ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের একজন ধর্মযাজক সে যুগের ক্রমবর্ধমান জড়বাদকে নিন্দা করেন এবং যেসব লোক 'নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার অনুসন্ধানে লিপ্ত, তাদেরকে লোভী, মেষপালক আর রাখাল সুলভ স্বভাবের ভদ্রলোক' বলে তিরস্কার করেন। এর পঞ্চাশ বছর পর, এমন কি খানদানী লোকেরাও কিভাবে এই পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে টমাস উইলসন লেখেনঃ

"যে সব ভদ্রমহোদয় আগে যুদ্ধ-বিগ্রহাদিসহ মহান বিষয় নিয়ে মেতে থাকতেই অভ্যস্ত ছিলেন, এখন তাদের অনেকেই চাষা হয়ে যাচ্ছেন। জমির উন্নতি হয় কি করলে, এমন সব নেহায়েত গ্রাম্য আর চাষাড়ে ভাবনায় তাঁরা দক্ষতা অর্জন করছেন, ফলে তাঁদের অনেকেই জমির বন্দোবস্তের সময় শেষ হলেই হয় নিজেরাই চাষ করবেন, না হয় যারা সব চেয়ে বেশী লাভ দেবে, তেমন লোকদেরকে নতুন বন্দোবস্ত দেবেন।"

বেকন আর উইলসনের নজরে যা পড়েছিল তা ঐ সময়ের আরও অনেকে দেখতে পান। প্রত্যেক মানুষের যেখানে তার জন্ম হয়েছে আর যে কাজ সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, সেই স্থানে আর কাজে জীবনকাটানোর যে প্রাচীন পদ্ধতি ছিল, তা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। বহুকাল ধরে নিজেদের শ্রম এবং কৃষির ফসল জমিদারীর (manor) সামন্ত প্রভুর হাতে তুলে দিতে অভ্যস্ত ছিল যে কৃষক সমাজ, তারা ক্রমবর্ধমান হারে টাকার খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নেয়া আর ফসলের একটি অংশ নগদ বিক্রি করে খাজনার টাকা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। সামন্ত লর্ডরা আগের তুলনায় ঐ খাজনা হিসেবে পাওয়া নগদ টাকা এস্তার খরচ করে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে লাগল, আর অধিক চেতনাসম্পন্ন ভূমি মালিকরা উল এবং ঐ রকম যেসব সামগ্রী বিক্রয় করা সহজ, তেমন

www.pathagar.com

সামগ্রী অধিক উৎপাদন করলো। কেউ কেউ ক্রমশঃ জমির খাজনা বাড়িয়ে ছিল, ফলে প্রজারা বাধ্য হয়ে যেসব ফসলের দাম বেশী, সেগুলোই উৎপাদন আরম্ভ করেছিল। বাজারের প্রসারের ফলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা, সম্পদ আর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মধ্যযুগ অর্থাৎ প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টাতে যে কোন ব্যবসাবাণিজ্য আর বাজার ছিল না তা নয়, কিন্তু ঐ সময়ের ব্যবসা ছিল দূরদেশের সাথে, এক অঞ্চলের সাথে আর এক অঞ্চলের এবং বিনিময় হতো শুধু ধনীদের আর রাজপরিবারদের ব্যবহার্য বিলাস সামগ্রীর। কৃষকরা ছিল গ্রামের বাসিন্দা আর মোটামুটি স্বনির্ভর, উৎপাদনের বাড়তি এক অংশ সামন্ত লর্ডকে (lord) দিত, কখনো শ্রমের আকারে, আবার কখনো বা নগদেও সেটা দিতে হত। এই উদ্বৃত্তটাই ছিল সম্ভ্রান্ত মানুষের বিলাস-দ্রব্য ক্রয়ের উৎস, যা দিয়ে কেনা হতো মিহি বস্ত্র, ধাতু দ্রব্য, মদ এবং অন্যান্য আনন্দ-সামগ্রী। এক ধরনের দ্বৈত অর্থনীতি গড়ে উঠে, যার একদিকে ছিল কৃষিভিত্তিক পল্লী এবং অপর দিকে ছিল বাণিজ্যভিত্তিক শহর। এ অর্থনীতির কাজে আলোচনার বা স্বাধীন ইচ্ছার স্থান ছিল না। এ ছিল একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, যার অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলো (যেমন, ম্যানর আর গীল্ড) ঠিক করতো কিভাবে আদান-প্রদান হবে। মৌলিক গঠনের দিক দিয়ে এটা ছিল তৎকালীন সভ্য জগতের অন্যান্য অঞ্চলের (যেমন নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের) অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই অনুরূপ।

এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বাজার অর্থনীতিতে এক বিরাট রূপান্তরের কাজ শুরু হয়। পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল সুযোগের সৃষ্টি হয় এবং নব্য আবিষ্কৃত জগৎ ও প্রতীচী থেকে ইউরোপে আনা স্বর্ণ আর রৌপ্যের আকারে বিপুল পরিমাণ মূলধন চালু হয়ে যায়। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে বংশমর্যাদা আর গির্জার মর্যাদাস্বরূপ দু'টি রাজনৈতিক ক্ষমতার দুর্গ অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে গেল। নব্য শাসকদের যুদ্ধের নতুন কায়দা-কানুনে দেখা গেল বেতনভুক্ত সৈন্যবাহিনী আর বিশাল নৌবহর, যার জন্য প্রয়োজন হল বিপুল অর্থ আর উন্নত প্রশাসন। গড়ে উঠল জাতীয় কর ব্যবস্থা। সরকারের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত কর আবার সরকারী খরচের মাধ্যমেই জনসাধারণের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ফলে বাজারের সম্প্রসারণ জোরদার হলো। লন্ডন আর আমস্টার্ডামের মত শহরগুলো বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হলো, তারা

www.pathagar.com

লাভের এবং প্রবৃদ্ধির জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হলো আর দেশের সরকার স্বদেশের সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক শুল্ক আদায়ের সম্ভাবনায় তাদেরকে সমর্থন যোগাতে লাগল।

নতুন অর্থনীতি থেকে জন্ম নিল নতুন এক মনোভাব। মধ্যযুগীয় লোকেরা যারা ঐতিহ্যগত পথেই ভাবতো আর কাজ করতো, তারা শেষ পর্যন্ত ঐ নতুন বাজার মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের কাছে পরাভব স্বীকার করলো; বাজার-মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের দ্বারা জয়ী বা পরাজিত হতে লাগলো। যারা সঞ্চয় করলো, অর্জিত মুনাফা আবার ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলো, যত্ন সহকারে লাভলোকসান হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিল, এবং যারা লাভের আশায় ঝুঁকি গ্রহণ করলো, দেখা গেল তারাই জয়ী হয়েছে। বিশেষভাবে পুরাতন খানদানীদের মধ্যে বংশ গৌরবের আর সামন্তবাদী যুদ্ধ-বিবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিজেদের মূল্য সম্পর্কে যে বিরাট ধারণা ছিল তার কদর আর একদম থাকলো না। দেখা গেল, বাণিজ্যের লাভ আর বাণিজ্যের সম্পদেই ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।

এই নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই অর্থনীতি বলে একটি শাস্ত্রেরও উদয় হলো। উৎপাদন আর বন্টনের বাজার-কেন্দ্রিকতা, বস্তুতঃ ব্যক্তির সাথে সমাজের এবং এক মানুষের সাথে অপর মানুষের নতুন এক সম্পর্কের সৃষ্টি করলো। যার মূল্যবোধগুলো ভিন্ন ধরনের। নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই নৈতিকতাকে যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করে সমাজের জন্য ন্যায়-অন্যায়ের নতুন নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হলো। ধর্মযাজকগণই হলেন 'অর্থনীতিবিদের' প্রথম দল।

ধর্ম আর অর্থনৈতিক জীবন

ধর্মযাজকদের একটি ভাবনা হল, কিভাবে অর্থনৈতিক জীবনের নৈতিক ভিত্তিকে পুনর্গঠন করা যায়। মধ্যযুগের প্রাচীন ধারণাবলে অর্থনৈতিক জীবনকে ব্যক্তির মোক্ষপ্রাপ্তি এবং সমাজের সার্বিক প্রয়োজনের তুলনায় খাটো করে দেখা হতো। ধর্মযাজকগণ যুক্তি দেখাতেন যে পৃথিবীর জীবনটা আদতে চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভিকা মাত্র, আর মানুষের সকল উদ্যোগ-আচরণেই নৈতিকতার নিয়মকানুনকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া উচিত। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পর্কসহ সকল মানবিক সম্পর্কের ব্যাপারে মানুষকে সর্বদা ঈশ্বরের আইনকে মনে রাখতে হবে। গির্জার কর্তৃপক্ষ জানতো যে মানুষের খাওয়া-পরার প্রয়োজন মেটাতেই হবে আর দৈনন্দিন উৎপাদন বা বন্টনের কাজও চালাতেই হবে; কিন্তু ঐ সকল কাজ উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বসাতে হবে, জীবনের আসল কাজটা হলো

www.pathagar.com

মোক্ষপ্রাপ্তি এবং সেটা ভুলে যাওয়া চলবে না। অর্থের কারণেই অর্থ কামনা করাটা একটা পাপ, কারণ এর ফলে মোক্ষ আর নৈতিক জীবনের পবিত্রতা থেকে আমাদের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। মধ্যযুগের গোঁড়া ন্যায়দর্শনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর প্রকাশ হয়েছে একটি সুপ্রচলিত নীতি-কাহিনীতে। এক পাদ্রী রোমে তীর্থ করতে গিয়ে তাঁর গির্জার জন্য একটি রৌপ্য নির্মিত পানপাত্র ক্রয় করেন। ফেরা পথে একদল বণিকের সাথে তিনি জার্মানীতে এসে জিনিসটা তাদেরকে দেখালেন আর কত দাম দিয়েছেন তাও বললেন। বণিকরা তাকে জিনিসটার প্রস্তুত মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে কেনার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে নিজেদেরকে উপহাস করলেন যে, একজন বিষয়-বৈরাগী ধর্মযাজক এমন কম দামে জিনিস কিনতে পারলেন যা তাদের মত ব্যবসায়ীরাও পারেনি। কথাটা শুনে পাদ্রী খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিবেকের তাড়নায় আবার রোমে ফিরে গিয়ে ঐ পানপাত্র বিক্রেতাকে কথিত ন্যায্য মূল্যের বাকী পয়সাটা শোধ করলেন। সে কালে ওটাই ছিল একমাত্র নীতিসম্মত কার্যক্রম।

ঐ মনোভাব একটা প্রথা-নির্ধারিত মূল্যভিত্তিক ব্যবস্থার এবং সেকালের প্রচলিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও বাজার অর্থনীতির সাফল্য-প্রভাবিত, মুনাফা-কেন্দ্রিক ব্যবহার-বিধির মানদণ্ডে তা ছিল একেবারেই অচল। স্থায়ী কতকগুলো দলের জন্য পূর্বের সেই সৃষ্ট সমাজে এটা চললেও ধন আর মর্যাদার উন্নতিতে আগ্রহশীল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সামাজিক ব্যবস্থার সাথে এটা ছিল সামঞ্জস্যহীন।

আধুনিক যুগের শুরুতে বাজার-অর্থনীতি সৃষ্টির পর মানুষ নৈতিক বিষয়ে কিছুটা ধাঁধায় পড়ে যায়। একদিকে ধর্মের নীতি শিক্ষা ছিল এই যে, প্রত্যেকেই নৈতিক দিক দিয়ে অপর সকলের জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, ওল্ড টেস্টামেন্টের 'হাবিল-কাবিলের' গল্প আর নিউ টেস্টামেন্টের 'ভাল স্যামারিয়াবাসী'র কাহিনীতে এ শিক্ষাই পাওয়া যেত। অপর দিকে, বাজার-অর্থনীতিতে টিকে থাকার আর সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকেরই অপর সকলের চেয়ে উপরে ওঠা, অপর সকলকে পিছে ফেলা আর অপরদের উপর টেক্কা দেওয়ার প্রচেষ্টা। ভ্রাতৃভাবের চেয়ে বরং প্রতিযোগিতাই হলো আচার ব্যবহারের পক্ষে দরকারী মানসিকতা। আর নীতি হিসাবে 'খদ্দের সামাল হও' (caveat emptor) ধরনের কথা চালু হয়। বাজারের সম্পর্ক আসলে পল্লীর সেই অপরিবর্তনীয় মুখোমুখী সম্বন্ধের তুলনা নৈর্ব্যক্তিক এবং একটা ক্ষণকালীন

www.pathagar.com

ব্যাপার হয়ে গেল। মানুষের বিচার হতে লাগলো তার ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে তার সম্পদ সংগ্রহের সাফল্যের দ্বারা।

এই নৈতিক দ্বন্দ্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ আর পার্থিব সাফল্যের দ্বন্দ্ব ছিল রিফরমেশনের (ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে পোপ বিরোধী খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিপ্লব) জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ। শহরের একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে ব্যবসায়ীর জীবন অন্যান্য পেশাধারীদের জীবনের চেয়ে কম যুক্তিসঙ্গত। টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় যে 'প্রতিযোগিতা' সেটা নৈতিক আইনের বিপক্ষে যেতে পারে, ব্যবসায়ীদের জীবনের প্রধান কথা লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে সাধনা করাটা যে সাধু পুরুষদের অপছন্দ হতে পারে, এগুলো বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই সন্দেহের উদ্রেক হল। ধর্মযাজকরা মোক্ষের জন্য যে ধরনের জীবন ধারণের শিক্ষা দিচ্ছেন, সেগুলো কি ঠিক ? যাই হোক, তারাও তো আর পাঁচজনের মতই মানুষ। তাদেরও তো ভুল হতে পারে। এসব বিষয়ে বাইবেলের বক্তব্য কি ছিল ? এসব প্রশ্ন থেকেই সৃষ্টি হলো প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধ-মত, যাতে গির্জার অভ্রান্ততা সম্পর্কে সন্দেহ করে ঈশ্বরের আইন অনুসন্ধানে ধর্মযাজকদের মাধ্যমে না গিয়ে সোজা বাইবেল পড়ে দেখাই উচিত বিবেচনা করা হলো।

এখানে 'রিফরমেশনের' ধর্মীয় যুক্তিটা আমাদের কাছে তেমন কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, তবে ও থেকেই জন্ম নিল সেই নব্য অর্থনৈতিক নীতিশাস্ত্র। যাতে মুনাফাভিত্তিক বাজার-অর্থনীতি প্রয়োজনীয় নৈতিক সমর্থন পেল। এ নতুন নীতিমালার প্রধান কথাটা এই যে, ঈশ্বর তাঁর অসীম জ্ঞান থেকে প্রত্যেক মানুষের জন্যই এ পৃথিবীতে একটা করে স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে মানুষ তার নিজের ভাগ্যকে গড়ে নিতে পারে। এ নির্দিষ্ট 'স্থান' বা পেশাটা কিন্তু চাইতে হবে এবং নিজের আত্ম-অনুসন্ধান দ্বারা খুঁজে বের করতে হবে এবং একবার পেলে, মন দিয়ে তা অনুসরণ করতে হবে। মোক্ষলাভ হবে নিজের পেশায় কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে, তা সে পেশা যেটাই হোক, এমন কি সওদাগরের কাজও ঈশ্বরের চোখে অন্য যে কোন পেশারই মত। কিন্তু মানুষ তার নিজস্ব পেশা চিনে বের করবে কি করে ? ধর্মগুরুরা এবার উত্তর দিলেনঃ কিছুটা বিবেকের অনুভূতি থেকে আর কিছুটা সাফল্য দেখে। জাগতিক সাফল্য থেকেই বোঝা যায়, মানুষটি তার নিজের পেশা খুঁজে পেয়েছে কিনা আর তা ঈশ্বরের সমর্থন পেয়েছে কিনা। সাফল্য লাভ করতে হলে, আলস্য পরিহার কর, লোভ আর বিলাস পরিত্যাগ কর.... কঠিন পরিশ্রম কর এবং সঞ্চয় কর। অর্থ

www.pathagar.com

শতাব্দীর ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, বক্তৃতা আর বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক ব্যবহারবিধিগুলোর এই ছিল ব্যবস্থাপত্র। তার দ্বারা শহরের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন মেটে, পরিশ্রম করার আর পুঁজি সঞ্চয়ের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এ নব্য অর্থনৈতিক যুক্তিমালার সাথে ধর্মীয় সমর্থনের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় এবং এটা একটা সার্বজনীন জীবনধারায় পরিণত হয়ে পড়ে। মার্কিন তাপস বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন যে কথাগুলো ছন্দ করে বলেছিলেন, তা যুগ যুগ ধরে তরুণ সমাজ পুনরাবৃত্তি করতে থাকেঃ

"সকাল সকাল ঘুমানো আর ভোরে ওঠা মানুষকে দেয় স্বাস্থ্য, সম্পদ আর জ্ঞান। তোমার ঋণদাতা যখন শুনবে ভোর পাঁচটায় বা রাত ন'টায় তোমার হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে, পাওনা টাকার জন্য তার কোন চিন্তা থাকবে না, হোক না ছ'মাস দেরী। (মনে রেখো) একটা কুঅভ্যাসে যে-অপব্যয় হয় তা দিয়ে দুই একটা সন্তান মানুষ করা যাবে।"

ধর্মনিরপেক্ষ ও জড়বাদী মূল্যবোধ ব্যবস্থা যা পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করে এসেছে, এ নতুন ন্যায়নীতিই ছিল তার ভিত্তি।

কিন্তু যদিও মানসিকতার পরিবর্তন হলো এবং প্রত্যেক মানুষের কাজের স্বীকৃত লক্ষ্য বেশী রকমে জড়বাদী হয়ে পড়লো, নৈতিকতার সমস্যাটা তবুও থেকেই গেল। অর্থনৈতিক ব্যাপারে ব্যর্থতা কি অপদার্থতার সামিল ? সাফল্য আর মোক্ষলাভ কি একই বস্তুর নামান্তর ? প্রকাশ্য বাজারে দৈনন্দিন চুক্তির দায় পরিশোধের উর্ধ্বে অপর মানুষদের প্রতি কি আমাদের আর কোনই দায়িত্ব নেই? গল্পের সেই ধর্মযাজক কি রোমে গিয়ে তার পেয়ালার মূল্য বাবদ দরদস্তুরের উর্ধ্বে বাকী পয়সাটা দোকানদারকে ফেরত দিয়ে ঠিক কাজই করেছিলেন ?

এ প্রশ্ন উঠেছে, কারণ ন্যায়শাস্ত্রের নীতি অনুসারে মানব জাতি একই গোষ্ঠী আর বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান 'খদ্দের সাবধান !" বলে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় নামার আইনসংগত অধিকার, এ দু'টির মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে। ন্যায়নীতির অনুশাসন বলছে, মানুষের উচিত অপর মানুষের সম্পর্কে কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, আর আইনের অনুশাসন বলছে, প্রত্যেক মানুষ শুধু তার নিজের স্বার্থটাই সামাল দিক।

এ নৈতিক দ্বন্দ্ব ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে আজ পর্যন্ত দার্শনিক আর ধর্ম প্রচারক উভয় দলকেই সমানভাবে বিব্রত করে আসছে। এর সমাধানের প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় বির্তকসমূহ, অষ্টাদশ শতাব্দীর 'দায়িত্ব ছাড়া অধিকার হতে পারে না' মতবাদ, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রী রচনাবলী আর বিংশ শতাব্দীর জন্য কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় আইনসমূহ। সমস্যাটির এই বিভিন্ন সমাধান প্রচেষ্টার মধ্যে যে সাধারণ বিশ্বাসটা কাজ করেছে তা এই যে, বাজার শক্তিসমূহের নৈর্ব্যক্তিক কার্যক্রমের দ্বারা ব্যক্তিকে কখনো নিষ্পেষিত আর ধ্বংস হতে দেওয়া কোন সমাজের পক্ষেই উচিত হবে না। কিন্তু উভয় সংকট রয়েই গিয়েছে, তাই অর্থনীতিবিদদের আংশিকভাবে ন্যায়-দার্শনিক হতে হচ্ছে আর দার্শনিকরাও চিন্তা-ভাবনায় অর্থনৈতিক প্রশ্নের বিবেচনা না করে পারছেননা।

www.pathagar.com

২

প্রারম্ভিক দিনগুলি

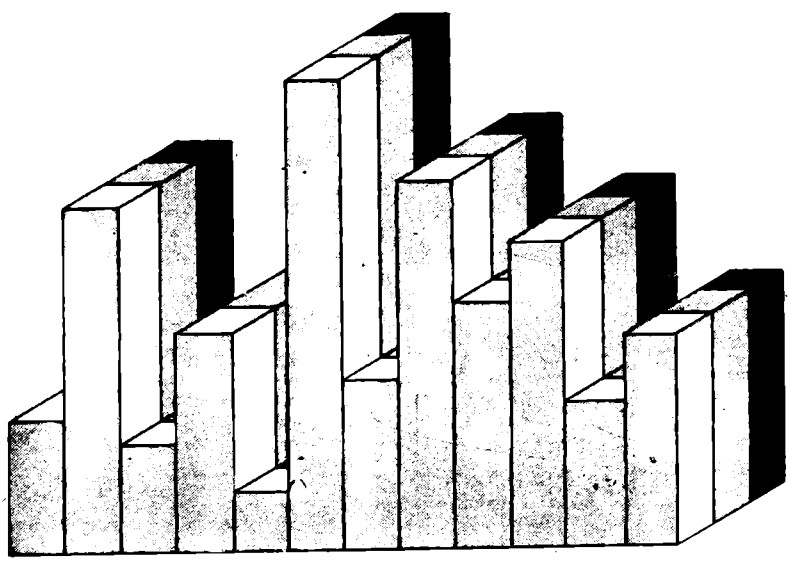

নেহায়েত ব্যবহারিক জগতে লোকদেরকেও অনেক সময় অত্যন্ত রহস্যময় বিষয়ের উপর তর্ক করতে হয়, কারণ প্রায়ই কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয় জটিল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই। এমনই একটি বির্তক সৃষ্টি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তা থেকেই পাওয়া গিয়েছিল আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি। বিতর্কের বিষয়টি ছিল, চূড়ান্ত বিবেচনায় জাতীয় সম্পদের উৎস কি ? কেউ

www.pathagar.com

মনে করতেন সেটা হচ্ছে ব্যবসা, কেউ বলতেন কৃষি এবং এ ধরনের প্রকৃতিতে পাওয়া প্রাণশক্তি, আবার অন্যেরা মনে করতেন উৎসটা হচ্ছে মানুষের শ্রম। উপর দেখলে মনে হবে এই বিতর্কের কোন বাস্তব গুরুত্ব নেই, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করত সরকারের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মপন্থা।

মার্কেন্টাইলিস্টগণ

সর্বপ্রথম মাঠে নামলেন মার্কেন্টাইলিস্টগণ (marcantilists) ষোড়শ আর সপ্তদশ শতাব্দীতে যেসব জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র (national states) গড়ে উঠেছিল সেগুলোই ছিল এই লেখকদের চিন্তার বিষয়বস্তু। তাদের দুটি ভিন্ন, অথচ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা বিবেচনা করতে হয়, প্রথমটি আভ্যন্তরীণ এবং দ্বিতীয়টি বাহ্যিক।

আভ্যন্তরীণ সমস্যাটা ছিল ঐক্য সৃষ্টির। মধ্যযুগের স্থানীয় ভিত্তিক সমাজ থেকে জাতিভিত্তিক শক্তির সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়। অর্থনীতির জন্য এর অর্থ ছিল সারা দেশের জন্য একক মুদ্রা-ব্যবস্থা, সারা দেশে ওজন ও পরিমাণের একই একক গ্রহণ, রাস্তা বা নদীতে আভ্যন্তরীণ টোল বা শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া এবং জাতীয় ভিত্তিতে সকলের জন্য একটাই মাত্র কর আর শুল্ক-ব্যবস্থা। এই সব বিধি-বিধান যা একালে আমরা বিনা তর্কে স্বীকার করে নেই, এগুলো কিন্তু আসলে অনেক দিন ধরে সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে জাতীয় শাসকদের সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। কারণ স্থানীয় সামন্ত প্রভুরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় যতটা পারা যায় অর্থনৈতিক ক্ষমতা হাতে রাখতে চেয়েছিল। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সামন্তদের উপর রাজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পেল, ততই শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতি গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলো।

রাজাদের এই সংগ্রামে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু মিত্র পেলেন। তাদের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম হলো শহর এবং নগরের উদীয়মান বণিক-শ্রেণী। অর্থনৈতিক একত্রীকরণের ফলে যখন স্থানীয় বাণিজ্যিক বাধাসমূহ দূর হলো এবং ব্যবসা বিস্তৃতি লাভের সুযোগ পেল, তখন বণিক শ্রেণী এর দ্বারা উপকৃত হলো। প্রতিদানে বণিকরা নৃপতিকে স্থানীয় সামন্তদের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য শক্তি-বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয় অর্থ যুগিয়ে। বৈদেশিক-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে রাজা আর বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের মিল হলো। এশিয়া আর নয়া দুনিয়ার (আমেরিকা) সাথে বাণিজ্যের দ্বারা বণিকরা মুনাফা অর্জন করলো। এক

www.pathagar.com

দেশের বণিকরা যখন আর একটি দেশের বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে, সে ক্ষেত্রে লাভটা প্রথমোক্ত দেশের দিকেই আসবে এবং সে দেশের শিল্প-কর্মীরাও ঐ রফতানি বাজারের দ্বারা উৎসাহিত হবে। রাষ্ট্রের লাভ হলো নানা দিক দিয়েঃ অধিক বাণিজ্যের ফলে অর্জিত অধিক শুল্ক, বাণিজ্যিক একচেটিয়া শর্ত বিক্রির আয়, সামরিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি, জাহাজ শিল্প আর জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি, নাবিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, আর সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উন্নতিতে, কারণ এসবের ফলে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ় হতে পারলো। সুতরাং জাতীয় কর্মপন্থার একটা প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠলো বাণিজ্যের উন্নয়ন আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তি বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় যে দলটি রাজার সাথে ভিড়ে গেল, তারা হচ্ছে ক্ষুদ্র ভূমিমালিক শ্রেণী, যারা রাজার মধ্যে দেখতে পেলো ব্যারনদের (barons) শক্তিকে কাবুতে রাখার উপায়। দেশের মঙ্গল, নাইট সুলভ প্রতিযোগিতা বা পারিবারিক ক্ষমতা নিয়ে এরা মাথা ঘামায়নি অবশ্য, এদের স্বার্থ ছিল বরং বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষিতে। তারা চাইত সরকার দেশে শৃংখলা রক্ষা করুক, বাজার আরও বড় হোক, যাতে তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এরা বুঝেছিল যে স্থানীয় লর্ডদের (lords) উপর রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তাদের নিজেদের সম্পদ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

আরও দু'টি দল সৃষ্টি হয়েছিল এই বাজার-অর্থনীতি আর জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উদয়ের ফলে। একটা হলো উকিলের শ্রেণী, যাদের প্রয়োজন হলো অবাধ মেলামেশা আর বাজারের পরিবেশের ব্যক্তিগত চুক্তি থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সম্পর্কের বহুবিধ জটিল শর্তাবলীর অর্থ করা আর সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য। পুরাতন এবং সুপরিচিত আইনঘটিত সম্পর্কগুলির প্রতিস্থাপন হচ্ছিল নতুন আইনকানুনের দ্বারা এবং এসব কথা সহজ করে গুছিয়ে উপস্থিত করার জন্য উকিলদের প্রয়োজন হলো। অপর দলটি হলো সরকারী প্রশাসক শ্রেণী ও কোর্ট, সংখ্যায় কম হলেও এদের কৌশলগত গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। ব্যবসায়ী আর সরকারের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের সহযোগী এই 'ভদ্রলোকের' শ্রেণী ঐক্য আর ক্ষমতা জোরদার করার কর্মপন্থাকে সমর্থন যোগায়।

রাজশক্তি, বণিকশ্রেণী, ভদ্রলোক আর বুদ্ধিজীবীদের, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঐক্যবোধ থেকেই প্রয়োজন হয়ে পড়লো সমগ্র জাতিকে একজন শক্তিমান শাসকের অধীনে একত্রিত করার, সামরিক আর নৌ-শক্তির উৎকর্ষ, উৎপাদন এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করার অর্থনৈতিক কর্মপন্থা

www.pathagar.com

(economic policy)। এসব ব্যবস্থা আর এগুলোর অর্ন্তনিহিত তত্ত্ব সকল বণিকবাদ বা মার্কেন্টাইলিজম নামে পরিচিত। এগুলোই ছিল আধুনিক অর্থনীতি বিষয়ের প্রথম সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা।

মার্কেন্টাইলিস্ট নীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেন ফিলিপ ভন হর্‌নিক (১৬৩৮–১৭১২) নামক একজন অষ্ট্রিয় সরকারী কর্মচারী। তিনি তাঁর পশ্চাৎপদ স্বদেশের পক্ষে লিখতেন যে দেশ ছিল সর্বদা তুরস্কের ভয়ে ভীত। তিনি ১৬৮৪ সনে ব্যাপকভাবে পঠিত এক গ্রন্থের রচনা করেন। এই গ্রন্থটির নাম "সবার উপরে অস্ট্রিয়া, যদি শুধু সে ইচ্ছা করে" এবং তিনি "জাতীয় অর্থনীতির জন্য নয়টি প্রধান নীতির" উল্লেখ করেনঃ

"দেশের মাটির গুণাগুণ যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে, কোথাও কৃষির বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা থাকলেও তা যেন অবহেলা করা না হয়... দেশের অভ্যন্তরে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তা, যদি কাঁচা (বা খনিজ) অবস্থায় ব্যবহার করা না হয়ে থাকে, তবে দেশের মধ্যেই তা দিয়ে জিনিস বানাতে হবে... দেশের জনবলের দিকে মন দেয়া দরকার... দেশে যত লোককে খেতে দেওয়া সম্ভব, তত বেশী লোক যেন থাকে...সোনা আর রূপো, এই দু'টি বস্তু কোন গতিকে একবার দেশের মধ্যে আসলে কোন কারণেই আর তা যেন বের হয়ে না যায়... দেশবাসীর উচিত যতটা সম্ভব নিজের দেশের জিনিসই ব্যবহার করা... (বিদেশী জিনিস) যদি আনতেই হয়, তা সোনা–রূপোর বিনিময়ে নয়, বরং দেশের প্রস্তুত কোন জিনিসের বিনিময়েই আনতে হবে... আর তা যতটা সম্ভব কাঁচামাল অবস্থাতেই আনতে হবে, যাতে দেশে এনে তা থেকে ব্যবহার্য জিনিস বানিয়ে নেয়া যায়... দেশের কোন জিনিস যদি অব্যবহৃত থাকে তবে দিন রাত চেষ্টা করতে হবে যাতে তা দিয়ে কিছু বানিয়ে বিদেশে কোথাও বিক্রি করা যায়.....যে জিনিস নিজের দেশেই প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব, তা কোন অবস্থাতেই যেন বিদেশ থেকে আমদানি করা না হয়।"

ইউরোপের সকল দেশেই মোটামুটি জাতীয়তাবাদ, স্বনির্ভরতা আর জাতীয় শক্তির এই বুনিয়াদি কর্মপন্থাগুলো গ্রহণ করা হয়। শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ দেয়া হলো, ভর্তুকী, বিশেষ সুবিধা, প্যাটেন্ট আর একচেটিয়া উৎপাদনের অধিকার দিয়ে। বৈদেশিক বাণিজ্যের উৎসাহ দেয়া হলো উপনিবেশ দখল করে, আর মজুরী কম রাখার চেষ্টা করে, এবং এজন্য সৃষ্টি করা হলো শুল্ক ব্যবস্থা

www.pathagar.com

নেভিগেশন ল (navigation laws*) আর বাণিজ্যিক বিষয়ে নানা ধরনের বাধানিষেধ। কয়েক ধরনের কর্মপন্থার মাধ্যমে কৃষিকার্যকে উৎসাহ দেওয়া হলো। ইংল্যাণ্ডে বিদেশী প্রতিযোগীদের সরিয়ে রাখার জন্য কৃষিজ পণ্য আমদানির উপর শুল্ক বসান হয়, আবার ফ্রান্সে কৃষিজ পণ্য রফতানির উপর শুল্ক বসানো হয়, যাতে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশবাসীই ব্যবহার করতে পারে। বিশেষভাবে গড়ে তোলা হলো বন্দুক, বারুদ, জাহাজ, জাহাজের উপকরণ—এইসব যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের শিল্পগুলো।

ইংল্যান্ডে যখন বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে সম্পদ এবং জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পেলো, তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার জন্য মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধির উপর খুব জোর দেয়া হলো। সেকালে বাজারও ছোট ছিল এবং ক্রয়-ক্ষমতাও অপর্যাপ্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অন্যতম বাধা ছিল খরিদ্দারদের হাতে নগদ টাকার অভাব আর ব্যবসায়ীদের জন্য ঋনের স্বল্পতা। শাসনকর্তাদেরও প্রায়ই ঋণ করতে হতো, তাই যদি নগদ টাকা আর ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হারটা কম থাকে, তবে তারাও একইভাবে উপকৃত হতো। আধুনিক ব্যাংকিং তখন শৈশব অবস্থায়, তাই টাকা ও ঋণের সহজ লভ্যতা ছিল নগদ টাকার সরবরাহের উপর একান্ত নির্ভরশীল -অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার সরবরাহের উপর। তাই অনিবার্যভাবেই মুদ্রাবিষয়ক নীতি (monetary policy) হয়ে পড়ে মার্কেন্টাইলিস্ট অর্থনীতিবিদদের একটা প্রধান চিন্তার বিষয়। প্রধানতঃ তাঁরা চাচ্ছিলেন 'সহজ মুদ্রা নীতি' (easy money policy)—অর্থাৎ মুদ্রা সরবরাহ যথেষ্ট থাকবে,যাতে ব্যবসা উৎসাহিত হয় এবং সুদের হার কম থাকে।

অপরপক্ষে, মুদ্রাস্ফীতির চাপও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হতো দুটি কারণেঃ (১) জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি শ্রমিক আর দরিদ্র শ্রেণীর জন্য মুস্কিলের ব্যাপার ছিল, কারণ সাধারণতঃ মজুরিটা মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় পেছনেই থাকে, যাতে দেখা দেবে রাজনৈতিক অসন্তোষ; (২) মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের উৎপাদিত জিনিসের বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং তা থেকে দেশের অভ্যন্তরেও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটবে।

সুতরাং আভ্যন্তরীণ আর আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক নীতিমালা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়লো, এবং ইংল্যান্ডের মার্কেন্টাইলিস্টরা

* এই আইনের দ্বারা উপনিবেশের সংগে বাণিজ্যের জন্য রাজার নিজ দেশের জাহাজ ছাড়া অপর কোন জাতির জাহাজ ভাড়া করা যাবে না, এমন নিয়ম করা হয়। -অনুবাদক

www.pathagar.com

এটা শীঘ্রই বুঝতে পারে যে সারা দুনিয়ার অর্থনীতিটাই পরস্পরের সাথে একটা সম্পর্কের জালে সংবদ্ধ। কঠিন বাস্তবের অভিজ্ঞতা আর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ থেকে তারা বুঝতে পারে যে যদি দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রার সরবরাহ আর ক্রয়-ক্ষমতা, বিক্রয়যোগ্য জিনিষের সরবরাহের চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি বাড়ে, তবে দেশে মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে, আমদানি বাড়বে এবং রফতানি হ্রাস পাবে। রফতানি হ্রাস আর আমদানি বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণের জন্য সোনা আর রূপো রফতানি করতে হবে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে টাকার সরবরাহ হ্রাস পাবে আর সেটা অর্থনীতির অবনতির কারণ হবে। এইসব পারস্পরিক সম্পর্ক ভালভাবেই বোঝা গিয়েছিল এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্য দেশের অনুকূলে রাখাটা ছিল মার্কেন্টাইলিস্টদের মৌলিক মতবাদ। তারা বলতো, যদি রফতানিটা আমদানির চেয়ে বেশী হয়, তবে স্বর্ণ রৌপ্য দেশের ভিতরে আসতে থাকবে, দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত হবে এবং জাতীয় আয়ও বাড়বে।

অবশ্য সর্বত্র যে মার্কেন্টাইলিজমের ধারণাটা একই রকম ছিল, তা নয়। দেশে দেশে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে রেশম, লিনেন, কারুকার্যময় বস্ত্রাদি, আসবাবপত্র এবং মদ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব জিনিসের উচ্চমান রক্ষার জন্য কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। রাজা চর্তুদশ লুই-এর রাজত্বকালে জিন ব্যাপ্টিস্ট কোলবার্ট (১৬১৯-১৬৮৩) প্রায় বিশ বছরের অভিজ্ঞ অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে কতকগুলো জাতীয় পর্যায়ের গিল্ড (guild) প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে প্রধান প্রধান শিল্পগুলোর এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করা হয়। যে কারিগর গিল্ডের সদস্য, শুধু তারাই জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে কাজ করতে পারতো। লবণ-শুল্কের উপার্জিত অর্থের বলে রাজশক্তি কড়াভাবে এই সকল নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লব ঘটা পর্যন্ত গিল্ডগুলি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

বিপরীতক্রমে, ইংল্যান্ডে দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্পসমূহ নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি, কারণ অর্থের অভাবে সরকার কখনো নিয়ন্ত্রণ-বিধি কার্যকর করতে পারতেন না। ইংরেজদের মার্কেন্টাইলিজম্ প্রধানতঃ বাণিজ্যের প্রসার এবং শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ দানে নিয়োজিত থাকে। এ অবস্থার একটা ফল হয় যে মধ্যযুগীয় গিল্ডগুলো অচল হয়ে পড়ে, বিশেষভাবে যখন পল্লী অঞ্চলে কাপড়ের উৎপাদন শুরু হলো, ফ্রান্সের তুলনায় শিল্পের নিয়মাবলী এখানে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন শিল্প

www.pathagar.com

বিপ্লব শুরু হয়, তখন এই গিল্ড না থাকাটাই ইংরেজদের ইচ্ছামত শিল্প প্রতিষ্ঠায় ফ্রান্স বা ইউরোপের অপর অনুকরণকারীদের তুলনায় শুরুতেই তাদের অগ্রগামী করে দেয়।

কর্মপন্থাতেও জাতিতে জাতিতে বিশেষ মতৈক্য ছিল না। ব্যক্তি বিশেষ বা কোম্পানী বিশেষকে সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার দেয়ার বিরুদ্ধে জনমত এমন তীব্রভাবে প্রকাশ করা হয় যে ১৬০১ সনে রাণী এলিজাবেথকে স্বয়ং পার্লামেন্টেই এসে আপত্তি খণ্ডন করতে এবং পরিবর্তনের আশ্বাস দিতে হয়। দু বছর পর বিখ্যাত 'একচেটিয়া বিষয়ক মামলায়' কোর্ট এক পথ নির্দেশক সিদ্ধান্তে ঘোষণা দেয় যে, একচেটিয়া ব্যবসা রাজশক্তি কর্তৃক অনুমোদিত হলেও সাধারণ আইনের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রবর্তিত সরকারী বাধা-নিষেধ তার উপরও প্রযোজ্য হবে। ১৬২৪ সনে পার্লামেন্ট চূড়ান্তভাবে সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার দেয়া নিষিদ্ধ করে দেয়। যার উপর পরে মার্কিন ট্রাস্ট বিরোধী আইনসমূহের (anti-trust laws) বৈধ ভিত্তি প্রস্তুত হয়ে যায়।

মার্কেন্টাইলিস্টরা সাধারণভাবে স্বীকার করতো যে সম্পদ মানুষের কাজের দ্বারাই সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারা মনে করতো যে কাজটা সম্পন্ন হবে না, যদি ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ দেয়া না হয়— যদি উৎপাদনকারীরা দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ করতে না পারে। এই কারণে তারা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর এবং অধিক ব্যবসা-বাণিজ্যের চাবিকাঠি হিসেবে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দিত। জাতিসমূহের সম্পদের উৎস কি ? মার্কেন্টাইলিস্টদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের সর্বপ্রথম উত্তর ছিল 'বাণিজ্য'।

অনেক দিক দিয়েই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল। ইউরোপে যারা আন্তর্জাতিক আর সামুদ্রিক বাণিজ্যের সর্বাধিক সম্প্রসারণ করে, তারাই হয়েছিল ষোড়শ আর সপ্তদশ শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিসমূহ। দৃশ্যতঃ বাণিজ্যের কারণেই শিল্পোৎপাদন এবং কৃষি উভয়ই উৎসাহিত হয়, সুতরাং বাণিজ্যই সমগ্র জাতির জন্য আনে সৌভাগ্য, সম্পদ আর শক্তি। চারদিকে যা কিছু ঘটতে দেখা যায়, সে বিচারে মার্কেন্টাইলিস্ট মতবাদকে সাধারণ বুদ্ধিতে মানুষের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল।

www.pathagar.com

মার্কেন্টাইলিজমের প্রতিবাদ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌঁছতেই মার্কেন্টাইলিস্টদের বাণিজ্য আর জাতীয় শক্তি নিয়ে অত্যধিক মাতামাতিটা উঠতি ব্যাজার-অর্থনীতির কিছু কিছু অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষতি করতে লাগলো। আন্তর্জাতিক বাজারে যেসব বণিক আর অর্থলগ্নীকারক কারবার করছিল, তাদের পক্ষে মার্কেন্টাইলিস্ট নীতি ছিল চমৎকার, জাতীয় শক্তির মৌলিক উদ্দেশ্যও শাসক শ্রেণীর জন্য সুবিধাজনক ছিল; এবং সরকারী প্রশাসক আর সভাসদ মণ্ডলী এ ব্যবস্থার ফলে সরকারের দেয়া বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার কারণে, হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় তো ঘুষের মাধ্যমে যথেষ্ট লাভবান হতে থাকে। কিন্তু অর্থনীতির প্রসারের সাথে সাথে তার বৈচিত্র্য বাড়লো এবং কৃষক ও শিল্প উৎপাদনকারীরা ক্রমান্বয়ে দেখতে পেল যে মার্কেন্টাইলিস্ট নীতি তাদের জন্য মঙ্গলজনক হচ্ছে না। ফলে ওসব নীতি কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হলো এবং সেগুলোর ভিত্তি ছিল যেসব তত্ত্ব, সেগুলোরও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল।

বিশেষভাবে বড় বড় টাকা বিনিয়োগকারীদের একচেটিয়া সুবিধে দানের ফলে ছোট ব্যবসায়ীরা অসুবিধাজনক অবস্থায় জর্জরিত হয়ে পড়ল। তারা এবং ছোট চাষীরা উভয়ই তাদের স্বার্থের পরিপন্থী জাতীয় সরকারের নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধির জন্য বসানো কর আর শুল্কের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। এর একটা বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে ইংরেজের মার্কিন উপনিবেশগুলিতে "প্রতিনিধিত্ব ছাড়া ট্যাক্স না দেওয়ার" দাবী। ১৭৬৫ সনে যখন ফরাসী আর ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ শেষ হলো, উপনিবেশগুলোর পশ্চিম ভাগ তুলনামূলকভাবে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের জন্য নিরাপদ হয়ে উঠল। উপনিবেশ স্থাপনকারীরা তখন ভালই জানত যে, তাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ হচ্ছে পশ্চিমে। কিন্তু ইংরেজ সরকার আগে থেকেই 'ফার' ব্যবসায়ের উন্নয়নে নিজেদেরকে লিপ্ত করে ফেলেছে, এবং হাড্‌সন বে কোম্পানীর স্বার্থটাই বেশী করে দেখছিল। তাই তারা আলিঘানী পর্বতের ওপারে বসতি স্থাপনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। উপনিবেশে মোতায়েন করা সৈন্যের কাজ ছিল উপনিবেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া এবং ঐসব বিধিনিষেধের বাস্তবায়ন করা। ১৭৬৫ সনের আগে যে সৈন্যদের দায়িত্ব ছিল উপনিবেশ স্থাপনকারীদেরকে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, সীমান্ত ঠাণ্ডা হবার পর তারাই আবার উপনিবেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে

www.pathagar.com

বাধা দিতে থাকে। অবস্থার আরও অবনতি হলো যখন উপনিবেশে সৈন্যদের ব্যয় বহনের জন্য দলিলপত্র এবং চায়ের উপর শুল্ক বসানো হলো। আর সৈন্যদেরকে অনেক সময় উপনিবেশকারীদের বাড়িতেই থাকতে দিতে হতো। যে সৈন্যদল তাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে লিপ্ত, ঠিক তাদেরকেই পুষতে হলো উপনিবেশকারীদের। অবশ্য ঐ শুল্ক থেকে পাওয়া টাকাটা যদি সীমান্ত বন্ধ করার বদলে তা খুলে দেওয়ার জন্য ব্যয় করা হতো, তবে উপনিবেশকারীরা তা কিভাবে গ্রহণ করতো সেটা অবশ্য একটা প্রশ্নই রয়ে গেছে।

আমেরিকার উপনিবেশগুলোর ঘটনাবলী ছিল মার্কেন্টাইলিস্ট নীতির একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ, যেখানে প্রশ্নটি রাজনৈতিক রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তা জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী আমেরিকান বিপ্লবকে মদদ্ যোগায়। ইউরোপে অবশ্য শুধু অর্থনৈতিক প্রশ্নেই বিতর্কটা শুরু হয়। কথাটা কি সত্য যে, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ আর উন্নয়ন অর্জনের জন্য নিয়ন্ত্রণ আর হস্তক্ষেপই শ্রেষ্ঠ নীতি? মার্কেন্টাইলিস্ট সরকারের নির্দেশনা আর হুকুম দ্বারা বাধাগ্রস্ত না করে অর্থনীতিকে যদি মুক্ত রাখা হয়, তবে কি ফল ভাল হবে না ? এসব প্রশ্নের উপর বিতর্কটা বেশী জমে উঠে, বিশেষভাবে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডে।

ফ্রান্সে উৎপাদনের সরকারী নিয়ন্ত্রণ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় যে সেখানে এমনকি এক ইঞ্চি পরিমাণ উৎপাদিত কাপড়ে কটি সুতা থাকতে হবে তা পর্যন্ত বলে দেয়া হতো। একাধিক ট্যাক্স আর টোল বসানো হয়েছিল, আর আমদানী-রফতানির উপরও ছিল কড়া নিয়ন্ত্রণ। সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষরা ছিলেন করমুক্ত, অথচ যাবতীয় কর আদায় করা হতো চাষী আর স্বনির্ভর কৃষিজীবীদের থেকে। তা ছাড়া সরকার ছিল দুর্নীতি পরায়ণ আর অযোগ্য, বলতে গেলে সেই কারণেই ব্যবস্থাটা আদৌ কার্যকর ছিল; বুদ্ধি খাটালে আর শ্রেণীমত ঘুষ টুষ দিতে পারলে ঐসব নিয়ন্ত্রণ আর বিবিধ শুল্ক এড়ান সম্ভব ছিল। অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ে যে ভ্যাঁসো দ্য গুরনে (১৭১২-১৭৫৯) নামক সরকারের একজন ট্রেডমার্ক ইনস্পেক্টর নাকি মার্কেন্টাইলিস্ট নিয়ন্ত্রণ বিধির থেকে মোহভঙ্গের পর সেই অতি সুপরিচিত কথা দু'টি প্রথম উচ্চারণ করেছিলেনঃ ' লেজে ফেরে', 'লেজে পাসে' (laissez faire, laissez passer) অর্থাৎ কিনা 'মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা', 'মুক্ত বাণিজ্য'।

www.pathagar.com

ফিজিওক্রাটদের কথা

ফ্রান্সে যারা মার্কেন্টাইলিজমের গোঁড়া বিরোধী ছিল, তারা নিজেদেরকে "ফিজিওক্রাট" (physiocrats) বলতো। এদের নেতা ফ্রাঁসোয়া কেস্‌নে (Francois Quesnay) ছিলেন পঞ্চদশ লুই এর সরকারী চিকিৎসক। সম্পদের উৎস যে শিল্প আর বাণিজ্য, এই মার্কেন্টাইলিস্ট মতটা তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন যে প্রকৃতির জীবনদানকারী সামগ্রী হিসাবে একমাত্র কৃষিই উৎপাদনে নিয়োজিত মানবিক প্রচেষ্টার উপরে একটা উদ্বৃত্ত (surplus) উৎপাদন করতে পারে। অতঃপর কেসনে তাঁর ১৭৫৮ সনে প্রস্তুত অর্থনৈতিক তালিকায় (economic table) দেখান, কিভাবে কৃষি থেকে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে খাজনা (rent), মজুরী এবং কেনাবেচার মাধ্যমে তার গতিপথে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষেরই ভরণপোষণ জোগায়।

এই বিশ্লেষণ থেকে দু'টি নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। (১) ব্যবসা আর শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলে তা আয় এবং জিনিসের চলাচলে বাধা দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে; (২) সকল রকম কর ধার্য হওয়া উচিত শুধু জমির মালিকদের উপর (কৃষকের উপর নয়)। কারণ প্রথমতঃ তারা নিজে উৎপাদন করছে না, আর দ্বিতীয়তঃ তাদের বিলাসপূর্ণ জীবন ধারণটা আয়ের চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করছে।

মানবদেহের রক্ত-সঞ্চালন প্রক্রিয়ার আবিষ্কার কেস্‌নেকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং এই জৈবিক প্রক্রিয়ার সাথে সমাজে টাকা এবং দ্রব্যাদির সঞ্চালনকে তুলনীয় বলে তিনি ধারণা করেন। কেস্‌নে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল সম্পদই ঈশ্বর সৃষ্ট জীবনদানকারী প্রক্রিয়া থেকে আসছে। প্রাকৃতিক নিয়মের সার্বভৌমত্বে একজন দৃঢ় বিশ্বাসী হিসাবে তিনি মনে করতেন যে প্রশাসন কর্তৃক অর্থনৈতিক বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়ার ফল মঙ্গলজনক হবে এবং এতে অর্থনীতি স্বনিয়ন্ত্রিত হতে পারবে।

আর একজন ফিজিওক্রাট জ্যাকস্ তুরগো (১৭২৭-১৭৮১) শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী হন। মাত্র দু বছরের মধ্যে তিনি কয়েকটি সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং মার্কেন্টাইলিজম বিরোধী সংস্কার কার্যকর করেন এবং ঐ কাজে রাজার সমর্থন লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত সামন্তদের বিরোধিতায় তাকে পদত্যাগ করতে হয়। এমন কি ফ্রান্সের সর্বময় কর্তাও সম্ভ্রান্ত সামন্তদের (nobility) আপত্তির ফলে তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমে অগ্রসর হতে পারলেন না। তবে আর কয়েক

www.pathagar.com

বছর পরে পুরনো সেই সরকারকেই দূর করে দেওয়া হয়।

ফিজিওক্রাটদের সকলেই একটি মৌলিক প্রশ্নে একমত ছিল যে সকল সম্পদই শেষ পর্যন্ত জমি থেকে আসে। একমাত্র জমিতেই আছে প্রকৃতির ঈশ্বর প্রদত্ত জীবনদানকারী শক্তি। শিল্পের দ্বারাই শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং বাণিজ্যের দ্বারা শুধু তার অবস্থান এবং মালিকানার পরিবর্তন করা যেতে পারে। একমাত্র জমিই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারে। এটা ছিল সম্পদের উৎস সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রধান মতবাদ বা তত্ত্ব।

অর্থনৈতিক উদারপন্থী দল

ফিজিওক্রাটদের যুগটা ছিল গর্ভনাটীকার ন্যায় স্বল্পস্থায়ী, যদিও তাদের প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত টিকে থাকে, এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের জেফারসন থেকে লিংকন পর্যন্ত অনেক রাষ্ট্রনেতারই বিশ্বাস ছিল যে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহ দানের উপরই সমগ্র জাতীর ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। তবে তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল অর্থনৈতিক উদারপন্থীদের আবির্ভাব। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সামান্যভাবে শুরু হলেও উনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদটাই হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক চিন্তা জগতের প্রধান স্রোত এবং আজও সেটা ক্লাসিক (classic) পুঁজিবাদী চিন্তাধারা হিসাবে বেঁচে আছে।

প্রথম যুগের অর্থনৈতিক উদারপন্থীরা (economic liberals) (অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অ্যাডাম স্মিথ কর্তৃক মতবাদটি সুসমবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হবার আগে) যারা এই মতবাদের অনুসারী ছিল, তারা প্রথমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণগুলোকে আক্রমণ করলো এবং শুল্ক, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান এবং বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তাদের যুক্তির ভিত্তি ছিল এই যে সামাজিক তত্ত্ব কথাটা যত স্বার্থপর সুলভ বলেই মনে হোক, ব্যক্তিগত প্রেরণার ফল গোটা সমাজের পক্ষেই মংগলজনক হবে।

ইংল্যান্ডে প্রথম নাম-করা অর্থনৈতিক উদারপন্থী ছিলেন ডাড্‌লী নর্থ (১৬৪১-১৬৯১), যাঁর 'বাণিজ্যের বিষয়ে আলোচনা' (Discourses upon Trade) তাঁর মৃত্যুর বছরে বেনামিতে প্রকাশিত হয়। নর্থ ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদার যিনি সরকারের ট্রেজারী বিভাগে চাকুরে ছিলেন, তাই বোধগম্য কারণেই মার্কেন্টাইলিজমের জাতীয়তাবাদী নীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশ করায় তাঁর পক্ষে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাঁর বইয়ে জোরালো ভাষায় অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে বলা হয় এবং বাণিজ্যে অনুকূল ভারসাম্য (favourable trade balance) যে সর্বক্ষেত্রেই কাম্য, এই

www.pathagar.com

মার্কেন্টাইলিস্ট মতকে তিনি আক্রমণ করেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, লোকে বাণিজ্য করে, কারণ তাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়, এতে পারদর্শিতা বৃদ্ধি পায়, শ্রম-বিভাগ অর্জিত হয় আর সম্পদ বৃদ্ধি পায়। নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বাণিজ্য হ্রাস ও সীমাবদ্ধ করার ফলে এই সকল সুবিধা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং নিঃসন্দেহে প্রকৃত সম্পদ হ্রাস পায়।

দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) নর্থের যুক্তি সমর্থন করেন। ১৭৫২ সনে তিনি যুক্তি দেখান যে স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কারো পক্ষেই বাণিজ্যের অনুকূল ভারসাম্য থাকতে পারে না। রফতানিতে যদি উদ্বৃত্ত হয়, তা শোধ দিতে হবে সোনা এবং রূপা আমদানির দ্বারা, যার ফলে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়বে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে; তাতে পরবর্তী পর্যায়ে আমদানি রফতানির সমতা আসা পর্যন্ত রফতানি হ্রাস পেতে থাকবে। তাই মার্কেন্টাইলিস্ট নীতি অনুযায়ী সর্বদা বাণিজ্যে অনুকূল ভারসাম্য রক্ষণ এবং সোনা আর রূপা আমদানি করতে থাকার যে দাবী, সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

নর্থ এবং হিউমের যুক্তি মার্কেন্টাইলিস্টদের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের যুক্তিকে যেন একদম কিমা বানিয়ে ছাড়লো। হিউমের মতে এ নীতি কার্যকর হতেই পারে না এবং নর্থ দেখালেন যে যদি কার্যকর হতো তা হলেও তার ফল হতো অনভিপ্রেত।

ইতিমধ্যে বার্নার্ড দ্য ম্যোণ্ডেভাইল (১৬৭০-১৭৩৩) নামক ইংল্যান্ডে দেশান্তরী এক ডাচ্ চিকিৎসক ১৭০৪ সনে 'মৌমাছিদের গল্প' (The Fable of the Bees) নামে আকর্ষণীয়, জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত ছন্দহীন কবিতার ভাষার লেখা একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কবিতাটির প্রধান যুক্তি ছিল এই ধরনের যে, সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে পাপকার্যের ফল, পূণ্যের নয়। ব্যক্তির নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার ফলেই উন্নয়ন আসে, যেমন আরামের আর আয়াসের ইচ্ছে থেকে, বিলাস আর আনন্দ থেকে। কঠিন পরিশ্রম করার বা সঞ্চয় করার বা অপরের মঙ্গল করার ইচ্ছা থেকে নয়। ব্যক্তির স্বার্থপর প্রেরণাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে সৌভাগ্য আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। স্বার্থপরতার পাপ মানুষকে তার লাভটা সর্বোচ্চ পরিমাণে তুলতে উৎসাহিত করবে এবং এইভাবেই তা জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করবে।

"এইভাবে পাপ প্রতিপালন করে উদ্ভাবনী দক্ষতাকে, তার সাথে যদি সময় আর শিল্প জুড়ে দাও, দেখবে, জীবনের যত সুবিধে, আসল স্ফূর্তি, আরাম আর

www.pathagar.com

আমোদ, এত বেশী করে অর্জিত হবে যে, দরিদ্রেরাও আগের দিনের ধনীদের চেয়ে ভালভাবে বাঁচবে, তাতে যোগ করার মত আর কিছুই বাকী থাকবে না"

অপ্রস্তুত বোধ করে সরকার নীতিবাগীশদের পূর্ণ সমর্থনে গ্রন্থখানার প্রচার বন্ধ করে দেয়। তবুও নর্থ এবং হিউম বর্ণিত অর্থনীতির স্বাভাবিক সমন্বয় তত্ত্বের সাথে ম্যান্ডেভাইল প্রশংসিত মানুষের স্বার্থপরতাই হলো পরবর্তী সুমহান অর্থনৈতিক তত্ত্ব অর্থাৎ অর্থনৈতিক উদারপন্থীবাদের ভিত্তি।

অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক উদারপন্থীরা ব্যবসা বা কৃষি কোনটাকেই সম্পদের উৎস মনে করতেন না, তাঁদের দৃষ্টিতে এই উৎসাহ হলো মানুষের শ্রম, তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে মানুষের পরিশ্রমের দ্বারাই উৎপাদন হয়ে থাকে এবং তা থেকেই প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা হয়। প্রাকৃতিক উৎপন্ন দ্রব্য খুব কম সময়ই মানুষের সরাসরি ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রায় সব প্রাকৃতিক দ্রব্যই মানুষের পরিশ্রম দ্বারা পরিবর্তিত হতে হবে, তবেই তা মানুষের প্রয়োজন মেটায়। উৎপাদনমূলক শ্রম ছাড়া প্রাকৃতিক সামগ্রীর মূল্য কিছুই না।

এই মতবাদকে 'মূল্যের শ্রম ভিত্তিক তত্ত্ব' (Labor Theory of Value) বলা হয়। সম্পদ উৎপাদনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যে মানুষের প্রয়োজন মেটানো, এই তত্ত্বে সেটার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। সম্পদ একটা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রীয় শক্তি বৃদ্ধিও একটা যুক্তিযুক্ত আকাঙ্ক্ষা নয়। সম্পদটা সম্পদ কারণ তার দ্বারা আমাদের অবস্থা ভাল হয়। তা ছাড়া সম্পদের উৎপাদন মাটির উর্বরতা বা বাণিজ্যের অনুকূল মূল্য পার্থক্যের (favourable trade balance) উপর নির্ভর করে না বরং তা নির্ভর করে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যমের উপর। কাজের প্রেরণা আসে খাদ্য, বস্ত্র, আরাম আর আয়াসের চাহিদা থেকে। কাজের উৎসাহ যত বেশী থাকবে, সম্পদের উৎপাদনও তত অধিক হবে এবং ততই মানুষ দ্রুত এক প্রাচুর্যের সমাজ সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাবে।

ইংরেজ দার্শনিক জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) শ্রম আর সম্পদের উৎপাদন বিষয়ক এই ধারণার সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সংযুক্ত করেন এবং সেইভাবে তিনি সম্পত্তির অধিকারকে উদারপন্থী মতবাদের একটা প্রধান ভিত্তিপ্রস্তরে পরিণত করেন। প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে মানুষ নিজের শ্রম মিশিয়ে, চূড়ান্ত উৎপাদনের মধ্যে তার নিজেরই একটা অংশ মিশিয়ে দেয়, আর এইভাবেই উৎপন্ন বস্তুটা 'তার' হয়ে যায় ব্যবহার বা ভোগের জন্য। সম্পদ (wealth) আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) দুটো একই সাথে মানুষের শ্রমের

www.pathagar.com

দ্বারাই উৎপন্ন হয়। লকের ভাষায়ঃ

"ঈশ্বর এই পৃথিবীটা সব মানুষের জন্যই দিয়েছেন... তবুও প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কাছে এক-একটি সম্পত্তি। বলা যায় যে তার শরীরের পরিশ্রম, আর তার হাতের কাজ তার নিজস্ব জিনিস। তাই যা কিছুই সে প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বের করে আনলো তার সাথে নিজের শ্রমও মিশিয়ে দিল। আর সেই ভাবে এটাকে তার নিজেরই সম্পত্তিতে পরিণত করলো।"

পরবর্তী সময়ের উদারপন্থীরা শ্রম, সম্পদ এবং সম্পত্তি (labour, wealth, and property) নিয়ে আরও অনেক দূর অগ্রসর হন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিরাপদ করা, কারণ যদি সম্পত্তি রাখার অধিকারকে স্বীকৃতি না দেয়া হয়, তা হলে কাজের আগ্রহ কমে যাবে আর সম্পদের উৎপাদন হ্রাস পাবে।

এই সূত্রের একটি বহুল ব্যবহৃত উদাহরণ ছিল ইংরেজদের সম্পদ আর তুর্কীদের দারিদ্র্যের মধ্যে তুলনা। উদারপন্থীদের বক্তব্য অনুসারে প্রাচীন কালে তুরস্ক রাজ্যটি ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সম্পদশালী দেশ যাদের বড় বড় শহর, সমৃদ্ধ কৃষি, প্রচুর রফতানি আর শিল্পোৎপাদন ছিল বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু এক সময় স্বৈরাচারী আর উচ্ছৃংখল সরকার অযৌক্তিকভাবে লোকের সম্পদ কেড়ে নেয়, জুলুমবাজ কর বসায়, আর সেখানে বিচার এবং প্রশাসন ব্যবস্থাতেও ঘুষের প্রচলন হয়। এই সব অনাচারের ফলে তাদের সমৃদ্ধি খতম হয়ে যায়। তার পর থেকে তুর্কীরা দারিদ্র্যে নিস্তেজ হয়ে আসে, তাদের কাজ-কারবার, উৎপাদনের বা সঞ্চয়ের ইচ্ছেও নাই, কারণ তারা মনে করে ওসবের ফল দুর্নীতিপূর্ণ সরকার কেড়ে নেবে বা নষ্ট করে দেবে, যে পরিশ্রম করবে তার ভোগে আসবে না। অপর দিকে সুখী আর সম্পদশালী ইংল্যান্ডের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কারণ সেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্যক্তির কর্মপ্রেরণা সুরক্ষিত থাকার ফলে যে যা সম্পদ উৎপাদন করতো তাতে তার অধিকার ছিল। বিচার আইন অনুসারে হতো, মুখ চিনে নয়। বেসরকারী পর্যায়ের চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করা হতো এবং কারো সম্পত্তি সরকারী কাজের জন্য ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ ছাড়া নেওয়া হতো না। মানুষ যা উপার্জন করতো, তা সে আইন ও রুচির পরিসীমার মধ্যে থেকে, যেভাবে ইচ্ছে খরচ করতে পারতো। অর্থনৈতিক উদারপন্থীদের মতে, সরকারের কর্তব্য অতি অল্প সম্পত্তিরও নিরাপত্তা দান, সুবিচারের ব্যবস্থা রাখা এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা। এ কাঠামোর মধ্যে অর্থনীতি

www.pathagar.com

কোন রকম বাহ্যিক সহায়তা বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কাজ করবে। ব্যক্তির কর্মপ্রেরণা জাতীয় সম্পদ গড়ে তুলবে।

এই মূল বিষয়বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশধারা দেখা যায়। অর্থনৈতিক উদারপন্থীদের কেউ কেউ জাতীয় সরকারকেই বেশ কিছু ক্ষমতা দেবার পক্ষে ছিল, আবার অনেকেই ব্যক্তিগত প্রেরণা এবং প্রতিযোগিতার শক্তিকেই জোরদার করার পক্ষে ছিল, অনেকে আবার খোলা বাজারে চাহিদা আর সরবরাহকেই কাজ করতে দেবার উপর জোর দেয়। কিন্তু তারা সকলেই এই বিষয়গুলিতে একমত ছিল যে, মার্কেন্টাইলিস্ট নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণাকে মুক্ত করা প্রয়োজন, সম্পদ উৎপাদনের কাজকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং সম্পত্তির মালিক হবার অধিকার রক্ষা করা এবং বলবৎ রাখাটা অর্থনৈতিক কর্মপন্থার ভিত্তিপ্রস্তর।

www.pathagar.com

৩

অ্যাডাম স্মিথ

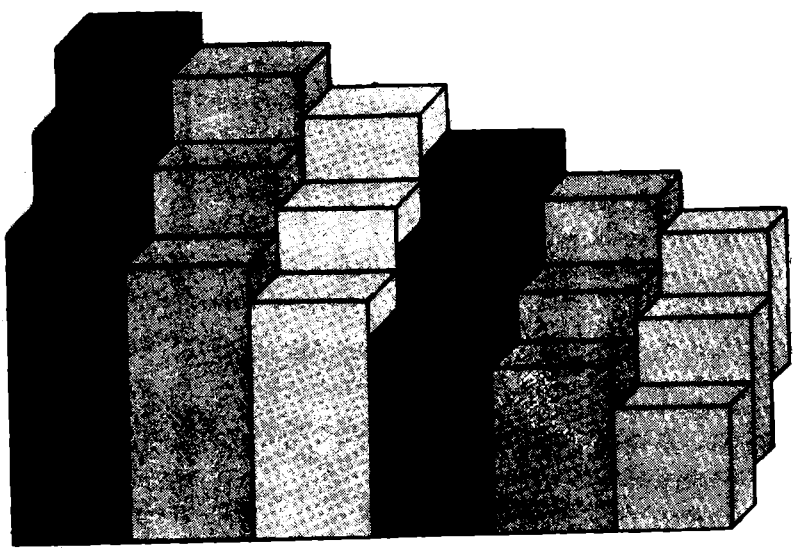

অর্থনৈতিক উদারপন্থীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক এবং কলেজের অধ্যাপক এবং একালে তাঁকে আধুনিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার যে জীবদ্দশায় তিনি সুপরিচিত ছিলেন তাঁর দর্শন বিষয়ক রচনাগুলোর জন্য, অর্থনীতির জন্য নয়, এবং তৎকালীন সরকারী কর্মপন্থার উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল না। পাণ্ডিত্যের যে বাগান তিনি প্রস্তুত করেন তাতে ফুল ফুটেছিল বেশ কিছুকাল পরে।

www.pathagar.com

দার্শনিকের জীবন

স্মিথের জন্ম হয় ১৭২৩ সনে, স্কটল্যান্ডের কার্ক্যাল্ডিতে, তাঁর পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় নিরিবিলিতে, নিতান্ত বৈচিত্র্যহীনভাবে এবং চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। উত্তম ফলাফলের জন্য স্মিথ অক্সফোর্ডে পড়ার জন্য বৃত্তি পান এবং সেখানে ছয় বৎসর কাটালেন, কিন্তু অক্সফোর্ডে তাঁর সহপাঠিদের বুদ্ধিবৃত্তি আর নৈতিকতার নিচু মান তাঁকে নিরাশ করে। ১৭৫১ সনে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যান এবং পর বছর হঠাৎ একটি সুযোগ আসার ফলে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই তরুণ অধ্যাপকের ভাগ্যটা ভালই ছিল, কারণ পরবর্তী বৎসরে নৈতিক দর্শনের অধ্যাপকের একটি পদ খালি হয়, যেটা ছিল স্মিথের প্রিয় বিষয় এবং তিনি পদটি পেলেন। সেখানে তিনি নীতিশাস্ত্র পড়াতেন এবং তাঁর 'দি থিওরী অব মরাল সেন্টিমেন্টস' নামক গ্রন্থটি ১৭৫৯ সনে প্রকাশিত হয়। আধুনিক পাঠকদের কাছে বইটা সেকলে লাগলেও উপভোগ্য মনে হয়। এর মূল কথাটা ছিল যে নীতিশাস্ত্রটা মানুষের পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্কের থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই সৃষ্টি হয়, যে মতে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি অষ্টাদশ শতকের মানুষদের আকর্ষণ প্রতিফলিত হয়। মানুষ তার নিজের চালচলনের প্রতি অপর সকলের প্রতিক্রিয়া দেখে স্থির করে যে, তার ব্যবহারটা অন্যায় অথবা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে। কোন্ ধরনের ব্যবহার ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক, এ থেকে সেই বিষয়ে একটি সামাজিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তিটা মানুষের 'অপরদের দ্বারা নির্দেশিত' কার্যবিধি বিষয়ক তত্ত্বেরই প্রাচীন অভিব্যক্তি। বইটি তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করে এবং বুদ্ধিজীবীরা এটা ভালভাবেই গ্রহণ করে। স্মিথের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইউরোপ থেকেও তাঁর কাছে পড়ার জন্য ছাত্র আসতে থাকে। তিনি অর্থনীতির উপরে একটি গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেন। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে "পুলিশ, সুবিচার, রাজস্ব এবং অস্ত্র" এই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন।

এর পরই আসে একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার, যেটা অবশ্য যথেষ্ট পরিশ্রমের দ্বারাই অর্জন করা হয়। চার্লস টাউনসেন্ড নামক এক রাজনীতিক, যিনি পরে চ্যান্সেলর-অব-একসচেকার হিসেবে চা-শুল্ক এবং অন্যান্য কর বসিয়ে আমেরিকার বিপ্লব ত্বরান্বিত করেন। তিনি একজন বিত্তশালী বিধবাকে বিবাহ করেন এবং সেই সূত্রে একটি সৎ ছেলেও পান। এই ছেলে, তরুণ 'ডিউক অব

www.pathagar.com

বাকলিউখ' এর যখন উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হলো, তখন টাউনসেন্ড সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবস্থাই নিতে চাইলেন। অ্যাডাম স্মিথের বই পড়ে তার খুব ভাল লেগেছিল এবং সেকালে সকলেই স্মিথের যে প্রশংসা করতো, তা বিবেচনা করে তিনি এই চল্লিশ বছর বয়স্ক দার্শনিককে তরুণ ডিউকের গৃহশিক্ষক হতে অনুরোধ করলেন। দার্শনিক ডেভিড হিউম সহ বন্ধু-বান্ধবরা সবাই অবাক হলেন যখন বাস্তবিকই স্মিথ এই চাকুরিটি গ্রহণ করলেন। এই কাজে তাঁকে তিন বৎসর ফ্রান্সে থাকতে হয় এবং তিনি সারা জীবনের জন্য তিনশত পাউন্ড করে পেনশন পান (যা ঐ সময়ে যথেষ্ট টাকা ছিল)।

ফ্রান্সে তার অধিকাংশ সময়টা কাটে 'তুলো'তে (Toulouse) এবং একঘেয়েমি কাটানোর জন্য তিনি অর্থনীতির উপর একটি বই লিখতে শুরু করলেন। পরবর্তী সময়ে স্মিথ প্যারিসে গিয়ে প্রখ্যাত ফিজিওক্রাট্ট কেসনে (Quesnay) এবং তুরগোর (Tourgot) সাথে তাঁদের মতবাদ নিয়েও আলোচনা করেন।

স্কটল্যান্ডে ফিরে এসে স্মিথ তাঁর পেনসনের টাকায় সংসার চালিয়ে তাঁর বই লেখার কাজে মনোনিবেশ করলেন। এত দীর্ঘ সময় তিনি এ কাজে কাটালেন যে বন্ধুরা ভাবতেন ও বই আর কখনও শেষ হবে না। শেষে ১৭৭৬ সনে, 'জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ বিষয়ক অনুসন্ধান' (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) প্রকাশিত হয়।* গ্রন্থটি সাফল্য লাভ করে, কিন্তু জনপ্রিয় হয়নি। কেউ কেউ এটা পড়ে প্রশংসা করলেও সাধারণ পাঠক এটা উপেক্ষা করে। সম্ভবতঃ উইলিয়াম পিট ১৭৮০ সনে স্মিথের চিন্তাধারার ভিত্তিতেই কিছু কিছু কর সম্পর্কিত প্রস্তাব রাখেন বটে, কিন্তু আসলে স্মিথের মৃত্যুর অন্ততঃ কুড়ি বছর পর পরবর্তী যুগের নতুন একদল লেখক নব্য 'পলিটিক্যাল ইকনমি' শাস্ত্রের সৃষ্টি করতে গিয়েই স্মিথকে এই বিজ্ঞানের জনক এবং এক মহান প্রতিভা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিমধ্যে লেখক স্কটল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং ১৭৭৮ সনে 'কমিশনার অব দি কাস্টমস্' এর চাকুরী নেন, এ পদে তাঁর পিতাও এক সময়ে কাজ করতেন। ১৭৯০ সনে তাঁর সমসাময়িকদের প্রায় সম্পূর্ণ অলক্ষ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

---

* ১৭৭৬ সনে আরও কিছু বিখ্যাত ঘটনা ঘটে। জেরেমী বেন্থামের 'ফ্র্যাগমেন্ট অন গভর্নমেন্ট', রিচার্ড প্রাইসের 'অন সিভিল লিবার্টি' এবং এডওয়ার্ড গিবনের 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার' প্রকাশিত হয়। পার্লামেন্টে পুরুষদের সার্বজনীন ভোটাধিকার বিল প্রত্যাখ্যাত হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে ঐ উপনিবেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং ফ্যাক্টরীতে সর্বপ্রথম "বোলটন এণ্ড ওয়াট" স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহার করা শুরু হয়

www.pathagar.com

অ্যাডাম স্মিথ খুব একটা আকর্ষণীয় জীবন যাপন করেন নি। তিন বছরের শিশুকালে তাঁকে কয়েক ঘন্টার জন্য জিপ্‌সিরা চুরি করে নিয়ে যায়। বড় হয়েও তাঁকে একবার ডাকাতের পাল্লায় পড়তে হয়, এ ছাড়া তাঁর জীবন ছিল গতানুগতিক। একেবারেই আনমনা গোছের মানুষ ছিলেন তিনি। একদিন রবিবারের সকালে ড্রেসিং গাউন পরিহিত অবস্থাতেই তিনি তাঁর কার্কালডির বাগানে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পায়চারী করছিলেন। অনমনস্ক হয়ে ভুল মোড়ে হাঁটা শুরু করে শেষ পর্যন্ত টার্নপাইকে, ডানফার্মলাইনের দিকে ১৫ মাইল পথ চলার পর গীর্জার ঘন্টা শুনে শেষ পর্যন্ত তাঁর চিন্তার ঘোর কাটে। কিন্তু লেখক যত বৈচিত্র্যহীন মানুষই হোন না কেন, 'ওয়েলথ্ অব নেশানস্' হচ্ছে একটি মহান গ্রন্থ, কারণ ঐ সময়ের সামাজিক দর্শনের প্রধান সমস্যাগুলোর এতে সমাধান ছিল।

সামাজিক দর্শনের সমস্যা ঃ শৃঙ্খলা বনাম বিশৃঙ্খলা

অষ্টাদশ শতকের সামাজিক দর্শনের প্রধান ভাবনার বিষয় ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমাজের সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলতা থেকে সামাজিক শৃঙ্খলা আসবে কেমনভাবে? প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল তখনই, যখন বর্ধিষ্ণু বাজার-অর্থনীতি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গভীরে প্রবেশ করে ক্রমশঃ তাদের মধ্যযুগীয় সমাজের পদমর্যাদার কাঠামো এবং পূর্ব নির্ধারিত কর্তব্যবোধগুলো ধ্বংস করে দিতে থাকে।

মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি লোকেরই কোন না কোন সংগঠিত গোত্রের বা সমাজের অংশ হিসাবে কতকগুলো কর্তব্য আর কিছু সুযোগ বা অধিকারসহ ঐ সমাজে একটি করে নির্ধারিত আসন বা স্থান ছিল। জমিদার (lord) আর কৃষক, কলওয়ালা আর পুরোহিত, এরা প্রত্যেকেই পল্লী-সমাজের এক-একটি অংশ ছিল, আর এই সমাজ গতিশীল ছিল আচার-অনুষ্ঠানের এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা কর্তব্যবোধের ভিত্তিতে। মিস্ত্রি আর বণিকরা কোন গিল্ডের (guild) সদস্য বা কোন শহরের বাসিন্দা ছিল এবং কার্যক্ষেত্রে না হলেও অন্ততঃ রীতি অনুযায়ী ঐ গিল্ড বা শহরের সনদের ভিত্তিতে তাদের কর্তব্য এবং মর্যাদা স্থির করা থাকতো। ধর্মের অনুশাসন ছিল এই যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সামাজিক বিধানেরই উপরে রয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত একটি সার্বভৌম প্রাকৃতিক আইন। যদি দেখাই যায় যে বহুলোক পরিশ্রম করেও সামান্য কয়েক জনকে তাদের শাসন করবার আর যুদ্ধ করবার কারণে ভাল খাওয়া-

www.pathagar.com

পরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বা কাউকে কাউকে উপাসনা করেই দিন কাটাতে হচ্ছে, তা হলে এর কারণটা এই যে ওইসব প্রয়োজনীয় কাজ যাতে করা সম্ভব হয়, সেই জন্যই ঈশ্বর এমন সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তবুও মধ্যযুগীয় ঐ সামাজিক ব্যবস্থা দ্রুত বিদায় নিচ্ছিল এবং অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝিতে লন্ডনের মত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ব্যাংকিং, টাকা খাটানো আর টাকা উপার্জনের কাজে উৎসর্গীকৃত কর্মব্যস্ত শহরগুলো থেকে তা প্রায় সম্পূর্ণই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সেই সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার আর কর্তব্যের ভিত্তিতে সংগঠিত গোত্র কেন্দ্রিক সমাজিক ব্যবস্থাকে কি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে ? সেক্ষেত্রে সমাজে শুধু এক–এক জন ব্যক্তিই রইল, আর তাও কতকগুলো স্বার্থপর ব্যক্তি, নিজের খেয়ালে পরিচালিত আর অপর সকলকে যে উপায়েই হোক, ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠতে ব্যস্ত এমনই সব ব্যক্তি, সে ক্ষেত্রে সমাজটা কি মোটেও কাজ করতে পারবে ? ব্যক্তিতাবাদের এই বিশৃঙ্খল পরিবেশে কিভাবে আবার সামাজিক সামঞ্জস্য বিধান অর্জিত হবে ?

ইংরেজদের জীবনে ব্যক্তিতাবাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড ছিল রাজনীতি ছাড়া জীবনের অন্য সকল বিষয়েই একটি মুক্ত সমাজ। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং নতুনের প্রবর্তন তখন একটা সার্বজনীন ঘটনায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ব্যবহারিক এবং কারুশিল্প উভয় ক্ষেত্রেই এটা ছিল ইংরেজ মৃৎশিল্প এবং চিপেন্‌ডেল বা শেরাটনের মত বিখ্যাত আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ইত্যাদির জন্য এক স্বর্ণযুগ। ইংরেজ চিত্রকলায় গেইন্‌স্‌ বোরো, রেনোলড্‌স্‌, রোমনি এবং অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয়রা এই সময়েই আসেন এবং হ্যান্ডেল এই যুগেই তাঁর সুবিখ্যাত সংগীতগুলো রচনা করেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অভিনব সৃষ্টি দেখা যায়ঃ উপন্যাস (ডেফোর 'রবিনসন ক্রুশো,' রিচার্ডসনের 'প্যামেলা' এবং ফিলডিংয়ের 'টম জোন্‌স্‌'), নতুন আঙ্গিকে জীবনী (বসওয়েলের 'লাইফ অব স্যামুয়েল জনসন'), সাধারণের উপযোগী ইতিহাস (হিউমের 'হিস্ট্রি অব ইংল্যান্ড' এবং গিবনের 'ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার') এবং সাময়িক রচনাবলী (দি টাটলার এবং দি স্পেক্টেটর পত্রিকায় প্রকাশিত অ্যাডিসন এবং স্টিলের লিখিত)। লন্ডন থেকে প্রথম দৈনিক খবরের কাগজ বের হলো, আর প্রথম মাসিক পত্রিকাও দেখা গেল এই সময়েই।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে নতুন পালক যোগ হলো, ক্যানাডা,জিব্রাল্টার, মাল্টা আর সিংহল দখলে। ভারতে ইংরেজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে লর্ড ক্লাইভ আর

www.pathagar.com

ওয়ারেন হেস্টিংস। ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কুক প্রায় এক দশকের চেয়েও বেশী সময় ধরে প্রশান্ত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউজিল্যান্ড এবং ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাওয়াই পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে আবিষ্কার অভিযান করে বেড়ান। জর্জ ভ্যাঙ্কুভার আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল আবিষ্কার করেন। জেম্‌স্ ব্রুস এক দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশের গভীরে গিয়ে সেখানে নীল নদের উৎস আবিষ্কার করেন। শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বাণিজ্যিক আর নৌ শক্তিতে তারা ওলন্দাজদের থেকে শীর্ষস্থান ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ইউরোপের প্রধান নৌ-বন্দরে এবং আর্থিক লেন-দেনের কেন্দ্র হিসাবে আমস্টার্ডামের স্থান দখল করে নেয় লন্ডন।

কারিগরি কৌশলের পরিবর্তন তখন শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পর পর কয়েকটি নতুন আবিষ্কারের ফলে বস্ত্রশিল্পের যে পরিবর্তন এলো তাতেই আধুনিক পদ্ধতিতে বস্ত্র প্রস্তুত শুরু হয়। শিল্প বিপ্লব ত্বরান্বিত হলো, ল্যাঙ্কাশায়ার আর লিভারপুল বিরাট শিল্প শহর আর নৌ-কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ১৭৩৮ সনে জন কে. 'ফ্লাইং শাট্‌ল্' আবিষ্কার করেন, যার ফলে বয়ন শিল্পের উৎপাদনের গতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ফলে সূতার অভাব দেখা দিল। এর ফলেই ১৭৬০ দশকের মাঝামাঝি জেমস্ হারগ্রিভের সূতাকাটার যন্ত্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তার কয়েক বৎসর পরেই রিচার্ড আর্করাইট নামে এক প্রাক্তন নাপিত আরও উন্নত ধরনের সূতাকাটার যন্ত্র আবিষ্কার করে। ১৭৭৯ সনের মধ্যে শ্যামুয়েল ক্রম্পটন নামে একজন ছোট কৃষকের সন্তান সূতা কাটার মাকুর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন, যার দ্বারা অত্যন্ত চিকন সূতা আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হলো; ক্রম্পটনের এই আবিষ্কারটা অন্যেরা চুরি করে এবং তিনি দারিদ্র্যের মধ্যেই মারা যান। কিন্তু ইংরেজদের বস্ত্রশিল্পে তিনিই সর্বোত্তম প্রেরণার সৃষ্টি করে যান। অধিক পরিমাণে সূতা উৎপাদনের ক্ষমতা অধিক তুলার চাহিদা সৃষ্টি করলো, আর আমেরিকার এলি হুইট্‌নে তুলার আঁশ থেকে বীজ পৃথক করার কল (cotton gin) তৈয়ার করে। যার ফলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্রুত তুলা পরিষ্কার করা সম্ভব হলো। পৃথিবীর সর্বত্রই তুলা উৎপাদন বিপুলভাবে বেড়ে গেল, আর সেই সাথে বাড়লো আমেরিকায় খামারের কাজে ক্রীতদাসের ব্যবহার।

শিল্পে নব-আবিষ্কারসমূহ আসার আগে কৃষিতে নতুন যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। জেথরো তুল নামক এক কৃষক ভদ্রলোক অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এক ধরনের ড্রিল (drill) চালু করেন, যা দিয়ে সারিবদ্ধভাবে

www.pathagar.com

বীজ বপন করা সম্ভব হয়। চার্লস টাউনসেন্ড, (যিনি অ্যাডাম স্মিথের উপকারকের দাদা এবং একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্র পরিচালক ছিলেন), ১৭৩০ সনে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর নতুন ধরনের ফসল, বিশেষ করে টারনিপ (turnip) এবং ক্লোভার (clover) জাতীয় পশু খাদ্যের উন্নয়নের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। এটা ছিল একটা বড় ধরনের পরিবর্তন, কারণ ইতিপূর্বে জমির উর্বরতা শক্তি ফিরে পাবার জন্য শুধু পতিত ফেলেই রাখতে হতো। কিন্তু এখন দেখা গেল যে জমিতে পশুখাদ্য জন্মানো এবং একই সাথে এক বছরের জন্য জমিটাকে বিশ্রাম দেওয়াও সম্ভব। রবার্ট বেকওয়েল নামে আর একজন সফল কৃষক উন্নত ধরনের পশু-প্রজননের কৌশল এবং পশু-পালনের উন্নতর ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেন। কৃষি বিষয়ের বিখ্যাত লেখক আর্থার ইয়ং প্রায় সারা জীবনই কাটিয়েছিলেন ঐসব নতুন পদ্ধতির প্রচারণায় এবং সেগুলোর সাফল্যের জন্য জমি ঘেরার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে। কৃষির নতুন কৌশলসমূহের জন্য খামারের বড় আকার, অধিক মূলধন আর মাঠের চর্তুদিকে ঘেরা (enclosure) থাকা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের উন্মুক্ত জমিগুলো চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে ঘেরা-বেড়া দেওয়া হয়। ছোট খামার আর গ্রাম শুদ্ধ লোকের জন্য সাধারণ মাঠ বা চারণ ক্ষেত্রগুলি বন্ধ করে সেই জায়গায় বড় বড় খামার গড়ে তোলা হলো। কৃষির ফলন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ার অর্থ হলো এই যে আরও অধিক সংখ্যক লোক বর্ধিষ্ণু শিল্পনগরগুলোতে গিয়ে শিল্প শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে পারলো।

সে সময়ের কয়েকটি প্রধান ঘটনা এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা বলা হলো। এর বাহিরে সহস্র সহস্র মানুষ ব্যবসায়ে, শিল্পে, কৃষিতে অনুসন্ধান এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের, শিল্পকলা এবং ইংরেজদের জীবনের অন্যান্য বিভিন্ন দিকে উদ্যম আর কল্পনা শক্তির প্রয়োগ দ্বারা এইসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। ওদের অনেকেই খুব সাধারণ অবস্থা থেকে শুরু করে। এমনকি ক্ষমতাবানদের শেষ আশ্রয়স্থল রাজনীতির ক্ষেত্রেও এডমন্ড বার্কের মত কোন কোন নবাগত নিজের পরিশ্রমের দ্বারা খ্যাতি এবং ক্ষমতার আসনে পৌছে গেলেন।

এটাই ছিল সামাজিক ঘটনাবলীর ব্যবহারিক, প্রাত্যহিক দিক, যা অ্যাডাম স্মিথের মত দার্শনিকরা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের চতুর্দিকে এমন এক অর্থনীতি গজিয়ে উঠছে পরিবর্তনই যার বৈশিষ্ট্য। সহস্র সহস্র মানুষের নিজের স্বার্থে কাজ করার কারণে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল। এইসব ঘটনার পশ্চাতে কোন বিশেষ নিয়ম বা কারণ দেখা যাচ্ছিল না, তবুও দৃশ্যতঃ,

www.pathagar.com

থেমে থেমে হলেও মনে হচ্ছিল যে মনুষ্যত্ব একটা সুদিনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। একটি বিষয়ে অবশ্য তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন ছিল ঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, প্রতিযোগিতামূলক পরিবর্তনশীল সমাজে শৃঙ্খলাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের উন্মেষের জন্য নীতিমালা কিভাবে স্থির করা যাবে ? আর একদিক দিয়ে দেখলে, প্রশ্নটি ছিল একান্তই ব্যবহারিক। সরকারী নিয়ম-কানুন আর নিয়ন্ত্রণ কি ঐ ধরনের সমাজের উন্নতির জন্য সহায়ক না ক্ষতিকর ?

প্রাকৃতিক নিয়ম ঃ বিজ্ঞানে এবং রাষ্ট্রনীতির তত্ত্বে

অ্যাডাম স্মিথের সময়ে পৃথিবী সম্পর্কে এক নতুন মত আত্মপ্রকাশ করছিল আর সেই কাঠামোর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানীরাও মানবিক আর সমাজিক সম্পর্কগুলোর নতুন ব্যাখ্যা গড়ে তুলতে শুরু করলেন। রেঁনেসাঁ (পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী) চালু করলো এক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রিফরমেশন (ষোড়ষ শতাব্দী) প্রাকৃতিক আর সামাজিক ঘটনাবলীর ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে একান্ত দুর্বল করে দিল। সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আর গণিত শাস্ত্রের উন্নতি ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিকল্প হিসাবে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাকেই অধিক সমর্থন যোগায়, যার তাত্ত্বিক অর্থ হলো এই যে, যা কিছু ঘটছে, শুধু প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারাই তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি অর্জিত হয় ইংরেজ পদার্থবিদ আইজাক নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) দ্বারা। তাঁর 'ম্যাথমেটিক্যাল প্রিন্সিপ্‌লস অব ন্যাচারাল ফিলসফি' (১৬৮৭) গ্রন্থে বিশ্বব্রহ্মান্ডকে বর্ণনা করা হয় একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে, যার অন্তভুক্ত ছিল মাধ্যাকর্ষণ, শক্তির সমতা অর্জনের জন্য তার অক্ষয়ত্ব, কিম্বা ভারসাম্যের তত্ত্ব, যে ব্যবস্থায় যাবতীয় বস্তুরই এক-একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। সাধারণের কাছে তাঁর এই মহান তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয় যখন ১৭৫৯ সনে হ্যালীর ধূমকেতু ফিরে আসে, যেটা এডমন্ড হ্যালী কক্ষপথ হিসাব করে ১৬৮২ সনেই ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছিলেন।

অন্যান্য বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হয় এই প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্রকে ভিত্তি করে। রবার্ট বয়েল ১৬৬০ সনে আবিষ্কার করেন যে গ্যাসের আয়তন চাপের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। এন্টনী ল্যাভোয়াসীয়ে মাত্রিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা বস্তুর অক্ষয়ত্বের প্রমাণ দেন। বস্তুর আকারের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু তার পরিমাণের পরিবর্তন হয় না। জীববিজ্ঞানে উইলিয়াম হার্ভে রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তা চাক্ষুষ দেখাতে সক্ষম হন, এবং অষ্টাদশ

www.pathagar.com

শতাব্দীতে উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর প্রাণীবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরস্পর সম্পর্কিত নানা শ্রেণীতে ভাগ করে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তীতাই সপ্রমাণ করলেন।

সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিভাগ প্রাকৃতিক সূত্র নিয়মের বাঁধন আর ভারসাম্যের উপর জোর দিতে থাকে, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political Theory)। ওলন্দাজ আইন বিষয়ক তাত্ত্বিক এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের স্রষ্টা হুগো গ্রোটিয়াস্ (১৫৮৩-১৬৪৫) এ বিষয়ে মৌলিক ধারণাগুলো বিবৃত করেছেন। গ্রোটিয়াসের বক্তব্যের মৌলিক নীতি ছিল এই যে মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব এবং কোন ধরনের সামাজিক সংগঠন ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। সুতরাং তার যুক্তিতে মানুষের সমাজকে যদি টিকে থাকতে হয়, তবে সমাজের কিছু ন্যূনতম শর্ত বা প্রকৃতি নির্দেশিত-নিয়ম থাকতেই হবে। গ্রোটিয়াস সমাজের প্রকৃতি নির্দেশিত শর্তগুলো উল্লেখ করেন। সম্পদের নিরাপত্তা, ব্যবহারিক ন্যায়নীতি এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা আর অর্জিত পারিশ্রমিকের মধ্যে সামঞ্জস্য।

অবশ্য ইংল্যান্ডেই রাষ্ট্রের এই প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্ব সব চেয়ে বেশী পরিণতভাবে গড়ে উঠে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে ইংরেজরা ঈশ্বর প্রদত্ত সর্বময় ক্ষমতার দাবীদার রাজতন্ত্রের পরিবর্তন করে, শাসিতের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত ছিল। এইসব ঘটনা এবং বিতর্ক থেকেই গণতন্ত্রের প্রাচীন (classical) তত্ত্বের উদ্ভব হয়। বলা হলো যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বার্থপর এবং সে ব্যক্তি হিসাবে নিজেদের স্বাভাবিক অধিকার ঃযেমন বেঁচে থাকা, স্বাধীনতা এবং সম্পদের মালিকানা রক্ষার জন্যই সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। চরম রাজতন্ত্রের সমর্থক টমাস হবস্ (১৫৮৮-১৬৭৯) সার্বভৌম রাজক্ষমতার সমর্থনে বলেন যে রাজা যত শক্ত হাতে রাজ্য শাসন করবে, ততই মানুষের স্বার্থপরতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রবণ স্বভাবকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজে সফল হওয়া যাবে। অপর পক্ষে জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) বলেন যে শৃঙ্খলা আর স্বাধীনতা যুগপৎ অর্জিত হওয়াও সম্ভব। জনগণ সরকার প্রতিষ্ঠা করে অরাজকতা এড়ানোর জন্য আর তাদের প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার সংরক্ষণের জন্য, কিন্তু সর্বময় ক্ষমতা কাউকেই দেয়া যায় না। রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো প্রাকৃতিক অনুশাসনের প্রয়োগ আর এ থেকে যারা বিচ্যুত হবে তাদের জন্য শাস্তির বিধান, এবং প্রাকৃতিক আইনের স্থান এমন কি রাষ্ট্রের বিধানের চেয়েও উর্ধ্বে। লকের মতে, এই কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিকে তার

www.pathagar.com

কাজের অবাধ অধিকার দেওয়া যেতে পারে। গণতন্ত্রী তত্ত্বের এই ভিত্তির সাথে লক্ এবং তার অনুসারীরা জুড়ে দেন সংখ্যাগুরু দ্বারা শাসনের সূত্র। শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রতেকের স্বার্থই আসলে অভিন্ন, এবং সকলের জন্য যা মঙ্গলজনক তা স্থির করবার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো সকলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ। শুধু ব্যক্তির নিজের পক্ষেই জানা সম্ভব তার স্বার্থের পক্ষে কি মঙ্গলকজনক হতে পারে এবং যদিও কোন একজনের পক্ষে একবার ভুল করা সম্ভব, একটি বিরাট দলের পক্ষে বড় রকমের ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা খুবই অপ্রত্যাশিত। পরিশেষে উদারপন্থী রাজনৈতিক দর্শনে সংযুক্তি এল ইহুদি দার্শনিক বারুচ্ স্পাইনোজার (১৬৩২–১৬৭৭) নিকট থেকে। ক্ষমতাকে সুবিচারের সাথে সম্পর্কিত করার জন্য সরকারের অভ্যন্তরে বাধা এবং ভারসাম্যের প্রয়োজন আছে। ইংরেজ রাজনৈতিক তাত্ত্বিকগণ সাথে সাথেই এই ধারণাটিকে নিজেদের গণতান্ত্রিক তত্ত্বের সাথে একত্রীভূত করে নিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজনৈতিক দার্শনিকরা প্রাকৃতিক নিয়মের কর্মবিধির ভিত্তিতে উদারপন্থী গণতন্ত্রের একটি মতবাদ গড়ে তুললেন। একই ভিত্তিতে অর্থনীতির বিশ্লেষণ করাটা রইল পরবর্তী কর্মসূচীতে। অর্থনৈতিক জীবনে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োগ এবং তার সাথে ব্যক্তি স্বাধীনতা আর সরকারী কার্যক্রম নিয়ে শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন লেখক সুসংগঠিতভাবে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেও কয়েকবার বিফল হয়েছেন। সমাজ দর্শনের এই সমস্যাটির দিকেই অ্যাডাম স্মিথ তাঁর প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করলেন, তারই ফলে পাওয়া গেল 'ওয়েলথ অব নেশানস্'।

স্মিথের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভিত্তিক ব্যবস্থা

স্মিথ এক ধরনের 'প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভিত্তিক ব্যবস্থা'র (System of Natural Liberty) পক্ষে ওকালতি করেন, যেখানে প্রত্যেক মানুষকেই স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেওয়া হবে। তাঁর মতে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পরিমাণ সম্পদ অর্জন সম্ভব হবে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থে কাজ করে যাবে, তখন গোটা সমাজের জন্য এবং ব্যক্তিদের জন্যও সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হবে। এই সহজ সূত্রের ভিত্তিতেই একটি ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থাতেও সামাজিক শৃঙ্খলা গড়ে উঠবে।

মার্কেন্টাইলিজম এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা মনে করতেন যে ব্যক্তির নিজের স্বার্থপরতা দেশের জন্য কম সম্পদ গড়ে তুলবে যদি এই মানবিক

www.pathagar.com

কর্মকান্ডকে নিয়মানুগ এবং নিয়ন্ত্রিত না করা যায়। ধরে নেয়া হ'ল যে যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সকলের জন্য অধিক প্রাপ্তির দিকে পরিচালিত করা না হয়, তবে 'আমার' জন্য বেশী পেতে হলে অবধারিত নিয়মে 'তোমার' ভাগটা কম হতে হবে।

স্মিথের মতে এই যুক্তিটা ছিল ভুল। আমি যদি তোমার কাছে কিছু চাই, আমাকে এমন কিছু উৎপন্ন করতে হবে যা তুমিও চাও এবং তোমার যা আছে তার সাথে বদল করা যাবে। এতে আমাদের উভয়েরই লাভ, কারণ আমরা উভয়ই এমন কিছু দিচ্ছি, যার মূল্য আমাদের উভয়ের কাছেই বিনিময়ে যা পাচ্ছি তার চেয়ে কম। সুতরাং এই বিনিময়ের দ্বারা আমাদের পূর্বের অবস্থার চেয়ে কল্যাণের পরিমাণ বেশী হচ্ছে।

অ্যাডাম স্মিথের ভাষায়ঃ "আমরা যে আমাদের খাবার আশা করি, সেটা কসাই, শৌণ্ডিক বা রুটিওয়ালার দয়ার উপর নির্ভর করে নয়, বরং তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই এটার সরবরাহ হবে। আমরা তাদের স্বার্থের সাথেই কথা বলি, তাদের মহানুভবতার সাথে নয়, আর আমাদের কি দরকার সেটা তাদের সাথে আলোচনা করি না বরং তাদের সুবিধাটাই আলাপের বিষয়বস্তু"।

স্মিথের মতে স্বাধীন সমাজের নিজের স্বার্থই সমাজকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম অগ্রগতি আর উন্নতি এনে দেবে। মানুষ নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য সঞ্চয় করবে আর এটা করতে গিয়ে তারা জাতির সম্পদে অধিক মূলধন যোগ করবে। তারা এই মূলধন ব্যবহার করবে সবচেয়ে লাভবান পথে আর তার ফলে তারা এমন সব জিনিস উৎপাদন করবে যা অপর সকলে সবচেয়ে বেশী চায়। এমন কি যেখানে বিনিয়োগের স্বাধীনতাকে আইন আর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বাধা দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও এই সব প্রেরণা এমনি জোরালো থাকবে যে এসব সত্ত্বেও উন্নয়ন আর সম্পদ বাড়বে।

"সরকারের অপচয় এবং প্রশাসনের মারাত্মক ভুল সত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষের নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য নিয়মিত, অবিরাম আর বাধাহীন যে প্রচেষ্টা (এটাকে নীতিগতভাবে ব্যক্তির ও জাতীর সকল ধনসম্পদের উৎস বলা চলে) তা থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উন্নতি আর উৎকর্ষ আসে"।

অ্যাডাম স্মিথের মতে সরকারই ছিল অর্থনৈতিক উন্নতির পথে সর্বপ্রধান বাধা। প্রাকৃতিক স্বাধীনতার কাঠামোতে চিন্তা করলে সরকারের ন্যায়সঙ্গত কর্তব্য মাত্র তিনটি। সুবিচারের প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ, জাতীয় প্রতিরক্ষা, এবং

www.pathagar.com

কতক কতক সরকারী পূর্তকর্ম এবং সরকারী সংগঠনের সৃষ্টি, যেগুলো কোন ব্যক্তির বা মাত্র কয়েক জনের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত বা চালু রাখা হবে না। অবশ্য ঐ শেষের বিভাগটিতে স্মিথ বেশী জিনিস রাখার পক্ষে ছিলেন না। রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, হ্যাঁ, কিন্তু তারও ব্যয়ভার বহন করতে হবে ওগুলোর ব্যবহারকারীদের দেয় টোল দ্বারা, সাধারণ করদাতাদের অর্থের দ্বারা নয়। শিক্ষা এবং ধর্মীয় প্রশিক্ষণটা চলতে পারে, কারণ ওতে সকলেরই উপকার হয়, তবে ওটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা স্বেচ্ছাসেবকদের চাঁদা এবং সরকারী অর্থ উভয় পথেই আসা উচিত। এ ছাড়া আর যে কোন রকম প্রতিষ্ঠানই সরকারী মালিকানায় লাভের তুলনায় বেশী ক্ষতিকারকই হবে, তা সে যত মহৎ উদ্দেশ্যেই হোক।

"যদি কোন ব্যবস্থা এমন হয় যাতে শিল্প বিশেষে স্বাভাবিকভাবে যতটা পুঁজি বিনিয়োগ দরকার, তার চেয়ে বেশী বিনিয়োগ ঘটায়, তবে সেটা সমাজের সম্পদ আর গৌরব বৃদ্ধির বদলে বরং তা হ্রাসই করবে।"

যদিও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্মিথের মনোভাব সদয় ছিল না, তবুও এটা মনে করা উচিত হবে না যে তিনি ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারের সমর্থন করতেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে সুযোগ করে নেবার জন্য ষড়যন্ত্রের একটা প্রবণতা আছে, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।

"একই ব্যবসার লোকদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়, এমন কি আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষেও নয়, কিন্তু দৈবাৎ যখনই তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়, তার উপসংহারে হয় জনসাধারণের বিপক্ষে কোন ষড়যন্ত্র, না হয় জিনিসের দাম বাড়ানোর কূটকৌশল থাকবেই।"

তবুও স্মিথ একচেটিয়া ব্যবসাকে ভয় করতেন না। তিনি যে যুগের মানুষ, সেটা ছিল একালের চেয়ে অনেক সরল; সুবিশাল প্রতিষ্ঠান আর প্রকান্ড শিল্পকারখানাগুলোর তখনও জন্ম হয় নি। তাঁর গ্রন্থে একমাত্র শিল্প উৎপাদনের উদাহারণ পিন কারখানা, যাতে মাত্র দুই ডজন কারিগর কাজ করতো। সে সময়ে যে কোন কারবার শুরু করতে সামান্য পুঁজি লাগতো, প্রকৌশল ছিল সহজ এবং সকলেই তা পেতে পারতো। তবে সরকার যদি কাউকে বিশেষ সুবিধা দিতেন আর তা সংরক্ষণ করতে থাকতেন, একমাত্র তখনই একচেটিয়া কারবার সম্ভব হতো। স্মিথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সরকারী সংরক্ষণ ছাড়া বেসরকারী একচেটিয়া কারবার বেশী দিন টিকে থাকবে না। একচেটিয়া মুনাফা

www.pathagar.com

সাথে সাথেই প্রতিযোগিতা ডেকে আনবে, যা শেষ পর্যন্ত ঐ একচেটিয়া অবস্থা নষ্ট করে দেবে।

স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার

আপন স্বার্থটা যদি অর্থনীতির প্রাণশক্তি হয়, তা হলে যে পদ্ধতির মাধ্যমে এটা কার্যকর হয় তা হচ্ছে স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার। লাভের আশায় বিক্রেতাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা স্বভাবতই খরিদ্দারদের ইচ্ছা এবং পছন্দের সাথে খাপ খাওয়ানো একটি উৎপাদন পদ্ধতির সৃষ্টি করবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় লাভটা সর্ব নিম্নে এমন পর্যায়ে থাকবে যাতে উৎপাদনকারীরা উৎপাদন করতেই মাত্র প্রেরণা অনুভব করে।

স্মিথের মতে প্রত্যেক জিনিসেরই একটা 'প্রাকৃতিক' (natural) মূল্য আছে। জিনিসটা উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন, আদিম সমাজে তাই দিয়েই এটা নির্ধারিত হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, সে ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক মূল্য নির্ভর করে উৎপাদনের ব্যয়ের উপরে, অর্থাৎ মজুরী, খাজনা (rent) আর লাভ এই তিনটির বাবত যে টাকাটা দিতেই হবে। যখনই কোন জিনিসের বাজার দরের সাথে তার প্রাকৃতিক মূল্যের পার্থক্য দেখা দেয়, তখনই বাজারের শক্তিসমূহ কাযর্কর হয়ে তা আবার সমপর্যায়ে নামিয়ে আনে। স্মিথ কথাটা এইভাবে বলেছেনঃ

"যখন কোন জিনিসের মূল্য, তার উৎপাদনের জন্যে প্রাকৃতিক মূল্যেই জমির খাজনা, শ্রমের মজুরী আর প্রস্তুত হবার পর জিনিসটা বাজারে আনা পর্যন্ত সকল খরচের যোগফলের চেয়ে বেশীও নয়, কমও নয়, তখন বলা যায় যে জিনিসটি প্রাকৃতিক দামেই বিক্রি হয়েছে। সম্ভবতঃ এটার যা মূল্য বা ওটা বাজার পর্যন্ত আনতে যা মোট খরচ হচ্ছে....।

যখন কোন জিনিস যে পরিমাণে বাজারে আনা হলো, তা চাহিদার তুলনায় কম, তখন যে সকল লোক মূল্য দিয়ে জিনিসটি পেতে চায়, তাদের সকলের মোট চাহিদা মেটানো যাবে না। তাদের মধ্যে সাথে সাথে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে, আর বাজার দর বেড়ে যাবে।

যখন বাজারে জিনিসের সরবরাহের পরিমাণ তার কার্যকর চাহিদার চেয়ে বেশী, সে ক্ষেত্রে যেসব খরিদ্দার জিনিসটি বাজারে আনা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়, খাজনা, মজুরী আর লাভের পুরো অংকটা দিয়ে তা কিনতে প্রস্তুত, তাদের কাছে সবটা বিক্রি করা সম্ভব হবে না, তখন বাজারে দামটা পড়ে যাবে।"

www.pathagar.com

দামের এইসব পরিবর্তন জিনিসের উৎপাদনের পরিমাণকেও পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া চালু করে দেয়। যখন বাজারে কোন জিনিসের দাম তার প্রাকৃতিক মূল্যের চেয়ে বেশী, তখন সে জিনিসটা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা এবং তা বাজারে উপস্থিত করা হবে। বিপরীত ক্রমে, বাজারের দাম যখন প্রাকৃতিক মূল্যের চেয়ে নীচে নামবে, অর্থাৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণগুলোকে তাদের প্রাকৃতিক মূল্য দেওয়াও সম্ভব হবে না, সেক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাবে। আবার উৎপাদন কিভাবে মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়, স্মিথ তা এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

"প্রত্যেক জিনিসেরই বাজারে আমদানির পরিমাণ তার কার্যকর চাহিদার সাথে স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়.... যদি কখনো আমদানির পরিমাণটা কার্যকর চাহিদার চেয়ে বেশী হয়, তবে জিনিসটির কোন কোন উৎপাদন অংশকে তাদের প্রাকৃতিক দরের চেয়ে কম মূল্যে নিতে হবে। সেটা যদি জমির খাজনা হয়, তবে জমিদার তার নিজের স্বার্থেই জমির একটা অংশ ঐ বস্তুর উৎপাদন থেকে বের করে নিয়ে আসবে; এবং এটা যদি মজুরী বা লাভ হয় তবে প্রথম ক্ষেত্রে শ্রমিকের, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়োগকারী উৎপাদকের নিজের স্বার্থেই তাকে শ্রমের বা পুঁজির একটা অংশ ঐ উৎপাদন থেকে তুলে নিতে উৎসাহিত করবে। অচিরেই বাজারে সরবরাহকৃত জিনিসের পরিমাণ কার্যকর চাহিদা মেটানোর জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে আর বেশী থাকবে না। তার মূল্যের বিভিন্ন অংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রাকৃতিক হারের পর্যায়ে পৌছাবে আর সম্পূর্ণ জিনিসটির দামও তার প্রাকৃতিক মূল্যের সমান হয়ে যাবে।

বিপরীতক্রমে, যদি বাজারের সরবরাহ যে কোন সময় কার্যকর চাহিদার চেয়ে কম হয়ে যায়, তবে জিনিসটির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কোন কোন উপাদানের মূল্য সেগুলোর প্রাকৃতিক মূল্যের চেয়ে বেশী হয়ে যাবে। সেটা যদি খাজনা হয়, সে ক্ষেত্রে সব ভূমি-মালিকের স্বার্থই তাদেরকে অধিক জমি ঐ সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য তৈরী করতে উৎসাহিত করবে; সেটা যদি মজুরী বা লাভ হয়, সেই ক্ষেত্রে সকল শ্রমিক বা ব্যবসায়ীর স্বার্থই তাদেরকে ঐ সামগ্রী অধিক প্রস্তুত করা আর বাজারে হাজির করাতে উৎসাহিত করবে। এইভাবে সেখানে যা উপস্থিত করা হবে, অচিরেই তা কার্যকর চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে জিনিসটির পৃথক পৃথক সকল উপাদানের মূল্যই আবার তার প্রাকৃতিক মূল্যের পর্যায়ে নেমে যাবে আর পুরো জিনিসটির দামও তার প্রাকৃতিক মূল্যেই নেমে আসবে।

www.pathagar.com

সুতরাং প্রাকৃতিক মূল্য (nutural price) হচ্ছে ধরতে গেলে একটি কেন্দ্রিক মূল্য যার দিকে সকল জিনিসের দাম সর্বদা আকর্ষিত হবে। বিভিন্ন ধরনের দূর্ঘটনা হয়তো কিছু সময়ের জন্য মূল্যকে তার উপরে থাকতে বা সময় সময় তার নীচেও নামতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু এসব বাধা যতই মূল্যকে তার এই বিরতির কেন্দ্রে স্থির থাকা থেকে বিচ্যুত করুক, সর্বদাই তার প্রবণতা থাকবে ঐ কেন্দ্রে পৌছতে।

সমগ্র শিল্প তাই সারা বৎসর বাজারে যে পরিমাণ জিনিস সরবরাহের প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে তা স্বাভাবিকভাবেই কার্যকর চাহিদার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে। তার সর্বক্ষণের স্বাভাবিক প্রবণতা হবে শুধু সেই পরিমাণ সামগ্রীই বাজারে উপস্থিত করারঃ যেটুকু সরবরাহ করা সম্ভব আর যতটা পরিমাণের জন্য চাহিদা রয়েছে।"

বিগত দুইশত বৎসরে বাজারের এই ভারসাম্যতার বর্ণনাতে অতি সামান্যই নতুন সংযোজন হয়েছে। হাল আমলের অর্থনীতিবিদরা প্রাকৃতিক মূল্যের (nutural price) স্থলে স্বাভাবিক মূল্য (normal price) কথাটা ব্যবহার করে থাকে, এবং ওই অবস্থার সঠিক শর্তগুলো দ্বারা আরও সাবধানতার সাথে সংজ্ঞায়িত করে। উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে আরও জটিল বিশ্লেষণ এখন সম্ভব হয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে মূল্যের পরিবর্তনের দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ প্রভাবিত হয়; সেটা আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু চাহিদা-সরবরাহ যে উপায়ে ভারসাম্য মূল্য (equilibrium price) স্থির করে সেই মৌলিক বর্ণনা, কিভাবে প্রতিযোগিতা সেই মূল্যটাকে শুধু বাড়তি উৎপাদন ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সীমা পর্যন্ত তুলে ধরে, এবং কেমন করে উৎপাদন প্রভাবিত হয় চাহিদার দ্বারা, এসব বিষয়ে পরবর্তীকালের অর্থনীতিবিদদের লেখা মূলতঃ অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছে।

স্মিথের এই স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার-অর্থনীতি বিষয়ক বিশ্লেষণের তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত গভীর। এতে দেখানো হয়েছে যে উৎপাদন নিজের থেকেই খরিদ্দারদের চাহিদার ধরনের সাথে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেবে, তা সে চাহিদা যেমনই হোক আর পরিবর্তন যতই যে ধরনের হোক। এতে দেখানো হয়েছে যে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা মূল্যটাকে এমন সর্বনিম্ন পরিমাণে নিয়ে যাবে, যেখানে খরিদ্দারদের সন্তুষ্টির পর্যায়ে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। এতে দেখানো হয়েছে সে সম্পদ ব্যবহার হবে সর্বাধিক দক্ষতা এবং মিতব্যয়িতার সাথে- এমন শর্তে যে খরিদ্দারদের পরিতৃপ্তির সাথে দক্ষতার আর মিতব্যয়িতার

www.pathagar.com

এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান হবে, যাতে দাম সবেচেয়ে কম রেখে সঠিক পরিমাণে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। আরো এতে দেখানো হলো যে এই সবই অর্জন করা সম্ভব বাজার-শক্তির অবাধ কার্যকারিতার মাধ্যমে, সরকারের কোন রকম হস্তক্ষেপ, নির্দেশনা বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান ছাড়াই।

স্মিথ অবশ্য জোর দিয়েই বলেন যে, এই আদর্শ সুফল অর্জিত হবে না, যদি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পূর্ণ স্বাধীনতা কোনভাবে বাধা পায়, যেমন, "উৎপাদকদের পদ্ধতিতে গোপনীয়তা", "ব্যবসায়ে গোপনীয়তা", "জমি আর পরিবেশের কোন একক বিশিষ্ট", "একচেটিয়া", এবং "প্রতিযোগিতাকে বাধাদানকারী আইনসমূহ"। স্মিথ বিশেষভাবেই সকল রকমের একচেটিয়া কারবারের বিপক্ষে ছিলেন, এবং তাঁর সবেচেয়ে ক্ষুরধার কিছু কিছু মন্তব্য ছিল ওটারই দোষ বর্ণনায়।

"একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা, সকল সময় বাজারে জিনিসের স্বল্পতা বজায় রেখে, কার্যকর চাহিদা কখনো পরিপূর্ণভাবে না মিটিয়ে, তাদের জিনিস প্রাকৃতিক মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী দামে বিক্রি করে থাকে, এভাবে তারা মজুরী, লাভ এবং সকল রকমের আয় প্রাকৃতিক হার থেকে অনেক উপরে রাখে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূল্য নির্ধারণ সব সময়ই খরিদ্দারকে যতটা সম্ভব শোষণের দ্বারাই করা হয়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর বাধা-নিষেধ, তা সে সরকার, ব্যবসায়ী, বা শ্রমিক যেখান থেকেই আসুক, তা যদি একচেটিয়া ব্যবসা সৃষ্টি করে, অ্যাডাম স্মিথ তার বিরুদ্ধেই ছিলেন।

দুটি ব্যতিক্রম

এই পর্যায়ে খোলা বাজার সম্পর্কে স্মিথের বিশ্লেষণের দুটি সীমাবদ্ধতার বিষয় মনে রাখা দরকার। ঐ সীমাবদ্ধতাগুলো হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিকদের সমালোচনার প্রধান উপজীব্য, এবং পরবর্তীকালেও অর্থনীতিবিদদের তত্ত্ব কখনোই তা সন্তোষজনকভাবে কাটাতে পারে নি।

প্রথম সীমাবদ্ধতাটা হচ্ছে "কার্যকর চাহিদার" প্রকৃতি, এবং আয় বন্টনের ধরনের উপর এর নির্ভরশীলতা। কথাটা তর্ক হিসাবে ভালই শোনায় যে উৎপাদন খরিদ্দারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আয়ের বন্টন যদি অত্যন্ত অসম হয়, তবে ঐ ব্যবস্থায় ধনী বেশী পাবে আর দরিদ্রের জন্য থাকবে সামান্য।

www.pathagar.com

আয়ের বন্টন যদি সঠিক আর ন্যায়সঙ্গত না হয়, তবে উৎপাদন যে দক্ষ আর মিতব্যয়িতা সম্পন্ন, এই যুক্তির মূল্য সামান্যই। আয়ের বন্টন যদি ভ্রান্ত হয় তবে উৎপাদনের ধারাও ভ্রান্তই হবে, তা খোলাবাজার যত যোগ্যতার সাথেই উৎপাদন আর চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করুক। শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে সৃষ্ট এই মৌলিক সমস্যাটা সমাজতন্ত্রীরা সাথে সাথে তুলে ধরেন আর তার কিছু পরেই কার্ল মার্কস্ এটার সম্প্রসারণ করেই পুঁজিবাদের বিপর্যয় সম্পর্কে দিলেন তাঁর তত্ত্ব। অতঃপর কয়েক পুরুষ ধরে অর্থনীতিবিদগণ এই সমস্যার উত্তর দিতে চেষ্টা করেন– ১৮৯০–১৯১০ সময়ে সর্বাধিক সাফল্যের সাথে, যদিও তার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নি।

দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতাটা অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে জমি আর মূলধন জাতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। একজন ভাল অর্থনৈতিক উদারপন্থী হিসাবে অ্যাডাম স্মিথ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাটা একাধারে প্রাকৃতিক এবং (অর্থনৈতিক প্রলোভন সজীব রাখার জন্য) প্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং ঐ ব্যবস্থার সমর্থন করতেন। অবশ্য তিনি এর প্রয়োজনীয়তা শুধু উন্নত সমাজের জন্যই স্বীকার করতেন। আদিম সমাজে উৎপাদনের ব্যয় বলতে শুধু মজুরীটাই একমাত্র উপকরণ। উন্নত সমাজে জমির খাজনা আর মূলধনের উপর মুনাফাটাও উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হয়ে যায়। অবশ্য খাজনা আর মুনাফা, এই দুটি উপাদান যে উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হচ্ছে, তা শুধু সামাজিক সংগঠনের ফলশ্রুতি হিসাবেই। ঐ দুটি স্পষ্টতই মানুষের শ্রম আর নিজের স্বার্থের প্রেরণার মত কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এই ব্যতিক্রম স্বীকার স্মিথের বাজার কেন্দ্রিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের সেই জমকালো পরিকল্পনাকে একদম নষ্ট করে দিল।

স্মিথের যুক্তিতে এই যে ফাঁক রয়ে গেল, সমাজতন্ত্রীরা সাথে সাথেই তার সুযোগ নিয়ে নিল। তাদের যুক্তি হল শুধু শ্রমের বিষয়ে ফিরে যাওয়াটাই প্রাকৃতিক এবং সমাজের প্রাকৃতিক রূপকে তখনই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, যখন জমি আর পুঁজির সামাজিক মালিকানার মাধ্যমে উৎপাদনের সম্পূর্ণ মূল্যটাই শ্রমিকের হাতে আসতে পারবে। আর তখনই অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারও অর্জিত হবে, যেহেতু তখন সমাজের সম্পূর্ণ উৎপাদনটাই, যারা কাজ করে তাদের হাতেই পৌছাবে এবং কার্যকর চাহিদার ধরনটাও অনর্জিত আয়ের দ্বারা বিকৃত হবে না। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে বর্তমান ব্যবস্থার সমালোচক এবং সমর্থকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার নিয়ে এই বিতর্ক আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

অ্যাডাম স্মিথ মূলতঃ আয় বন্টনের ন্যায় নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামান নি এবং সমাজতন্ত্র উত্থানের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থনীতিবিদদের কাছে এগুলো কোন গুরুতর সমস্যা বলেও মনে হয় নি। স্মিথ বরং অনেক বেশী ব্যস্ত ছিলেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে পৌছানো নিয়ে; আর সেটা তিনি ব্যাখ্যা করেন প্রত্যেক মানুষের মানসিকতার অন্তর্নিহিত প্রেরণার মাধ্যমে, যেটা প্রাকৃতিক আর অনিবার্যভাবেই একটি মুক্ত সমাজের মধ্যে সম্ভব।

স্মিথের মতে 'সমৃদ্ধির অগ্রগতি' তিনটি উপাদানের প্রত্যক্ষ ফল। শ্রমের বিভাজন, বাজারের সম্প্রসারণ আর পুঁজি সঞ্চয়ন। এই সব উন্নয়নের ফলে যখন উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে থাকে, তখনি 'একটি সার্বিক প্রাচুর্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে যেতে থাকে।'

স্মিথের মতে উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা (specialization) আর শ্রম বিভাগ (division of labour) "লেনদেন, জিনিসের সাথে জিনিসের বিনিময় বা কোন বস্তু দিয়ে অপর একটি বস্তু বদলে নেবার অন্তর্নিহিত প্রবণতার ভিত্তিতেই" গড়ে উঠেছে। কেবল মানুষের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায়। "কেউ কখনো এক কুকুরকে আর এক কুকুরের সাথে হাড় বিনিময় করতে দেখেনি"। তা ছাড়া যে মানসিক প্রবণতা মানুষকে ব্যবসায়ে উৎসাহিত করে আর তারই মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ হতে সাহায্য করে, সেটাই আবার আমাদেরকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীলও করে তোলে; এবং তারই মাধ্যমে বাজার অর্থনীতির জটিল সামাজিক বাঁধনেরও জন্ম দেয়। কথাটা অবশ্য একটু সেকেলে। এ কালের অর্থনীতিবিদ বলে যে, মানুষ একা তার প্রয়োজনীয় সবকিছু বানানোর চেষ্টা না করে একটি মাত্র জিনিসে পারদর্শিতা অর্জন করে, কারণ তাতেই উৎপাদন ক্ষমতা আর আয় বেশী হয়।

বিনিময় যে বিশেষজ্ঞতা আর শ্রমবিভাগের জন্ম দেয়, স্মিথের মতে "তার ব্যাপকতা নির্ভর করবে বাজারটা কত বড় তারই উপরে।" বাজার যদি ছোট হয়, তখন কারো পক্ষেই মাত্র একটি জিনিসই বানানো চলবে না। কিন্তু যখন বাজার সম্প্রসারিত হয়, মানুষ তখন পারদর্শিতার মাধ্যমে অধিক দক্ষতার সুযোগ নিতে পারে। যত বড় বাজার হবে, ততই অধিক বিশেষজ্ঞতা, উচ্চতর উৎপাদন ক্ষমতা আর সমধিক সম্পদ সৃষ্টি করা যাবে, আর সেই জটিল দ্রব্য বিনিময় সম্পর্কের সমস্যা সমাধানের জন্য টাকার ব্যবহারও ততই বাড়বে।

www.pathagar.com

এইসব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কোনটাই সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ মূলধন ছাড়া সম্ভব নয়। যার বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং আরও বৃদ্ধি পাবে বিশেষজ্ঞতা আর প্রসার লাভ করবে বাজার। মূলধনের সঞ্চয়নকে (accumulation of capital) অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের চাবিকাঠি মনে করা হতো। কিন্তু এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা ছিল সম্পত্তির নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল।

"যে কোন দেশেই যদি মোটামুটি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে, তবে সাধারণ বুদ্ধির প্রত্যেকটি লোকই তাদের যা কিছু সম্বল আছে, তা দিয়ে বর্তমানের উপভোগ, না হয় ভবিষ্যতের মুনাফা সংগ্রহে সচেষ্ট হবে। যেখানে অন্ততঃ কিছুটা নিরাপত্তা আছে, সেখানে যদি কেউ তার সম্বল অর্থটুকু তা সে নিজের হোক আর অন্যদের থেকে ধার নেওয়াই হোক, যদি সে কোথাও না খাটায়, তবে তেমন লোককে বলতে হবে বদ্ধ পাগল...।

যেসব দুর্ভাগা দেশে মানুষকে অহরহ তাদের চেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়ে থাকতে হয়, সেখানে তারা প্রায়ই তাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ মাটিতে পুঁতে অথবা লুকিয়ে রাখে, যেমনটা সাধারণতঃ দেখা যায় তুরস্কে, হিন্দুস্থানে এবং আমার মনে হয় এশিয়ার অধিকাংশ সরকারগুলোতেই।"

স্মিথ ভালই জানতেন যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে আসে পরিবর্তন আর বৈচিত্র্য। পুঁজি যখন জমা হতে থাকে, সেই সাথে সমৃদ্ধির স্বাভাবিক উন্নতিও অগ্রসর হতে থাকে, প্রথমে কৃষি থেকে শিল্পে, তারপর সেখান থেকে বাণিজ্যে এবং ধনবান সমাজের সমৃদ্ধি এই তিন দিকেই দৃশ্যমান হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল কৃষি জন্ম দেয় উদীয়মান শহরের, যেখানে আবার কৃষিজ সামগ্রীর জন্যেই বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি হয়, এবং উন্নত শহর আর পল্লীর সমাজ অধিকতর বাণিজ্য আর জাহাজ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করে। সম্প্রসারিত বাণিজ্য আরও উৎসাহিত করে রফতানির জন্য শিল্প আর বিশিষ্ট সব কৃষিজ উৎপাদন। উৎপাদনশীলতা যত বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যাও ততই বেড়ে যায়, তাতে বাজার আরও সম্প্রসারণের সুবিধা হয়, এবং বিশেষায়ন (specialization) আর পুঁজির সঞ্চয় অধিক উৎসাহিত হয়।

এই প্রক্রিয়ায় অর্থনীতি উন্নয়নের উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে অগ্রসর হতে থাকে আর সেই সঙ্গে সমস্ত সামাজিক বিন্যাসটাকেই উচুঁ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

তবুও সেই সঙ্গে এই প্রক্রিয়া সুশৃংখলভাবে বাজারে ভারসাম্য রক্ষা করে, যাতে সর্বক্ষণ উৎপাদনের প্রকৃতি কার্যকর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

প্রাকৃতিক স্বাধীনতার এই ব্যবস্থা এমন এক ভারসাম্য তৈরী করে, যার সামগ্রিক গতি সর্বদাই থাকে সমৃদ্ধির দিকে।

স্মিথের অবদান

স্মিথের বাজার-অর্থনীতি বিষয়ক বিশ্লেষণে জোরালোভাবে বলা হয় যে ব্যক্তিত্ববাদের (individualism) ফলে শৃঙ্খলা আসে, বিশৃঙ্খলা নয়। যদিও প্রত্যেকেই অপর সকলের সাথে সম্পদ আর মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতায় নামে তবুও তাদের এই প্রতিযোগিতাই বাজার শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি করে, যা থেকে আসে জাতীয় সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি। সমৃদ্ধির আকাঙ্খার সাথে ব্যবসা আর বিনিময়ের স্বাভাবিক প্রবণতা একত্রিত হয়ে বিশেষায়ন, মুলধন বিনিয়োগ আর স্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে অগ্রগতি সাধিত হয়। মুক্ত অর্থনীতি সেবা করে ব্যক্তির, যার প্রয়োজন আর আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি হয় খরিদ্দারের চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদনকারীদের দ্রব্য প্রস্তুত আর বিক্রি করার স্বাভাবিক প্রবণতার দ্বারা। এইভাবেই সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়।

আগের লেখকদের নৈতিক সংকটের একটা সমাধান পাওয়া যায় স্মিথের বিশ্লেষণে, এই অর্থে যে ব্যক্তির সাথে সামাজিক মঙ্গলের কোন বিরোধ নেই। ব্যক্তির স্বার্থপরতার মুক্ত প্রতিযোগিতামুলক ব্যবস্থার উপরেই এই পুরো কাঠামোটা দাঁড়িয়েছে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে ম্যান্ডেভাইল যেসব প্রেরণার প্রশংসা করেছিলেন, স্মিথ সেগুলোকেই তুলে ধরেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক শৃঙ্খলা আর সাধারণ কল্যাণের উৎস হিসাবে। ভ্রাতৃত্বের মঞ্জিলে পৌঁছানোর পথটা অন্ততঃ অর্থনৈতিক দুনিয়ায়, স্বার্থপরতার প্রতিযোগিতার মধ্যেই অবস্থিত। তাই যে প্রশ্নটা এক শত বৎসর ধরে সামাজিক দার্শনিক আর নীতিবাগীশদের বিব্রত করছিল, অবশেষে অ্যাডাম স্মিথ তার একটা উত্তর দিয়ে গেলেন।

তাছাড়া স্মিথ ভবিষ্যতের অর্থনীতিবিদদের জন্য অর্থনীতি বিজ্ঞানের জন্য একটি বিশ্লেষণের কাঠামোও দিয়ে গেলেন। প্রাচুর্য আর প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছানোর জন্য প্রতিযোগিতা ভিত্তিক বাজারের ভারসাম্য (market equilibrium) সম্পর্কে তার কল্পিত পথ এমন একটি সমস্যাকে সংজ্ঞায়িত করলো, যার সমাধান নিয়ে অর্থনীতি বিজ্ঞান বহুকাল ধরে নাজেহাল হচ্ছিল। স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার আর মূলধনের সঞ্চয় সহ তাঁর বর্ণিত সমাধান হলো পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

অর্থনীতিবিদদের দ্বারা পর্যাপ্তভাবে সম্প্রসারিত জটিল এক তাত্ত্বিক ব্যবস্থার (system) আরম্ভ স্থল। স্মিথের নিছক বৈজ্ঞানিক অবদানও পর্যাপ্ত এবং তাঁর রচিত মৌলিক কাঠামোটা এখনো বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়।

সহজেই বোঝা যায়, 'ওয়েলথ, অব নেশান্‌স' কেন পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বোত্তম গ্রন্থগুলোর অন্যতম হয়ে রয়েছে। এক হিসাবে এটা ছিল তৎকালীন সরকারের কাজ এবং নীতির বিরুদ্ধে লিখিত একটি বিতর্কমূলক রচনা। আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা ছিল মানব সমাজের শৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলা বিষয়ক মৌলিক সমস্যাবলীর উপরে লেখা একটি দার্শনিক রচনা। তৃতীয়তঃ এটা একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যার বিষয়বস্তু হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি ভাবে কাজ করে, তারই বিশ্লেষণ। এই তিনটি প্রসঙ্গই পরস্পরের সাথে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত যে এর কোন একটি যুক্তিকে পৃথকভাবে দেখা সম্ভব নয়, বরং একটি অন্যগুলিকে সমর্থন করে। মতাদর্শ, দর্শন আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এ এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

www.pathagar.com

৪
প্রাচীন অর্থনীতি

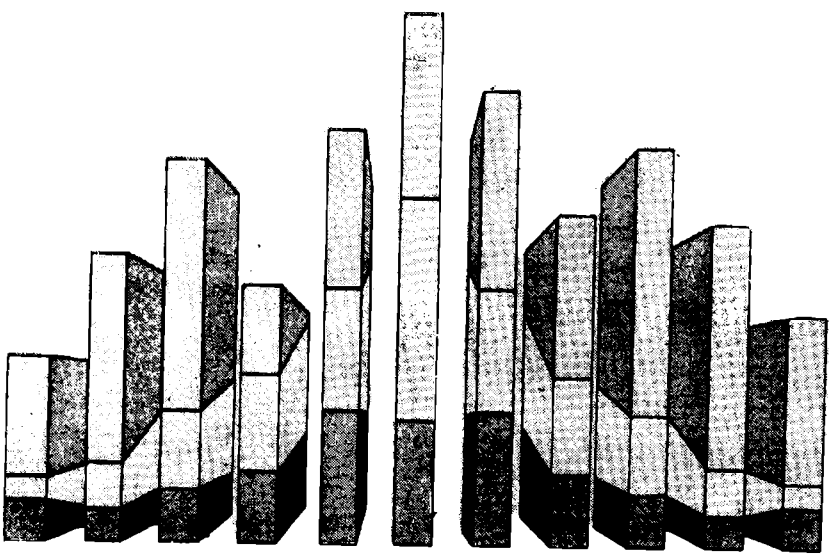

অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিতে একটি মতাদর্শের (school) প্রবর্তক। বিশেষভাবে ইংল্যান্ডেই শক্তিশালী হলেও স্মিথের অনুসারীরা ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রায় এক শতাব্দীর শেষের চতুর্থাংশ পর্যন্ত তারা অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এবং কমপন্থায় স্মিথের উদারিপন্থী দর্শন এবং তাঁর প্রাকৃতিক স্বাধীনতা তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি গোঁড়া মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের বিশ্লেষণ ব্যবস্থাটা স্মিথের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সরবরাহ আর চাহিদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সাধারণতঃ তারা ছিল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বাধীনতা আর সরকারের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের সমর্থক। তারা

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিল এবং অবাধ বাণিজ্য আর পুঁজির অবাধ চলাচল সমর্থন করতো। সাধারণতঃ এই ধরনের চিন্তাধারাকেই 'প্রাচীন অর্থনীতি' (Classical Economics) বলা হয়।

এই ক্লাসিক্যাল ব্যবস্থার বিষয়ে স্মিথ ছাড়া আরো চারজন অর্থনীতিবিদ বড় ধরনের অবদান রাখেন। তাঁদের নাম রবার্ট ম্যালথাস, ডেভিড রিকার্ডো, জেরেমি বেন্থাম এবং জিন ব্যাপ্টিস্ট্। মূলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর আলোড়নপূর্ণ প্রথম চতুর্থাংশে ক্রমাগত যুদ্ধ, বিপ্লব, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন প্রকৌশল আর রাজনৈতিক তোলপাড় থেকে অনুসারিত হয়ে বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে উঠছিল, সেই সময়টাতে ছিল তাঁদের কাজ, যখন তাঁরা কতকগুলো মৌলিক নীতির ভিত্তিতে অর্থনীতির বিশ্লেষণে সচেষ্ট হন। আর এই প্রচেষ্টার দ্বারাই তাঁরা অর্থনীতিকে সর্বপ্রথম সামাজিক 'বিজ্ঞান' হিসাবে গড়ে তুললেন।

ইংল্যান্ডে ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

অ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ্ অব নেশানস্' প্রকাশের পরেই দেখা যায়, শুরু হয়েছে বিপ্লবের একটি যুগ–মার্কিন উপনিবেশগুলোতে এক মহান রাজনৈতিক আর সামাজিক বিপ্লব এবং কিছু পরেই ফ্রান্সে যা ঘটে, তাতে সম্পূর্ণ ভেসে যায় ইউরোপে সমান্ততন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু, আর সেই সাথে প্রাচীন অভিজাততন্ত্রও। মার্কিন বিপ্লবের সমর্থনে ইংল্যান্ডেও পর্যাপ্ত সহানুভূতি ছিল, যেহেতু অনেক ইংরেজই মনে করতেন যে তাঁদের নিজেদের সমাজ সেকালের এক অবাঞ্ছিত ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছেন। মার্কিন বিপ্লবীদের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল, নিঃসন্দেহে বলা চলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ইংরেজ উদারপন্থীদের আপত্তি। ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক সংস্কার একটি জোরালো দাবী হয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু সামান্য জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত অনেক ছোট জেলারও পার্লামেন্টে প্রতিনিধি ছিল; কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বড় বড় শহরগুলির কোন প্রতিনিধি সেখানে ছিল না।

অনেক ইংরেজ ফরাসী বিপ্লবটাকেও ভাল চোখেই দেখে। তারা মনে করে, এর ফলে ফ্রান্সে গণতন্ত্র আসবে, সেখানেও ইংল্যান্ডের মতই একটা সমাজ গড়ে উঠবে আর সেই সাথে তাদের দুটি জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, যারা বিগত এক শত বৎসরেরও বেশী সময় ধরে একে অপরের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ করে এসেছে। উদারপন্থী হুইগ দলের নেতা বাস্টিলের পতনের প্রশংসা

www.pathagar.com

করে এটাকে "পৃথিবীর ইতিহাসে সব চেয়ে মহান এক ঘটনা" বলে আখ্যায়িত করেন। এমনকি টোরী প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পীট পর্যন্ত মনে করেন যে এই বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের সাথে ফ্রান্সের সাদৃশ্য বৃদ্ধি পাবে এবং তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে আগামী পনের বৎসর দুটি জাতির মধ্যে শান্তির সম্পর্ক বজায় থাকবে।

অবশ্য কিছু রক্ষণশীল ছিল যারা শুরু থেকেই ফরাসী বিপ্লবের বিরোধী ভূমিকা অবলম্বন করে। উদাহরণস্বরূপ, এডমন্ড বার্ক তাঁর 'রিফ্লেক্শনস্ অন দি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন' (১৭৯০) গ্রন্থে ফরাসী জনতা সে দেশের রাজা আর অভিজাতের প্রতি যে ব্যবহার করে তার প্রতিবাদ করেন এবং আশংকা প্রকাশ করেন যে ঐ "শুকরের গোষ্ঠী"র উঠতি আমূল সংস্কারকামী মতবাদ (growing radicalism) শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার আর শৃঙ্খলাকেই ধ্বংস করে দেবে।* যখন ত্রাসের রাজত্ব শুরু হল, বৃটিশদের মতামত বদলে গিয়ে তা রক্ষণশীলদেরই সমর্থন করলো। টমাস পাইনের (যিনি বার্কের জবাবে 'দি রাইটস্ অব ম্যান' [১৭৯০] লিখেছিলেন) মতো নেতারা কলঙ্কিত হলেন। অনেকেই মত পরিবর্তন করে রক্ষণশীলদের পক্ষে চলে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পীট ক্ষমতায় এসেছিলেন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারের দাবী নিয়ে, কিন্তু শেষে তাঁর নীতি হলো ঘোরতর রক্ষণশীল। এক সময়ে তিনি বললেন, "যেখানে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এলো, সেখানে যখন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখলাম..... আর সেই সাথে এটাও দেখলাম যে এই সার্বিক তোলপাড়ের মধ্যেও গ্রেট বৃটেনের সংবিধান খাঁটি আর অপরিবর্তিত রয়ে গেল। ... এখন আমার মত ঘোষণা করছি, যে এই সংবিধানের সামান্যতম পরিবর্তন করাটাও হবে অমঙ্গলজনক।" ফলে ইংরেজ সরকারের নীতি হলো অবস্থার কোন রকম পরিবর্তন না করা– তার চেয়েও বরং খারাপ–উদারপন্থীদের মতামতটা দমন করা।

ফ্রান্সের সাথে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন ইংল্যান্ডে 'অবাধ্যতার বিরুদ্ধে' আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। ১৭৯৫ সনে পাঁচ বছরের জন্য হেবিয়াস কর্পাস আইন মূলতবী করে রাখা হলো; সকল গোপনীয় সংগঠন বেআইনী করা হয়; যেসব জায়গায় চাঁদা দিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হতো সেসব জায়গা সভা

* এই বই–এর নামটা বার্কের রিফ্লেকশন্স থেকে নেয়া হয়েছে ঃ "বীর ধর্মের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে, জয় হয়েছে কূতার্কিক, অর্থনীতিবিদ আর হিসাবকারীদের, এবং ইউরোপের গৌরবদীপ্তি চিরকালের জন্য নিভে গেল।" সে কালেও অর্থনীতিবিদদের উদারপন্থী সংস্কারক মনে করা হতো।

www.pathagar.com

বন্ধ করার জন্য আইনতঃ বেশ্যালয়ের সাথে শ্রেণীভুক্ত করা হলো, যে কোন সভায় যদি পঞ্চাশ জনের বেশী লোক হয়, তবে সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হলো; সকল ছাপাখানাকে সরকারের তালিকাভুক্ত করা হলো; ইংরেজী সংবাদপত্র বিদেশে রফতানি নিষিদ্ধ করা হলো; 'পত্রলেখক সংঘ' (corresponding society) নামে উদারপন্থীদের একটি দল যখন তাদের উদারপন্থী সংবাদাদি পত্রের মারফত প্রচারের চেষ্টা করে, তাদেরও দমন করা হলো ১৭৯৯ সনে। সেই বৎসরে এবং পরবর্তী বৎসরে 'অ্যান্টি কম্বিনেশন' আইন (Anti-combination Law) পাশ করা হয়, যার দ্বারা শ্রমিক বা মালিকদের কাজের শর্ত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে কোন রকম সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। মালিকদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগের কোন নজির নেই, কিন্তু এর আওতায় শ্রমিকদের শাস্তি দেয়া হয় আর নব গঠিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলো ধ্বংস করা হয়। অর্থাৎ দমননীতির একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল।

সংস্কারটা যদি বা বন্ধ করা গেল, কিন্তু ঘটনার অগ্রগতি থামানো সম্ভব হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আর ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যুদ্ধের বৎসরগুলোতে ব্যাপক আর দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। যুদ্ধকালীন চাহিদার ফলে শিল্পায়ন বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়। যুদ্ধের কারণে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি কৃষি বিপ্লব ত্বরান্বিত করে। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আর মানুষ গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছিল। শহরের সম্প্রসারণের সাথে সাথে নাগরিক জীবনের নানা উপসর্গ, যেমন বস্তি, অপর্যাপ্ত ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পানির অভাব ইত্যাদি ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এই সব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট অর্থনৈতিক আর সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হলো না। এদিকে "পরিবর্তন বিরোধী গোষ্ঠী" (the establishment) নিজেদের পথ আঁকড়ে থেকে মৌলিক পরিবর্তনপন্থীদের (radicals) উৎখাতের কাজে আত্মনিয়োগ করলো।

ম্যালথ্যাস এবং জনসংখ্যা তত্ত্ব

ফরাসী যুদ্ধ চলার সময়ে যে সমস্যাটি কঠিনভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা ছিল দরিদ্রদের নিয়ে। ইংল্যান্ডে এরা সব সময়ই ছিল, কিন্তু সেকালের উচ্চ বংশীয়দের গ্রাম্য সমাজে যাজক পল্লীতে (parish) তাদের যত্ন নেওয়ার একটি প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। ভূমি মালিকদের দেওয়া একটি কর থেকে যা আদায়

www.pathagar.com

হতো, তা দিয়ে দুঃস্থদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা হতো, আর যারা কার্যক্ষম ছিল, তাদের জন্য পেরিশ থেকেই কর্ম সংস্থান করা হতো। 'দরিদ্রের দায়িত্ব ধনীর' (noblesse oblige) এই ছিল তখনকার প্রচলিত দর্শন।

কিন্তু এই সুপ্রাচীন ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়ে। যুদ্ধকালে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি, কৃষিবিপ্লব এবং সাধারণের জমিতে ঘেরা দেওয়ার প্রচলনের ফলে অনেক ক্ষুদ্রচাষীর ভূমিহীন হওয়া, শিল্পবিপ্লব এবং শহর আর জনসংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি দারিদ্র্যের সমস্যা তীব্রতর করে। ভূমিহীন কৃষকরা হয়তো আগের অবস্থা থাকলে পুরনো প্রচলিত কাপড় প্রস্তুতের কুটিরশিল্পে কাজ পেতো, কিন্তু শিল্পায়ন সেই সম্ভাবনাও ধ্বংস করে দেয়; উঠতি শহরগুলোতে কাপড়ের কারখানা সৃষ্টির ফলে, নিঃসন্দেহে পল্লীর কুটিরশিল্পীদের এক পুরুষই (whole generation) তাদের জীবিকা অর্জনের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অল্প কিছু সংখ্যক স্বাস্থ্যবান যুবক অবশ্য তৎকালে ক্রমবর্ধমান সেনাবাহিনীতে কাজ পেল, কিন্তু তাতে সমস্যার সঠিক সমাধান হয় নি।

ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল, তার ফলে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ রাজনৈতিক পর্যায়ে অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে কোন প্রসঙ্গেই সংস্কারের গন্ধ থাকলেই ইংরেজ সরকারের কাছে তা ছিল অস্পৃশ্য। এদিকে দরিদ্রের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়াটা ধনী জমিদারদের পক্ষে বড় বেশী রকম আর্থিক দায়িত্ব বলে মনে হলো। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে।

সমাধান এলো টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬–১৮৩৪) নামে এক অখ্যাত তরুণ ধর্মযাজকের কাছ থেকে। অন্যান্য সুবোধ রক্ষণশীলদের মতোই, জটিল সমস্যাটা তাঁর দৃষ্টিতে এমন কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা পরিবর্তন ছিল না, যা কর্মপন্থা গ্রহণের দ্বারা নিরোধ করা সম্ভব, বরং এটা ছিল এক বৃহত্তর শক্তির দ্বারা সৃষ্ট অবস্থা যার নিয়ন্ত্রণ ছিল সরকারের ক্ষমতার অতীত। তিনি যুক্তি দেখালেন যে দরিদ্রের সমস্যাটা আদতে নৈতিক, এবং এর মূলে ছিল দুটি মৌলিক প্রতিপাদ্য (propositions)। প্রথমতঃ "মানুষের বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন; দ্বিতীয়ঃ নারী–পুরুষের কামোচ্ছ্বাসটা প্রয়োজনীয় এবং এটার কোন পরিবর্তন হবে না।" এই দুটি সত্য থেকে যে নীতি বেরিয়ে আসে তা এই, "মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা এই পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণের চেয়ে বহুগুণ বেশী।"

ভিন্নভাবে বললে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে, যদি না সেটাকে 'কষ্ট অথবা পাপ' দ্বারা বাধা দেয়া হয়। যদি খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে হয়, তবে

www.pathagar.com

মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মাথা প্রতি উৎপন্ন খাদ্য জীবিকার নিম্নতম পর্যায়ে আসে, এর পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ হবে। মজুরীর পরিমাণ সবসময় জীবিকার নিম্নতম পর্যায়ের (subsistence level) দিকে নামতে থাকবে। ঐ মাত্রা থেকে মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আর মজুরী আবার কমে গিয়ে জীবিকার নিম্নতম পর্যায়েই পৌছাবে। বিপরীতক্রমে, খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে মজুরীও বাড়তে থাকবে, যাতে তা জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম পর্যায়ে থাকতে পারে। যেদিক দিয়েই দেখা যাক, মজুরীর একটি প্রাকৃতিক হার আছে যেটা জীবিকার সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে যেতে থাকে।

এবার এই মতবাদের অন্তর্নিহিত অর্থটা বিবেচনা করা যাক। ত্রাণ কার্যের বাবত ব্যয় দরিদ্রের সমস্যার কোন সমাধান দেবে না, কারণ এর ফলে দরিদ্রদের আয় বেড়ে যাবে, যার ফলে তারা অধিক সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। দরিদ্রের সমস্যাটা থেকেই যাবে, কারণ অধিক জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যাবে না। অতএব, দরিদ্রের সমস্যা ব্যাখ্যা করার জন্য অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণ খুঁজবার প্রয়োজন নাই। এর কারণ হচ্ছে দরিদ্র-ত্রাণের সেই পুরোন প্রথাটা, যার ফলে দারিদ্র্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষে আজকের এই সংকট-অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যার সমাধান হচ্ছে ঐ ত্রাণ ব্যবস্থাটাই তুলে দেওয়া।

দরিদ্রের সাহায্য দেয়া আরও একদিক দিয়ে অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছিল। দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে, ত্রাণ ব্যবস্থা সম্পদকে উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে সরিয়ে আলস্যপরায়ণ দরিদ্র মানুষদের নিকট হস্তান্তর করে। যে সম্পদ বিনিয়োগের দ্বারা কর্ম সংস্থান করা যেতো, তা দিয়ে দরিদ্রের আলস্যকে পরিপোষণের ফলে সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর করা হয়।

ম্যালথাসের বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। দরিদ্রের কারণ সমাজের কাঠামোতে, আয়ের বণ্টনে, সম্পদের অসম মালিকানায় বা আর পাঁচটা সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত নেই। এজন্য ধনীদের বা গোটা সমাজের কোন দোষ নেই। দরিদ্রেরা নিজেরাই তাদের ভাগ্যের জন্য দায়ী। তাই দারিদ্র্য মোচনের জন্য শুধু তাদেরই একমাত্র করণীয় হচ্ছে সন্তান উৎপাদন হ্রাস করা।

ম্যালথাসের মত অনুসারে শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করাও মূল্যহীন। মজুরী বেশী হলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, আর তাতে খাদ্য মূল্যও বৃদ্ধি পাবে, যেহেতু সে ক্ষেত্রে বেশী লোক বাড়তি মজুরী নিয়ে খাদ্যের জন্য দরদস্তুর করে তার দাম বাড়িয়ে দেবে। তার ফল হবে এই যে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে

www.pathagar.com

সম্পদটা শ্রমিকদের মাধ্যমে গিয়ে জমা হবে অনুৎপাদনশীল জমিদার শ্রেণীর পকেটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন কমে যাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য জাতিকে অধিক দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে হবে। তা ছাড়া, ইউনিয়ন থাকার অর্থই হচ্ছে ধর্মঘট, আর ধর্মঘটের অর্থই হচ্ছে উৎপাদন হ্রাস, মুনাফা হ্রাস, এবং পুঁজি সঞ্চয় হ্রাস। না, শ্রমিক ইউনিয়নটা কোন সমাধানই নয়।

নিঃসন্দেহে ম্যালথাসের জনসংখ্যা নীতি ছিল দরিদ্রদের জন্য এক বেদনাদায়ক তত্ত্ব। কিন্তু রক্ষণশীলদের দিক থেকে এটা ছিল একটা মহা-মতবাদ, কারণ একটা গুরুতর সমস্যার সম্পর্কে কিছুই না করার জন্য এতে তারা সুন্দর অজুহাত পেয়ে গেল। ব্যক্তিগতভাবে একজন শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ভদ্রলোক হিসাবে ম্যালথাস দারিদ্র্যের জন্য অবশ্যই দয়ার্দ্র এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ কথা তিনি অনেকবারই বলেছিলেন এবং তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ নাই। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ তাঁকে বলে দেয় যে এ ক্ষেত্রে সামাজিক কর্মপন্থাটা সাহায্যের বদলে বরং সমাধানকে বাধাই দেবে। একমাত্র স্থায়ী সমাধান হলো ব্যক্তির স্বীয় নৈতিক সংস্কার সাধন।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা নীতি একদিন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির ইটকাঠে পরিণত হয়ে গেল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মজুরী-তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হলো। এর নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভংগি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এতে আশাব্যঞ্জক একটি পথ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে শ্রম-শক্তিও বৃদ্ধি পাবে, যেটা আরও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দরকার। ম্যালথাস দেখিয়েছেন যে শ্রম-শক্তির পরিমাণটা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের পথে কোন বাধা নয়। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটলেই শ্রম-সম্পদও সরবরাহ হবে। উন্নতির কাজ শুরুর জন্য প্রয়োজন হবে শুধু মূলধনের।

মানুষের অবস্থা ভাল করার জন্য প্রয়োজনীয় আরও একটি চালক-সম্পর্ক ভালভাবে বুঝতে পরবর্তী সময়ে অর্থনীতিবিদদের সাহায্য করে ম্যালথাসের তত্ত্ব। যদি জীবনধারণের মানের সবিশেষ পরিবর্তন আনতে হয়, তবে উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুততর হতে হবে। ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকা তাদের পরবর্তী সময়ের শিল্পায়নের যুগে এই সম্পর্কটা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল আর তাই আজ তাদের দেশের অবস্থা ম্যালথাসের আমলের চেয়ে বহুগুণে ভাল। অন্যান্য অনেক দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধির চেয়ে বেশী হবার ফলে সেখানে কোটি কোটি মানুষ ম্যালথাসের বিশ্লেষণ নির্দেশিত কষ্ট আর পাপের অভিশাপে ভুগছে।

www.pathagar.com

রিকার্ডো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২–১৮২৩) ছিলেন মূলধন সঞ্চয়ের প্রবক্তা। তাঁর মতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সব চেয়ে বড় উৎস হলো মূলধনের প্রবৃদ্ধি, এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মপন্থা সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। তাঁর এই মত প্রমাণের জন্য তিনি অর্থনীতির একটি তাত্ত্বিক নকসা (Theoretical Model) প্রস্তুত করেন, যা পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর অর্থনীতিবিদদের চিন্তা জগতের প্রধান বিষয় হয়ে থাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশী মুনাফার সৃষ্টি করবে, মুনাফাই হচ্ছে পুনরায় বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের উৎস, এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি সর্বাধিক মুনাফা প্রদানকারী বিনিয়োগের সৃষ্টি করবে। রিকার্ডোর মতে যে কর্মপন্থা ব্যবসায়ের পক্ষে সহায়ক, সেটাই সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও এনে দেবে।

রিকর্ডোর জন্ম হয় লন্ডনের এক ইহুদি পরিবারে, তিনি একুশ বৎসর বয়সে এক কোয়েকার (Quaker) মহিলাকে বিয়ে করেন, ফলে তাঁর সাথে তাঁর স্টক–দালাল পিতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বন্ধুদের অর্থ সাহায্যে তিনি লন্ডনের এক্সচেঞ্জে একজন ব্যবসায়ী হলেন। ঝুঁকি বহুল আর জটিল ফাটকা বাজারীতে তাঁর এমনি পটুতা ছিল যে মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সেই তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন। ১৮১৪ সালে তিনি একটি পল্লীর জমিদারীতে অবসর গ্রহণের জন্য যান, ১৮১৯ সনে আয়ার্ল্যান্ডের পকেটবরো (pocket borough) পার্লামেন্টের একটি আসন কিনে নেন এবং বাকী জীবনটা দেশের কাজ আর অর্থনীতিতে নিয়োজিত করেন। একজন 'কোটিপতি–মৌলিক সংস্কার পন্থী' (millionaire radical) বলে পরিচিত ব্যক্তি হিসাবে তিনি ব্যাংকিং এবং মূদ্রা–ব্যবস্থায় সংস্কার, দরিদ্রদের জন্য ত্রাণ তহবিল এবং শুল্ক বিষয়ে সংস্কার দাবী করেন। লেখনীর এবং বাক–স্বাধীনতার দাবী এবং অন্যান্য বহুবিধ সংস্কারের পক্ষে ছিলেন তিনি। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর একমাত্র গ্রন্থের নামটা ছিল ভয়ংকরঃ 'প্রিন্‌সিপ্‌লস্‌ অব পলিটিক্যাল ইকনমি অ্যাণ্ড ট্যাকসেশন'। এর বিষয়বস্তু ছিল আরও ভয়ংকর, কিন্তু সেকালে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

১৮১৫ সনের কাছাকাছি সময়ে, নেপোলিয়ানের যুদ্ধের শেষে, ইংল্যান্ডে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আর সামাজিক আলোচনার বিষয় ছিলঃ তাদের অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিকই রাখা হবে, না সেখানে বেশী রকম শিল্পায়ন করা

www.pathagar.com

হবে। তদানীন্তন ইংল্যান্ডের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভূমি কেন্দ্রিক অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থান কোথায়, এই সমগ্র প্রশ্নটি এ বিতর্কের অংশ হয়ে যায়। বাহির থেকে ইংল্যান্ডে গম আমদানীকে কেন্দ্র করে 'কর্ন লজ' (Corn Laws) নিয়ে এক বাকযুদ্ধ হয়, যেটা ছিল ঐ বিষয়েরই অভিব্যক্তি। ইংল্যান্ডের আইনগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো যাতে সে দেশে খাদ্যের দাম বেশী বাড়তে না দিয়েও আভ্যন্তরীণ কৃষির স্বার্থ রক্ষা করা। যখন ইংল্যান্ডে গমের দাম খুব কমে গেল, তখন আমদানীর উপর শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হলো, যাতে বিদেশী শস্য আমদানীর কারণে দেশের মধ্যে আরো মূল্য হ্রাস না ঘটে এবং ঐভাবে দেশীয় ব্যবসায়ী আর কৃষক শ্রেণীর স্বার্থহানি না হয়। প্রচলিত আইনে যখন গমের দাম একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতো, তখন আমদানী শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হতো, যাতে আমদানী উৎসাহিত হয় আর আভ্যন্তরীণ মূল্যের বৃদ্ধি বন্ধ হয়। সংক্ষেপে, ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টা ছিল যাতে পরিবর্তনযোগ্য শুল্ক তালিকার মাধ্যমে গমের মূল্য উঁচু আর নিচু দুই সীমার মধ্যে স্থিতিশীল থাকে।

যাই হোক, ফরাসী যুদ্ধের সময়ে খাদ্য মূল্য অত্যন্ত বেশী হয় এবং কৃষকদের অবস্থারও উন্নতি হয়। তাদের উৎপাদন ব্যয় যে বৃদ্ধি পায়, শান্তির সময়েও তা আর কমলো না। যুদ্ধকালীন চাহিদা যখন পড়ে গেল, তখন খাদ্যের মূল্যও হ্রাস পেলো। কৃষকরা এবার চিৎকার শুরু করলো যাতে গম আমদানীর উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়; কারণ তাদের ভয় ছিল যে 'কর্ন ল' দ্বারা রক্ষা না করলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভূমি মালিকদের মতকে জোরদার করা হলো এই বলে যে ইংল্যান্ডের প্রতিরক্ষার জন্য, প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এবং জাতীয় শক্তির জন্য জোরদার কৃষি থাকাটা বাঞ্ছনীয়। এটা ছিল ফিজিওক্র্যাট মতবাদের পুনরুজ্জীবন, যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটা নির্ভর করে মাটির প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর। "বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা মুক্ত ইংল্যান্ড" এই জাতীয় শিরোনামার পুস্তিকাসকল প্রকাশ করা হয়, যেগুলোর বক্তব্য ছিল কৃষির স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তার নিরাপত্তা বিধান।

অপর পক্ষে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ নিহিত ছিল শুল্ক বৃদ্ধির বিরোধিতায়, কারণ তাদের মতে এই বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের দাম বাড়বে আর মজুরীও বেশী হয়ে যাবে। ফলে মুনাফা হ্রাস পাবে, শিল্পজাত দ্রব্যের রফতানি হ্রাস পাবে এবং তা ইংল্যান্ডের শিল্পের ধ্বংস ডেকে আনবে। ব্যবসায়ী মহলের মতে ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নিহিত ছিল শিল্পোন্নয়নে, কৃষিতে নয় এবং তারা দাবী করলো 'কর্ন ল'-গুলোর পুরোপুরি বাতিল।

www.pathagar.com

এই ছিল প্রশ্নটির অবস্থা যখন রিকার্ডো এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা 'কর্ন ল' নীতির বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। তর্কে রিকার্ডো ব্যবসায়ীদের যুক্তি সমর্থন করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে যদি শুল্ক বৃদ্ধির দ্বারা গমের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তবে তা থেকে বরং ফায়দা উঠাবে প্রধানতঃ ভূমি মালিকরা, কৃষক শ্রেণী নয়। গমের চড়া দামের ফলে চাষ এমন সব জমিতে বিস্তৃতি লাভ করবে যেটা ইতিপূর্বে অলাভজনক ছিল। আগে থেকে যে জমিগুলোতে গম উৎপন্ন হচ্ছিল, কৃষকদের উচ্চ মূল্য প্রাপ্তির সুযোগ নিয়ে সেগুলোতে খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন জাতীয় আয়ের একটি বৃহত্তর অংশ ভূমি মালিক শ্রেণীর হাতে চলে যাবে, আর এই পরগাছার দল তাদের বর্ধিত সম্পদ ব্যয় করবে ভৃত্য পালন, বাগানবাড়ী ইত্যাদি বিলাসিতায়, উৎপাদনমূলক বিনিয়োগে নয়।

উপরন্তু, কৃষির জন্য জমির ব্যবহার বাড়ানোর ফলে শিল্পের মূলধন এবং শ্রমিকের সরবরাহ কমে যাবে, আর তাতে দেশের সম্পূর্ণ উৎপাদনের ধরনটাই বিকৃত হয়ে পড়বে। খাদ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়লে তার ফলে কৃষিতে উৎপাদনক্ষম সম্পদের অপব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর জাতীয় শিল্পের প্রকৃতিগত (natural) উন্নয়নটা বাধাপ্রাপ্ত হবে। রিকার্ডো এটাও দেখালেন যে খাদ্যের দাম বেশী হলে মজুরীর হারও চড়া হয়ে যাবে এবং ফলে শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু ইংল্যান্ডকে তার শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি করতে হয় সারা পৃথিবীর বাজারে, অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় তাই দেশের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজদের রফতানি হ্রাস পাবে, সুতরাং ইংল্যান্ডের শিল্পোৎপাদন হ্রাস করতে হবে। মুনাফাও কমে যাবে, যার ফলে পুঁজি সঞ্চয়ের হার মন্থর হবে, অতএব বিনিয়োগে আগ্রহ এবং টাকা কম হবার ফলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও মন্থর হয়ে যাবে।

এই ছিল 'কর্ন ল'-গুলোর বিরুদ্ধে রিকার্ডোর প্রতিবাদ (যদিও তিনি এই আইনের সম্পূর্ণ বাতিল হওয়াটা দাবী করেন নি)। এতে একটা অর্থনৈতিক মডেলের সাহায্যে ব্যবসায়ীক দৃষ্টিভংগীর সমর্থন করা হয়েছে, যার ফলে তাঁর কর্মপন্থামূলক সিদ্ধান্তগুলো জোরালো এবং যুক্তিযুক্ত মনে হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বটা ছিল শুধু সমসাময়িক কর্মপন্থা অনুসন্ধানের চেয়ে আরও বেশী কিছু। নচেৎ ঐ সমস্যা শেষ হবার সাথে সাথেই তাঁর তত্ত্বেরও মৃত্যু হতো। কিন্তু রিকার্ডো এটাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং রচনা করেছিলেন ব্যাপক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি সাধারণ সংজ্ঞামূলক তত্ত্ব।

www.pathagar.com

একটি জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায়, তাঁর মতে, জনসংখ্যা অল্প থাকে এবং মোট জমির একটি অংশ মাত্র চাষ করা হয়। এই পর্যায়ে ভূমি মালিককে দেয় জমির খাজনার পরিমাণ সামান্য থাকে, আর মোট জাতীয় আয়ে মুনাফার অংশ থাকে অনেক বড়। মুনাফা যখন পুনরায় শিল্পোন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা হয়, তার ফলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে, যেটা ম্যালথাসের অনুসরণে বলা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং মজুরী থাকবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণে (subsistence level)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আরো খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে চাষের এলাকা সম্প্রসারিত করার দরকার হবে। এই সম্প্রসারণ সম্ভব হবে শুধু অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমি চাষে আনার জন্য অধিক উৎপাদন ব্যয় মেটানোর প্রয়োজনে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা। খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ভূমি মালিকরা পুরানো জমিগুলোর খাজনা বাড়াতে পারবে, কারণ শস্যের মূল্য বেশী হলে বেশী খাজনা দেওয়া সম্ভব হয়। একই সাথে অধিক খাদ্যমূল্যের কারণে মালিকরা তাদের শ্রমিকদের মজুরীও টাকার অংকে বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে, যাতে অন্ততঃ শ্রমিক দুটো খেয়ে বাঁচতে পারে। এতে করে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। মুনাফা কম হওয়ায় সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আর বিনিয়োগ করবার আগ্রহ এই দুটোই কমে যাবে। রিকার্ডো কল্পনা করেন যে এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মূলধন বিনিয়োগ চলতে থাকবে, এবং ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে আসবে, এইভাবে বহুদশক ধরে সম্প্রসারণের পর একদিন প্রবৃদ্ধি একদম থেমে যাবে। উন্নয়নের এই পর্যায়ে জনসংখ্যা বিরাট থাকবে এবং কৃষির সম্প্রসারণ হবে, শিল্পের উন্নতি হবে, উৎপাদনও উচ্চ পর্যায়ে থাকবে, কিন্তু সঞ্চয় আর মূলধনের পরিমাণ শুধু ততটুকু হতে থাকবে যেটা পুঁজি প্রতিস্থাপনের (replacement) জন্য যথেষ্ট থাকবে কিন্তু তা দিয়ে সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না।

রিকার্ডোর আঁকা এই ছবি অনুসারে যদি অর্থনীতিকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া যায়, তবে সেটা একদিন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ব্যবসাকে সকল রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে সর্বোচ্চ মুনাফা হয়, আর সর্বোচ্চ সঞ্চয় এবং পুঁজি সংগঠন সম্ভব হয়। সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে অর্থনীতিতে উৎপাদনমূলক কার্যকলাপ বরং হ্রাস পায়, বৃদ্ধি হয় না। কথাটা ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, যারা ঐ

www.pathagar.com

সময়ের সামাজিক শৃঙ্খলার কর্তাবিধাতা ছিলেন, অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রেণী, তত্ত্বটা তাদের পক্ষ সমর্থন করে, আর এই কারণেই এ তত্ত্ব দীর্ঘকাল টিকে থাকে।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি

রিকার্ডোর অর্থনীতির একটি শক্তি ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা। এই বারই সর্বপ্রথম জমি, শ্রম আর মূলধনের ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিশ্লেষণকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রীতিমত প্রয়োগ করা সম্ভবপর হলো। একটি বিজ্ঞান হিসাবে অর্থনীতি শাস্ত্রের উন্নয়নে এটা ছিল এক বিশাল পদক্ষেপ। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ক্রমাগত ব্যাপক ভিত্তিতে সাধারণ সংজ্ঞার সৃষ্টি করা, যাতে আরো বেশী ঘটনাবলী ঐ বিশ্লেষণের আওতায় আনা যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হয় বাহুল্য বর্জন করে সাধারণ সূত্রসমূহ (general laws) গড়ে তোলার দ্বারা এবং রিকার্ডোর অর্থনীতি তাই করেছিল সকল অর্থনৈতিক ঘটনাকে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যকার কতকগুলো মৌলিক সম্পর্কের ছকে রুপান্তরিত করার মাধ্যমে।

রিকার্ডোর মডেলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সংযোগ সাধন করা হয় দুই ভাবে। প্রথমতঃ রিকার্ডো দেখলেন যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারদর্শিতা ও শ্রমবিভাগ সকল জাতির পক্ষেই সুবিধাজনক এবং কোন দেশের উৎপাদনকারীদের স্বার্থে যখন বাণিজ্যটা নিয়ন্ত্রণ করা হবে, তাতে সে দেশের নিজেরই ক্ষতি হবে। অবাধ বাণিজ্যটা আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের অর্থনৈতিক প্রগতিরই উপায়। এই বক্তব্যের পক্ষে দেওয়া যুক্তিটা দেওয়া হয়েছে বিখ্যাত তুলনামূলক সুবিধার সূত্রে (Law of Comparative Advantage), তবে এটা বেশ জটিল, কিন্তু রিকার্ডো–এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তিনি দেখান যে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য দেশের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় ইংল্যান্ডে গম উৎপাদন করার চেয়ে কাপড় উৎপাদন করার ব্যয় কম হয়, সে পর্যন্ত ইংল্যন্ডের পক্ষে কাপড় উৎপাদনে সম্পদ বিনিয়োগ করে কাপড় রফতানি করা এবং অন্য দেশ থেকে গম আমদানী করা লাভজনক।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একজন ইংরেজ শ্রমিকের এক দিনের শ্রমে এক গজ কাপড় প্রস্তুত হয় আর দুই দিনের শ্রমে এক বুশেল গম উৎপন্ন হয়; তা হলে গমে উৎপাদন ব্যয় কাপড়ের উৎপাদন ব্যয়ের দুই গুণ। আরও ধরা যাক একজন ফরাসী ঐ দুটি জিনিসই এক দিন করে শ্রম ব্যয়ে উৎপাদন করতে পারে। এই ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের উচিত কাপড় উৎপাদন করা (এক দিনের শ্রম),

www.pathagar.com

তা ফ্রান্সে রফতানি করা আর এক এককের বদলে এক একক ভিত্তিতে গম আমদানী করে ইংল্যান্ডে আনা। এই ভাবে ইংল্যান্ড এক দিনের শ্রমের বদলে যে গম পাবে, তা নিজেরা উৎপাদন করতে তাদের দুইদিনের প্রয়োজন ছিল। ফরাসীদেরও লাভ হবে। দুই গজ কাপড় কিনে তা ফ্রান্সে নিয়ে আসতে পারে। তারাও এক দিনের কাজের বদলে দুই দিনের কাজের সমান মূল্যের জিনিস পাবে। এই বিশেষায়ন এবং মুক্ত বিনিময় থেকে উভয় পক্ষই লাভবান হবে।

কিন্তু প্রক্রিয়াটা সেখানেই শেষ হবে না। ইংল্যান্ডের কাপড় ফ্রান্সে রফতানির ফলে সেখানে এর বিক্রয় মূল্য কমে যাবে, আর দেশে অধিক উৎপাদনের ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ফ্রান্সেরও গমের বেলায় তাই ঘটবে। এই সব মূল্য পরিবর্তনের ফলে ক্রমশঃ আমদানী রফতানি বাণিজ্য চলায় দুই দেশের মূল্যে এবং বাণিজ্যে একটি ভারসাম্য (equilibrium) প্রতিষ্ঠিত হবে। ইংল্যান্ড কাপড় উৎপাদন এবং রফতানি দুটোই করবে। কিন্তু তার গমের উৎপাদন কমে যাবে এবং তার অধিকাংশ সরবরাহ আমদানী থেকে আসবে। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটা ঘটবে। দুটি জিনিসই উভয় দেশে তুল্য দামেই বিক্রি হবে, যদি তা নাই হয় তবে উৎপাদন, ব্যবসা, মূল্য আর উৎপাদন ব্যয় ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতেই থাকবে। এই ভাবে একটা আন্তর্জাতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে যার দ্বারা সারা পৃথিবীর উৎপাদনের ধরন শ্রেষ্ঠতা (optimized) লাভ করবে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যের এই বিশ্লেষণটা দ্বিতীয় আরো একভাবে জোরদার করা হয়-সে হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এই পরিচ্ছেদের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে রিকার্ডোর তত্ত্বের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা একটা পরিবর্তনহীন অর্থনীতির (Stationary Economy) জন্য সত্য, যে ক্ষেত্রে মূলধনের লাভ এতই কম যে শুধু ক্ষয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতির বদলীটাই করা চলে, নতুন বিনিয়োগ হয় না। যখন কোন দেশে মূলধনের লাভ কমে যায়, তখন মুনাফা বৃদ্ধির খোঁজে বিনিয়োগকারীরা বিদেশে, অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলোর দিকে ঝুঁকবে। পরিণত অর্থনীতির (Mature Economy) দেশ থেকে সাথে সাথে নতুন উন্নয়নশীল দেশে মূলধন প্রবাহিত হবে এবং ফলে ঐসব দেশে উৎপাদন আর সম্পদ উচ্চতর পর্যায়ে পৌছাবে। ঐসব দেশকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আর বেসরকারী সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা অবশ্যই করতে হবে, এইটুকু শর্ত সাপেক্ষে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা আশা করেন যে সারা পৃথিবী ক্রমশঃ এই প্রক্রিয়ায় প্রাচুর্যের পথে অগ্রসর হবে।

www.pathagar.com

এই ভাবে রিকার্ডো আর তার অনুসারীরা অ্যাডাম স্মিথের সুশৃঙ্খল প্রবৃদ্ধি (orderly growth) আর বাজারের ভারসাম্যের চিন্তাধারাকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রয়োগ করেন। কেবল জাতিতে জাতিতে শুল্ক, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ, এই সব দলাদলি এবং কোন্দল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সম্ভবতঃ এটা ভাগ্যের পরিহাস যে যদিও রিকার্ডো মনে করতেন তাঁর তত্ত্বের এই অংশটাই সবচেয়ে মূল্যবান-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তত্ত্ব— কিন্তু আসলে আধুনিক অর্থনীতিবিদরা তাঁর তত্ত্বের এই অংশটা প্রায় বাতিল করে দিয়েছেন, তবে মূলধন সংগঠনের অংশটাতে তাঁর মূল বিশ্লেষণের মধ্যে যেটা ছিল একটা কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ— আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের তত্ত্ব, সেই অংশটা কিন্তু সেকালের বিশ্লেষণের ভাষাতেই এখানো আধুনিক অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বিরাজ করছে।

সে'র বাজার সম্পর্কিত সূত্র

অর্থনীতির সুসম্বদ্ধ বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ করার জন্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে মাত্র আর একটিই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগ করা প্রয়োজন ছিল। উৎপাদনের সাথে কর্মনিয়োগের পরিমাণের (employment level) সম্পর্ক বিবেচনা। দেখানো হয়েছে যে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা এমনভাবে সম্পদকে বিভিন্ন জিনিসে নিয়োজিত করে যে, উৎপাদন নিজেকে খদ্দেরের প্রয়োজন এবং চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নেয় (adjust)। সঞ্চয় আর পুঁজি সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রাকৃতিক সূত্র অনুসারে আয় বন্টিত হবে, এবং একই নীতিমালা প্রযোজ্য দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোতে। যে প্রশ্নটা এখন সমাধানের জন্য বাকী রইলো তা হচ্ছেঃ মুক্ত বাজার ব্যবস্থাটা শ্রম এবং পুঁজির পরিপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে কি না।

সমস্যাটি শুধু তত্ত্বমূলক বিবেচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। শিল্পবিপ্লব অর্থনৈতিক অস্থিরতা আমদানী করে, যার তীব্রতা আরোও বৃদ্ধি পায় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, মাঝে মধ্যে নেপলিয়নের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ হয়েছে তার দ্বারা। ১৮১৫ সনে যখন শান্তি এলো, তখন ইংল্যান্ড এবং ইউরোপ মহাদেশে সরকারী ব্যয় স্বরূপ অর্থনীতির উত্তেজকটা (economic stimulus) আর থাকলো না। যুদ্ধাবস্থার তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার মাত্রা কম হয়ে গেল আর আন্তর্জাতিক বাজারে এতদিন ইংল্যান্ডের যে একচ্ছত্র বাজার ছিল, সেখানে

www.pathagar.com

মহাদেশের (continent) পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা দেখা দিল। যুদ্ধ ফেরত সৈন্য আর নাবিকরা যখন বেসামরিক জীবনে ফিরে এলো আর কারখানা শ্রমিকরা যখন আবার তাদের হস্ত শিল্পের উপর নির্ভরশীল হলো তখন সব মিলে দেখা গেল কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব সমস্যা ইংল্যান্ডেই বিশেষভাবে জটিল হয়ে উঠলো, কারণ সেখানেই শিল্পায়নটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক অবস্থার অধিক অবনতির কারণ সেখানে সরকারের মুদ্রা নীতির ফলে টাকার এবং ঋণের সরবরাহ হ্রাস পায় এমন একটি সময়ে, যখন অর্থনীতিতে প্রয়োজন ছিল ঐসব সুযোগ বৃদ্ধি করা। যুদ্ধের বছরগুলোতে যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, ঋণের সরবরাহ বেশী রকম বৃদ্ধি করা হয়, এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ড তার কাগজী মুদ্রা বদলে স্বর্ণের সরবরাহ বন্ধ রাখে। জাতীয় ঋণের বৃদ্ধি ছিল দেশে ঋণ সরবরাহ এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। রিকার্ডোর নেতৃত্বে অর্থনীতিবিদগণ উৎসার (inflation) এবং অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা চালু করার সমালোচনা করেন এবং ব্যবস্থাপত্র দেন যে যুদ্ধ শেষ হলে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের উচিত তাদের কাগজী মুদ্রা আবার যুদ্ধের আগের হারে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা। যদিও তৎকালে ঐ পরিমাণ টাকা আর বাকী ঋণ পরিশোধ করার মত যথেষ্ট স্বর্ণ ছিল না। অর্থনীতিতে একমাত্র অবসার (deflation) ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতির এই প্রথম প্রয়োগের ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক অসুস্থতার সম্পর্কে এক ভুল ব্যবস্থাপত্র, যার ফলে প্রতিকারটা অসুখের চেয়েও খারাপ বলে প্রতিপন্ন হল। মুদ্রাস্ফীতিটা প্রধানতঃ ঘটেছিল যুদ্ধের সময়ে মোট ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এবং আংশিক ভাবে এটা টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির ফলেও ঘটে এমন এক সময়ে যখন উৎপাদন বৃদ্ধি মন্থর গতিতেই সম্ভব ছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর ছিল না এবং মুদ্রা আর ঋণের পরিমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে এই সম্প্রসারণটা তুলনামূলকভাবে একটি পূর্ণ-কর্মনিয়োগ (fully employed) সম্পন্ন অর্থনীতির অবস্থা নির্দেশ করে। অবসারকে উৎসারের প্রতিকার হিসাবে বিধান দিয়ে অর্থনীতিবিদগণ দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতে সমর্থ হন বটে, কিন্তু তা সম্ভব হয় শুধু উৎপাদন আর কর্মনিয়োগ হ্রাসের বিনিময়ে। যে কোন উৎসারের (মুদ্রাস্ফীতির) পর অবসারের (মুদ্রাসংকোচের) ন্যায় এক্ষেত্রেও ঋণ দাতা এবং আর্থক সম্পদের মালিক শ্রেণী লাভবান হয় এবং বেকার শ্রমিক আর লাভ-বঞ্চিত ব্যবসায়ী শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক দুর্গতির

www.pathagar.com

বোঝাটা অর্থ সম্পদের (monetary assets) মালিক শ্রেণীর উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে উৎপাদনকারীদের উপর চাপানো হলো।

আর্থিক অস্বচ্ছলতা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং ১৮১৫ সনের পর ত্রিশ বছর ব্যবসা-বাণিজ্যে সাধারণভাবে মন্দা বিরাজ করে। এই সময়ের মধ্যে অর্থনীতিতে ওঠা-নামা ছিল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ঘটেছে, কিন্তু একালের বিচারে ঐসময়ে কোন একটি বছরের জন্যও ইংল্যান্ডে পূর্ণ-কর্ম-নিয়োগ (full employment) সম্ভব হয়নি। কোন কোন বছরে দৃশ্যত: বেকারের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে মধ্য অঞ্চলের শিল্প শহরগুলোর শ্রমিক-শক্তির এমন কি শতকরা ৪০ বা ৫০ ভাগ পর্যন্ত পৌঁছায়।

অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার এই অভাব দেখে অনেকেই শিল্পবাদ আর নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা শুরু করে দেয়। ১৮১৫-এর আগেও জিন সাইমন্ডে দে সিস্‌মণ্ডি (১৭৭৩-১৮৪২) নামক এক ফরাসী ইংল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে শিল্পের মন্দা অবস্থা দেখে এই রকম ভবিষ্যৎবাণী করেন যে মূলধনের বিনিয়োগ সময় সময় উৎপাদন ক্ষমতাকে খরিদ্দারদের ক্রয়-ক্ষমতা অতিক্রম করতে বাধ্য করবে। তাঁর যুক্তির প্রতিধ্বনি শোনা গেল উইলিয়াম স্পেন্স্ (১৭৮৩-১৮৬০) নামক একজন ইংরেজ ফিজিওক্র্যাটের নিকট থেকেও। ইনি ১৮০৭ এবং ১৮০৮ সনে দুটি পুস্তিকায় বলেন যে ব্যবসা আর শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ স্থিতিহীনতা আর নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করে, অপর পক্ষে কৃষির উন্নয়ন অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আর নিরাপত্তা সৃষ্টি করে। স্পেন্স বিশেষভাবে দেখিয়ে দেন যে সঞ্চয় অধিক হলে ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাবে আর প্রাচুর্য অদৃশ্য হয়ে যাবে। সিস্‌মন্ডি এবং স্পেন্স্ উভয়েই শিল্পায়নের বিষয়ে মোহমুক্ত হয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে তাঁদের উভয়েরই পছন্দমত পথ ছিল ভিন্ন-স্পেন্সের পছন্দ ছিল পুরোনো অভিজাত সমাজ আর সিস্‌মন্ডির পছন্দ ছিল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত লাভের পরিবর্তে মানবিক আর সম্প্রদায়-ভিত্তিক মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া হবে। মন্দা সম্পর্কে তাঁদের আলোচনা ছিল উদীয়মান ব্যবসায়ী সমাজের উপর এক ব্যপকতর আক্রমণের অংশ মাত্র।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা সাথে সাথে এই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেন। তাঁদের এই যুক্তি-খণ্ডনের ভিত্তি ছিল জিন ব্যাপ্টিস্ট সে (১৭৬৭-১৮৩২) নামক একজন ফরাসী অর্থনীতিবিদের লেখার ছোট একটি অংশ। তিনি অ্যাডাম স্মিথকে ফরাসী দেশে জনপ্রিয় করে তোলেন তাঁর লেখা ১৮০৩ সনে প্রকাশিত

www.pathagar.com

গ্রন্থ 'এ ট্রিটিজ অন পোলিটিক্যাল ইকনমি'র মাধ্যমে। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম একটি নীতি বিবৃত হয় যেটা সে'র বাজার সংক্রান্ত সূত্র (Say's Law of Market) বলে পরিচিত। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাত্রা সম্পর্কে এই সূত্রটি অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের চিন্তায় ১৯৩০ সনের মহামন্দা (Great Depression) পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছিল।

সে'র (Say) যুক্তি ছিল এই যে কখনো চাহিদা সাধারণভাবে কমে যেতে পারে না বা কখনো সাধারণভাবে সম্পূর্ণ অর্থনীতিতে জিনিসের প্রাচুর্য হতে পারে না। কোন বিশেষ শিল্প বা শিল্পের অংশ বিশেষে অবশ্য ভুল এবং অতিরিক্ত কিছু সম্পদ বিনিয়োগের কারণে, বাড়তি-উৎপাদন (over production) হয়ে যেতে পারে; কিন্তু এর ফলে অর্থনীতির অন্যত্র অবধারিতভাবে অভাব পরিলক্ষিত হবে। এই নিয়মে এক ক্ষেত্রে মূল্যের অধোগতি এবং অপর ক্ষেত্রে মূল্যের উর্ধ্বগতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদন এক খাত থেকে অপর খাতে সরিয়ে নিতে প্ররোচিত করবে, অসমতাও তাই অচিরেই সংশোধিত হয়ে যাবে।

তিনি বলেন যে মানুষ শুধু উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন করে না, বরং উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে তার প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই সে উৎপাদন করে। সুতরাং যেহেতু উৎপাদনই চাহিদা, তাই সাধারণভাবে উৎপাদন চাহিদাকে অতিক্রম করবে, সেটা অসম্ভব। "উৎপাদন তার নিজের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে" এটাই হলো ব্যবসায়ে মন্দার সমস্যা সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের উত্তর।

ইংল্যান্ডে স্পেন্সের বক্তব্যের উত্তরে জেম্‌স্ মিল্ (১৭৭৩-১৮৩৬) (যিনি ছিলেন স্বনামধন্য দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা) সে'র যুক্তি তুলে ধরেন। বড় মিল ১৮০৭ সনে লেখেন যে প্রত্যেকটি সরবরাহের বৃদ্ধি আদতে এক একটি চাহিদারও বৃদ্ধি- যদি বিক্রয়ের জন্য বেশী জিনিস আসে, তবে ঐ বেশী জিনিস কেনাও হবে। তাঁর মতে 'সাধারণভাবে জিনিসে বাজার ভেসে যাওয়ার' (glut) তত্ত্বের ভুলটা হলো ক্ষণস্থায়ী বিনিময় ব্যবস্থার একটা গরমিল যা শিল্পের দিক পরিবর্তনের দ্বারা সংশোধনযোগ্য একটা ঘটনাকে সাধারণভাবে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির মত একটা অসম্ভব অবস্থা মনে করা হয়েছিল।

একজন অর্থনীতিবিদ কিন্তু যুক্তিটা মেনে নেননিঃ টমাস আর. ম্যালথাস। তাঁর প্রিন্‌সিপলস্ অব পোলিটিক্যাল ইকনমি (১৮২০) গ্রন্থে ম্যালথাস শেষের

www.pathagar.com

পুরো পরিচ্ছেদটায় অর্থনীতিতে নিশ্চলতার (stagnation) কারণ সম্পর্কে 'অপ্রতুল চাহিদার' ভিত্তিতে একটি তত্ত্ব দাঁড় করান। সংক্ষেপে তাঁর যুক্তিটা ছিল এই রকম যে উৎপাদিত সামগ্রীর উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে মজুরী কম হওয়ার ফলে তা দিয়ে শিল্পের সব জিনিস কেনা সম্ভব নয়, যার ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। দ্রব্যমূল্যের নিম্নগতি বিনিয়োগের আগ্রহ এবং অর্জিত লাভ পুনর্বিনিয়োগ করার উৎসাহও হ্রাস করে দেয়। এর ফলে সার্বিক ক্রয় ক্ষমতার অপর্যাপ্ততা ঘটে, যা দীর্ঘকাল ধরে বজায় থাকতে পারে। একই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যদি অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চয় করা হয়, যার ফলে চাহিদা কমে যাবে, দাম কম হয়ে যাবে আর নিশ্চলতা আসবে। ম্যালথাসের মতে এর প্রতিকার হলো বড় বড় আয়গুলির পরিমাণ কমিয়ে আনা, যাতে সঞ্চয় অত্যধিক না হতে পারে, আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির দ্বারা দেশের পক্ষে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত গড়ে তোলা এবং দুঃসময়ে সরকারী পূর্ত কর্মে অর্থ ব্যয় করা। সরকারী হস্তক্ষেপের একটি কর্মসূচী থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ মুক্ত বাজার অর্থনীতির পক্ষে নিয়মিতভাবে পূর্ণ কর্মনিয়োগ (full employment) বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ম্যালথাস তাঁর যুক্তিগুলো খুব পরিষ্কার আর নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেন নি, তিনি বড় একটা নিয়মানুগ তাত্ত্বিক ছিলেন না–আর তাঁর সৎ বন্ধু ডেভিড রিকার্ডো তাঁর জিনিসে বাজার ভেসে যাওয়ার ঐ সাধারণ তত্ত্বটাকে (Theory of General Glut) একদম কিমা বানিয়ে ছাড়লেন— এটা ছিল ম্যালথাসের কাছে লেখা চিঠির আকারে "ম্যালথাসের প্রিনসিপলস অব পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্পর্কে মন্তব্য"। কিন্তু অপর অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও ঐ সমালোচনা প্রচারিত এবং লন্ডনের পলিটিক্যাল ইকনমি ক্লাবেও প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। রিকার্ডোর যুক্তিগুলো খুব পরিষ্কার আর যথাযথ হওয়ায় তিনিই জয়ী হন।

ম্যালথাসের উত্তরে রিকার্ডোর বক্তব্য ছিল সে'র 'বাজার বিষয়ক সূত্রের'ই কিছুটা পরিবর্ধিত পুনরাবৃত্তি। সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই কেউ সঞ্চয় করে না, তা করা হয় যাতে সঞ্চয়ের দ্বারা শ্রমিককে উৎপাদনে নিয়োগ করা যায় সে জন্য। ভুল হলে তাতে হয়তো বাজারে কোন একটি জিনিস উপচে উঠতে পারে, কিন্তু অন্যান্য জিনিসের চাহিদা তাতে হ্রাস পাবে না। শুধু উৎপাদনমূলক প্রচেষ্টার পুনর্বিন্যাস ঘটবে তা ছাড়া বেকারত্বের ফলে মজুরী হ্রাস পাবে, তাতে ব্যবসায়ীরা সঞ্চয়ের দ্বারা সৃষ্ট মূলধন বিনিয়েগের দ্বারা অব্যবহৃত শ্রমিক নিয়োগে আগ্রহী হবে। এইভাবে সবটুকু পুঁজি আবার উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে আর সকল কর্মে–

www.pathagar.com

ইচ্ছুক শ্রমিক আবার কর্মে নিযুক্ত হবে। তাই আসল ওষুধ আয় পুনর্বন্টন বা সরকারী পূর্তকর্ম নয়, বরং তা হচ্ছে কম মজুরী আর বেশী লাভ।

রিকার্ডোর উত্তরকে জোরদার করে আর একটি চমৎকার গ্রন্থ, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০২ সনে, হেনরি থর্নটন রচিত 'দি পেপার ক্রেডিট অব গ্রেট ব্রিটেন'। বইটি লেখা হয় টাকা, স্বর্ণ আর উৎসার (inflation) বিষয়ক বিতর্কের সময়ে, কিন্তু এর যুক্তিতে সে'-র সূত্র বাজারের প্রাচুর্য (glut) বিষয়ক ধারণাগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল। থর্নটন বলেন, যদি সঞ্চয় বেশী হবার প্রবণতা দেখা যায় তাহলে বাজার চাহিদার তুলনায় টাকার সরবরাহ বেড়ে যাবে এবং সুদের হার কমে যাবে। হ্রাসপ্রাপ্ত হার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে এবং সঞ্চয় নিরুৎসাহিত হবে; এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দু'টি সমান সমান না হয়। যে টাকাটা ভোগের জন্য ব্যবহৃত হবে না, তা বিনিয়োগের দিকে চলে যাবে। সুদের হার পরিবর্তনের দ্বারা সঞ্চয়কে বিনিয়োগের দিকে আকৃষ্ট করা হবে এবং অর্থনীতিতে ব্যয়ের উপযুক্ত পরিমাণ বজায় রাখা হবে। সঞ্চয় বাড়তি হওয়া বা সাধারণভাবে বাজারে জিনিসের অঢেল অবস্থা (glut) কোনটাই হওয়া সম্ভব নয়। ভোগের জন্য মোট ব্যয় এবং বিনিয়োগ এই দু'টি একত্রে শিল্পের মোট উৎপাদনটুকু কিনে নেবার পক্ষে তখন যথেষ্ট হবে।

এই জটিল যুক্তিমালা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে, এর দ্বারা একটা খোলা বাজার অর্থনীতিতে যে প্রক্রিয়ায় সম্পদসমূহের ব্যবহার সম্পন্ন হয় তা দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির তাত্ত্বিক-ব্যবস্থাকে (theoretical system) একটা সম্পূর্ণতা দেওয়া হয়। সামাজিক দর্শন বা অধিবিদ্যার (ideology) দিক থেকে এতে দেখানো হলো যে বেকার সমস্যা এবং অস্থিতিশীলতার কারণ অর্থনীতির বেসরকারী ব্যবসায়িক কাঠামোটা নয়, বরং তার কারণ কতকগুলো অর্থনীতি বহির্ভূত উপাদান, মানসিক অবস্থা এবং এমন আরো কিছু কিছু ব্যাপার যার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা অর্থনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াসমূহের কোন সম্পর্ক নেই। উপসংহারে, তাঁরা যে কোন রকম মন্দার জন্য নিম্নরূপ কর্মপন্থার বিধান দেনঃ (১) অর্থনীতির টাকা পয়সা সংক্রান্ত খাতকে শক্তিশালী করা, যাতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের প্রক্রিয়াটা স্বাভাবিকভাবে কার্যকর থাকতে পারে; (২) যে সময় পর্যন্ত মজুরীর নিম্নগতি এবং দ্রব্যমূল্যটা আবার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে অর্থনীতিকে তার স্বাভাবিক পথে না নিয়ে আসে, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দুর্দশাটা সহ্য করতে হবে। একটি যুক্তিপূর্ণ এবং সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত তত্ত্বের

www.pathagar.com

এমনি শক্তি যে এই সব কর্মপন্থা প্রায় এক শতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত বজায় থাকলো, যদিও তার জন্য সমাজকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে, কারণ অপেক্ষার সময়টা প্রায়শঃ দেউলিয়া হবার আর দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্বের তরঙ্গমালা নিয়ে আসে। ১৯৩০ সনের মহামন্দার সময়ে বিকল্প তত্ত্ব দিয়ে ঐ তত্ত্বকে চূড়ান্তভাবে নস্যাৎ করে না দেয়া পর্যন্ত এই অবস্থায়ই চলতে থাকে।

বেন্‌থাম এবং মধ্যবর্তীকালীন (হস্তক্ষেপ—সমর্থক) উদার পন্থীবাদ

জেরেমী বেন্‌থামের (১৭৪৮–১৮৩২) ধ্যান–ধারণার বর্ণনা ছাড়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হবে না–তিনি ছিলেন একজন আজীবন সংস্কারক আর ব্যবসা–না–করা উকিল। তাঁর 'ফ্রাগমেন্ট অন গভর্নমেন্ট' ১৭৭৬ সনে বেনামীতে প্রকাশিত হয়, যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আটাশ বৎসর। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ছিল সে সময়ের ইংরেজ শাসনতন্ত্র যে প্রগতি–বিরোধী, এই মর্মে প্রাচীন পন্থী আইনজ্ঞদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এক চমৎকার আক্রমণ। তিনি দেখেন, কিভাবে অধিক গনতন্ত্রের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সংস্কার 'সব চেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক মংগল' এনে দেবে। গ্রন্থটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু যেই মাত্র জানাজানি হয়ে গেল যে এর লেখক হচ্ছে একটি অল্পবয়স্ক ছোকরা, এবং তৎকালীন কোন প্রবীণ শাসনতান্ত্রিক আইন ব্যবসায়ী নয়, তৎক্ষণাৎ এটাকে প্রত্যাখ্যান করা হলো। মোহভংগের পর বেন্‌থাম এবার তার বিখ্যাত দার্শনিক কর্ম 'অ্যান ইনট্রোডাকশ্‌ন টু দি প্রিনসিপল্‌স অব মরাল্‌স অ্যান্ড লেজিসলেসন' শুরু করলেন, যেটা ব্যক্তিগত প্রচারের জন্য ছাপা হয় ১৭৮০ সনে। কিন্তু 'ডিফেন্স অব ইউজারী' নামক তাঁর আর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ বের হবার পরই সাধারণ পাঠকের জন্য ১৭৮৯ সনের দিকে পূর্বোক্ত বইটি প্রকাশিত হয়।*

---

*. বেন্‌থামের প্রধান কাজগুলো তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়সের আগেই সম্পন্ন হলেও তিনি চুরাশী বৎসর বেঁচে ছিলেন। আর একদল সমর্থকের উপর তাঁর বিশাল প্রভাব ছিল। পরে তিনি আর কোন প্রভাবশালী গ্রন্থ না লিখলেও শেষ জীবনে কারা–সংস্কার, দরিদ্রদের সাহায্য, শিক্ষা এবং আইন –পরিষদ বিষয়ক সংস্কার ইত্যাদি বহু জটিল বিষয়ে পরিকল্পনার কাজ করেন। তিনি একটি অনুদানের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর 'উইল' ছিল এই রকম যে তাঁর মৃতদেহ যেন মমিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং বছরে একবার করে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থিত করা হয় যাতে, যে উদ্দেশ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তা স্মরণ করা সম্ভব হয়। এই ভয়াবহ অনুষ্ঠানটা আজ পর্যন্ত পালন করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

'প্রিন্‌সিপলস্ অব মরাল্‌স অ্যান্ড লেজিস্‌লেসন' ছিল উপযোগবাদী দর্শনের (utilitarian philosophy) একটি মৌলিক গ্রন্থ। এতে বেন্থাম যুক্তি দেখান যে প্রত্যেকটা কাজই যে পরিমাণে সুখ সৃষ্টি করে থাকে, নৈতিক দিক দিয়ে তা ঠিক ততটুকুই মূল্যবান। মানুষের কার্যাবলী এবং নৈতিক বিচার, এই উভয়েরই ভিত্তি হল আনন্দ আর দুঃখ এই দুই মেরুঃ

"প্রকৃতি মানুষের সুখ আর দুঃখ এই দুই সার্বভৌম প্রভুর শাসনাধীন করেছে। তারাই কেবল নির্দেশ করে কি আমাদের করা উচিত এবং তারাই স্থির করে দেয় আমরা কি করবো। তাদের সিংহাসনেই শৃংখলিত করে রাখা হয়েছে, একদিকে ভাল আর মন্দের মাপকাঠি, অপর দিকে কার্য এবং কারণের মধ্যে সম্পর্ক।"

এই নীতিটা দেখে সহজ মনে হয়, তবে এটা আসলে অনেক বেশী জটিল। বেন্‌থাম বুঝতে চেয়েছিলেন যে সামাজিক ব্যবস্থা চাইবে মোট কল্যাণ সবচেয়ে বেশী করতে এবং তার সাহায্যে সর্বাধিক বিস্তারও চাইবে। তাঁর মতে, বহুলোকের যদি সামান্য করেও সুখ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তা সামান্য কয়েকজন লোকের প্রত্যেকের বিরাট পরিমাণ সুখ বৃদ্ধির চেয়ে ভাল। সমালোচকেরা বললো, ঐ উপসংহারটা কিন্তু সহজে বোধগম্য হচ্ছে না।

এতে যে বড় সমস্যাটা দেখা দিল তা হচ্ছে পরিমাপের। মানুষের সুখ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিকল্প থেকে পছন্দ করার প্রশ্ন আছে, এবং একটি কার্যক্রম পছন্দ করলে অপরটি বাদ দিতে হবে, অর্থাৎ আমরা সব কিছু এক সাথে পেতে পারি না। তার অর্থ এই যে উপকারের পরিমাণগুলো এবং তার ব্যয়গুলোর তুলনা করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম বিকল্প সমাধানটা বেছে বের করা যায়। যদি আলোচনার বিষয়টা 'মোট উপকার' হয় তবে এ সমস্যার কোন সমাধান নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে অর্থনীতিবিদগণ যখন মংগল আর ব্যয় (benefits and cost) বৃদ্ধির (increments) বিষয়টা বিশ্লেষণ অর্থাৎ বিখ্যাত প্রন্তিক বিশ্লেষণ (marginal analysis) করেন, তার আগে পর্যন্ত এমন আংশিক সমাধানও পাওয়া যায়নি।

এর সাথেই একটা সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল, সুখ অথবা উপযোগিতা (utility) কিভাবে একটা পরিমাণ হিসাবে প্রকাশ করা যায়। বেন্‌থাম মনে করতেন যে অন্ততঃ নীতিগতভাবে হলেও এটা সম্ভব। কিন্তু অপরেরা বলেন যে বড়জোর শুধু তুলনা চলতে পারে, উদাহরণস্বরূপ "আমি মেরীকে জিনের চেয়ে অনেক বেশী পছন্দ করি, কিন্তু চকলেটের তুলনায় ভ্যানিলা আইসক্রিম সম্পর্কে

www.pathagar.com

আমার পছন্দটা অত তীব্র নয়।" এই মত অনুসারে শর্তহীন (absolute) হিসেবে মেরীর সাথে থাকার বা চকলেট আইস্‌ক্রিম খাওয়ার সুখের পরিমাপ সম্ভবপর নয়, তা ছাড়া ঐ পছন্দের প্রশ্নটা অপ্রাসংগিকও বটে। মানুষদের জন্য বাস্তবে উপযোগিতার ভিত্তিতে বেছে নেবার যেসব পথ খোলা আছে তা থেকে তারা যে পছন্দ করবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, এটা বেন্‌থামের কাছে ঐসব সূক্ষ্ম বিষয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বললেন যে এই 'আনন্দবাদী হিসাব'টা হচ্ছে সকল মানসিক কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত নীতি এবং এর মাধ্যমেই সমাজের মংগল সর্বোত্তম পর্যায়ে পৌঁছায়। তিনি মনে করতেন যে অর্থনৈতিক ব্যবহারে স্বার্থপরতা একান্তই স্বাভাবিক, মানবিক এবং যুক্তিযুক্তও বটে।

যুক্তির এই পর্যায়ে বেন্‌থাম নৈতিকতা আর আইন প্রণয়নের প্রসঙ্গটা উপস্থিত করেন। যদি মানুষ সবসময় তার নিজের সর্বাধিক সুখের জন্য কাজ করে যায়, তবে সকলের সর্বোচ্চ সুখের জন্য সে কখন কাজ করবে, এ দুটি পরস্পর বিরোধী নয় কি ? বেন্‌থাম বললেন, এটা তা নয়, কারণ নৈতিক আর আইনগত বিধানগুলোর দ্বারা ব্যক্তির কাজকে জনসাধারণের স্বার্থের সাথে খাপ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব বিধানে ব্যক্তির যে কাজ সমাজের সকলের জন্য মঙ্গলজনক, তা পুরস্কৃত করা হয়েছে, আর যে কাজে জনকল্যাণ হ্রাস হয় তার জন্য শাস্তি বিধান করা হয়েছে।

নৈতিক আর সরকারী কার্যকলাপের (যদি তা সংখ্যা গরিষ্ঠের কাজ হয়) একটা উপযোগবাদী ভিত্তি আছে এবং এটা সর্বাধিক সুখ সৃষ্টির নীতির উপর স্থাপিত। তা হলে, বেন্‌থাম সরকারী কর্মপন্থার বিরোধী নয়, যদি সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে হয় এবং তাতে দল বিশেষের ক্ষুদ্র শ্রেণীগত স্বার্থের প্রতিফলন না থাকে। সেই সাথে নৈতিক এবং আইনগত কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তির সিদ্ধান্তও গ্রহণের অবাধ সুযোগের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

বেন্‌থামের তাৎপর্য অবশ্য তার মানব-প্রকৃতি সম্পর্কিত সংকীর্ণ অচল মতামতের চেয়ে আরো সুদূরপ্রসারী ছিল। প্রথমতঃ গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে তাঁর মতামত প্রাধান্য পায় এবং পরবর্তী অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 'মানুষকে একটি আনন্দ-যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা, আর তার অবিরাম সুবিধা আর অসুবিধার তুলনা করে বিকল্প কর্মপন্থার সম্পর্কে হিসাব নিকাশ করার প্রবণতা' বেন্‌থামের এই ধারণাটা সাধারণ্যে গৃহীত হয় এবং মানুষের যুক্তিযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহার বিধি সেই ভাবেই সংজ্ঞায়িত হয়। ব্যক্তির

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত সমূহের যোগফলে যে সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হয়, এই ধারণাটা অবশ্য অ্যাডাম স্মিথ এবং অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের কাজেও অন্তর্নিহিত ছিল, কিন্তু বেন্থাম এটা অধিক স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন। গোটা অর্থনীতির সকল পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ একান্তভাবেই মানব-প্রকৃতি সম্পর্কিত এই ধারণার ভিত্তিতে অথবা তার সাথে সম্পর্কিত করেই রচিত হয়।

অর্থনীতি বিজ্ঞানে বেন্থামের অবদানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল উদারপন্থী সামাজিক দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব। (সরকারী) হস্তক্ষেপের উপর তিনি যে গুরুত্ব দেন সেটা ছিল পূর্ব প্রচলিত 'লেইজে ফেরে' (laissez faire) নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তার সমাধান আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন উদারপন্থীরা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সকল কর্মনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব দিত। রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঐ মতের সমর্থকরা যুক্তি দেখান যে স্বাধীনতার উপর যে কোন নিয়ন্ত্রণই সর্বাধিক কল্যাণ অর্জনকে বাধা দেয়। তাদের সেরা বিশ্লেষক অ্যাডাম স্মিথের হাতে এই দর্শন অনুসারে সরকারের ভূমিকা থাকবে সর্বনিম্ন পরিমাণে, নেহাৎ কতকগুলো অবশ্য করণীয়, যেমন পুলিশ, বিচার এবং অস্ত্রে সীমাবদ্ধ।

অবশ্য, বেন্থাম দেখলেন যে ঐ দর্শনের ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল যে শুধু ব্যক্তির কার্যাবলীই কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে। তাঁর বাস্তবদর্শী মন বলে দেয়, এমনো তো হতে পারে যে একটি মানুষ নিজ স্বার্থে যে কাজ করে, তাতে অপর ব্যক্তির কল্যাণ হ্রাস পেতে পারে। আইন বিষয়ে তাঁর প্রশিক্ষণ এবং শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে অনুশীলনের ফলে তিনি বুঝতে পারেন, লোকেরা যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে, তা তাদের কাজের ফলাফল গুরুতরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। মনুষ্য সমাজ যে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, একটা সামাজিক ব্যবস্থা যে বর্তমান আছে, শুধু এ থেকেই বোঝা যায় যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে এমন সামাজিক কাঠামো গঠন করা সম্ভব, যার মধ্যে বাস করলে মানুষের জীবন উন্নতর হবে। বেন্থাম-সৃষ্ট উপযোগবাদটা ছিল সম্ভাবনাময় একটি হস্তক্ষেপপন্থী তত্ত্ব (Interventionist Doctrine)।

বেন্থাম এবং ইংল্যান্ডের তাঁর সমর্থকদল, যারা নিজেদেরকে 'দার্শনিক আমূল সংস্কার পন্থী' (philosophical radicals) বলতেন, তাঁদের দলে

www.pathagar.com

ছিলেন অর্থনীতিবিদ জেমস্ মিল, ডেভিড রিকার্ডো এবং পরবর্তী সময়ে জন স্টুয়ার্ট মিল্। গণতান্ত্রিক সরকার এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রশাসনের সমর্থক হিসাবে তাঁদের সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য রেখেছিলেন সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যাতে সেকালে বহুসংখ্যক লোকের মোটেও ভোটাধিকার ছিল না এবং যে ব্যবস্থায় পুর্ণ বাক স্বাধীনতা এবং লেখার স্বাধীনতা ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সমাজ–ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ আসবে কেবল তখনই, যখন এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক হবে এবং যদি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলবৎ থাকে। তাঁরাও ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ছিলেন এবং মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবং সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতির (laissez faire) প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু ঐ উপযোগবাদী রাজনৈতিক দর্শনের কারণে তাঁদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একবার রাজনৈতিক সংস্কারটা হাসিল হয়ে গেলে নব্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভোটার সমাজ অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য তাদের ক্ষমতা ব্যবহার শুরু করলো এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে 'সরকারের হস্তক্ষেপ না করার' নীতিটা বাতিল করে দিল। ঐ সব সংস্কারকে সমর্থন করা হলো ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কল্যাণের দোহাই দিয়ে, আর তাতে 'সর্বাধিক কল্যাণের' যুক্তিটা বারে বারে ব্যবহার করা হলো। ক্লাসিক্যাল উদারপন্থীবাদ, যা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর জোর দিয়েছিল, এবার তার স্থান দখল করে নিল হস্তক্ষেপ প্রবণ উদারপন্থীবাদ (interventionist liberalism) যাতে জোর দেয়া হলো সামাজিক কল্যাণের (social welfare) উপর, এবং বেন্থাম হয়ে গেলেন তাদের দীক্ষাগুরু।

বেন্থামীয় চিন্তাধারার উদয় সামাজিক কর্মপন্থার ক্ষেত্রে অর্থনীতির জন্য বহুবিধ সম্ভাবনা এনে দেয়। এক প্রান্তে এতে গোঁড়া সরকারী হস্তক্ষেপ বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্থান হলো। অপর প্রান্তে চরম সমাজ সংস্কারকদেরও অন্তর্ভুক্তি এতে থাকলো। তত্ত্ব আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিয়ম তো একই ছিল, ফলে কোন্ ধারণাগুলো যে সঠিক যে বিষয়ে সকলের পক্ষেই ঐক্যমতে পৌছানো সম্ভব হতে পারতো। কিন্তু অঙ্গীকার (assumption) আর পূর্বপ্রত্যয়গুলো (pre-conceptions) ছিল পৃথক তাই সিদ্ধান্তগুলোও হয় ভিন্ন। অর্থনৈতিক চিন্তার প্রধান ধারার এই বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু আজ পর্যন্তও অব্যাহত রয়েছে এবং এতে করে ভাল অর্থনীতিবিদদের পক্ষেও এমন বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব যার থেকে অপর অর্থনীতিবিদরা ন্যায় সঙ্গতভাবেই ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে।

www.pathagar.com

আজকের দিনে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির প্রধান বক্তব্যগুলোর গুরুত্ব আজও তেমনই রয়েছে, যেমন ছিল রিকার্ডোর সময়ে। অবশ্য, অর্থনীতির পরিবর্তন হয়েছে, শিল্পবিপ্লব থেকে এসেছে পরিণত পুঁজিবাদী শিল্প ব্যবস্থা। কিন্তু সম্পদ, মানুষ আর মূলধনের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কগুলো আজও মানবিক কল্যাণের সমস্যায় সর্বপ্রধান স্থান দখল করে রয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা আজ দ্রুত হাজার কোটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই ম্যালথাসের উল্লিখিত 'জনসংখ্যা–ফাঁদ' আজ আবার সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। শিল্পায়িত উন্নত দেশগুলো উৎপাদন আর জনসংখ্যার যোগসূত্র ভাঙ্গতে সমর্থ হয়েছে– উৎপাদন বৃদ্ধি আর সেখানে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি শুরু করিয়ে দেয় না, যেটা সেখানে ইতিপূর্বে মাথাপিছু আয় বাড়তে দিত না। কিন্তু অনেক স্বল্পোন্নত দেশে জন সংখ্যার বৃদ্ধি আক্ষরিকভাবেই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের লাভটা খেয়ে ফেলছে আর কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যে অসাড় হয়ে রয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ম্যালথাস বিষয়ক সমস্যাটি জটিল হয়ে পড়ে, কারণ সেখানে সামাজিক কাঠামো এমন যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বড় অংশটাই চলে যায় বড় ভূমি মালিক, আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলো আর শহরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে। জন সংখ্যা বৃদ্ধি তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোতে মজুরী কমিয়ে রাখে আর পল্লী এবং শহর উভয় অঞ্চলেই বিপুল পরিমাণে বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে। আধুনিকীকরণের ফলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য এবং সম্পদের বিপুল এক পার্থক্য সৃষ্টি করে, যার প্রতিকার জরুরী হয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে, উন্নত দেশগুলোতে মূলধন সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া এবং প্রকৌশলগত পরিবর্তন সেখানে অধিক পরিমাণে সম্পদ এবং উন্নত জীবন ধারণের মান সৃষ্টি করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পঁচিশ বছর ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আর দীর্ঘস্থায়ী বৈষয়িক কল্যাণের যুগ। এই প্রবৃদ্ধি জঞ্জাল (pollution) বৃদ্ধি এবং নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, এমন সব সম্পদ ব্যবহারের দ্বারা, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরেও বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে। ১৯৬০–এর দশকের শেষের দিকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে প্রবৃদ্ধির এই দ্রুত তাল উৎপাদনের কৌশলে বিরাট পরিবর্তন ছাড়া অনির্দিষ্ট কাল ধরে বজায় রাখা যাবে না, আর উৎপাদন কৌশলের তেমন পরিবর্তনও তাড়াতাড়ি আনা সম্ভবপর নয়, যার দ্বারা এই প্রবৃদ্ধির গতিটা বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। গতি মন্থর হয়ে আসাটা ছিল অবশ্যম্ভাবী আর নিঃসন্দেহে তা আসলো ১৯৭০–এর দশকে।

www.pathagar.com

এই সকল ঘটনার ফলে আবার অর্থনীতিতে জনসংখ্যা, মূলধন সঞ্চয়, প্রকৌশল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যেকার পারস্পরিক মৌলিক সম্পর্কগুলো নতুন করে গুরুত্বলাভ করলো। যেগুলো ছিল এককালে ক্লাসিক্যাল অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (economic policy), এই সব বিষয় নিয়ে ক্রমশঃ অধিক চিন্তা ভাবনা করছে এবং যেটা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাব, অর্থনীতিবিদরা আবার ঐগুলোতেই ফিরে যাচ্ছে এবং ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের বিষয়ে আবার নূতন করে তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির যে একটা শেষ আছে এবং তার পর 'স্থিতিশীল অবস্থা' অর্জনের বিষয়ে রিকার্ডো যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আধুনিক যুগে আবার সেটা প্রাসংগিক বলে মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

৫
সমাজতন্ত্র ও কার্ল মার্কস্

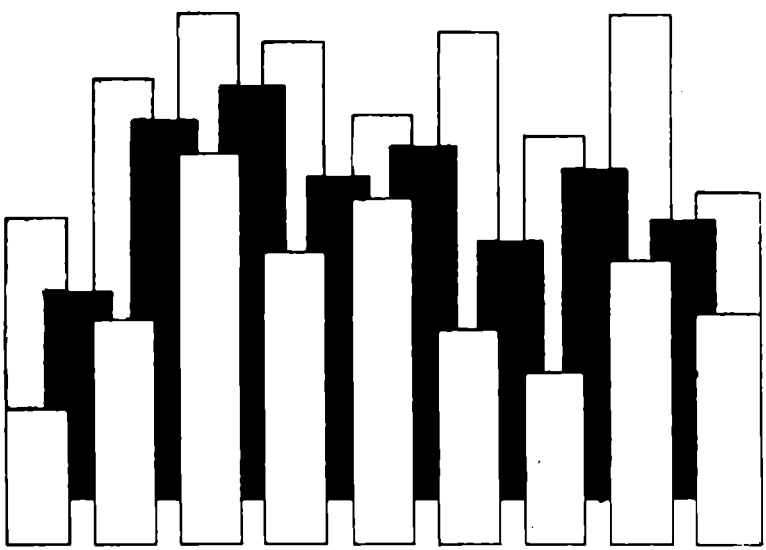

সমাজতন্ত্রের বিকাশও ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির মতই শিল্প যুগের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই আসে এবং ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে যেমন নব্য তন্ত্র সম্পর্কে একটি চিন্তাধারা গড়ে তোলে, তেমনই সমাজতন্ত্রীরা এর একটা সমালোচলা গড়ে তোলে।

সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল অবাস্তব আদর্শবাদী স্বাপ্নিক, কেউ ছিল বর্তমান সমাজের একগুঁয়ে সমালোচক এবং কেউ ছিল বিপ্লবপন্থী। কিন্তু এদের সকলের মধ্যে যে সাধারণ যোগসূত্র ছিল, তা হচ্ছে নয়া শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা আর উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

মালিকানার বদলে সাধারণ মালিকানার বিষয়ে ঐক্যমত। সমাজের রূপ সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের তুলনায় সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিকোণ ছিল ভিন্ন, তাঁদের যুক্তিমতে সমাজের গোটা কাঠামোর অপরিহার্য উপাদান ব্যক্তি নয়, বরং কতকগুলো শ্রেণী। তাঁরা ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের বস্তুতান্ত্রিক মুনাফা মনোবৃত্তির বদলে মানব-প্রকৃতির সমবায় ধর্মী উপাদানের উপর অধিক জোর দেন এবং সমাজে যে আয়ের বৈষম্য বিরাজমান ছিল তার বদলে সাম্যের প্রতি সমর্থন দেন। সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের যুক্তির সমর্থনে বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থাটা ঘন ঘন উদ্ধৃত করতেন— যেটা ছিল আসলেও প্রচলিত শিল্প ভিত্তিক ধনতন্ত্রের প্রকৃত গলদ।

সমাজতন্ত্র ও সমসাময়িক মতামত

১৭৭৫ থেকে ১৮২৫ এই অর্ধ শতাব্দীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী যে পটভূমি সৃষ্টি করে, তার থেকেই আধুনিক সমাজতন্ত্রের উত্থানের ব্যাপারটা অনুধাবন করা যায়। শিল্পবিপ্লব ছিল এ ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ফলেই নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ধারণের মানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং তাদের হাতে প্রচুর সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ আসে। পরিষ্কার বোঝা গেল যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে শিল্পায়ন, পুঁজি বিনিয়োগ আর উন্নততর উৎপাদনশীলতা। ক্রমবর্ধমান বাজারের সুযোগ আরো বেশী অগ্রগতির সম্ভাবনা দৃশ্যমান করে তোলে।

সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিতে অবশ্য শিল্পবাদের চেহারাটা ছিল ভিন্ন। নতুন কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের মজুরী দেয়া হতো কম ; যদিও কারখানার মজুরী গ্রামাঞ্চল থেকে আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্টই ছিল, পল্লী এলাকায় বেকার সমস্যার কারণে শ্রমিকরা মজুরী কম হলেও তা গ্রহণ করতে রাজি ছিল। কাজের সময় ছিল দীর্ঘ, মহিলা এবং শিশুদের বিপুল সংখ্যায় নিয়োগ করা হতো এবং অনেক সময়ই তাদের কাজ ছিল কঠিন আর বিপদজনক। কারখানার নিয়ম-কানুন ছিল কড়া আর অনড় এবং কোন কোন অঞ্চলে আবার কোম্পানীরই মালিকানায় একচেটিয়া দোকান ছিল, যেখানে কর্মচারীদের কাছে জিনিস বিক্রি করেও লাভ করা হতো। বস্ত্র এবং কয়লা শিল্পে বিশেষ করে প্রতিযোগিতা থাকার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নিচু থাকতো এবং প্রতিষ্ঠানগুলো সুযোগ পেলেই শ্রমিকদের মজুরী ব্যয় হ্রাস করে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সুবিধার চেষ্টা করতো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে, যেখানে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়, সেখানে এই সব দোষত্রুটি বিশেষভাবে দেখা যায়।

www.pathagar.com

শিল্প-কারখানা জীবনের বাস্তবতা তখন নতুন শিল্প মালিক এবং ব্যাংকারদের বর্ধিষ্ণু সম্পদ আর শহরের বস্তিবাসী কারখানা শ্রমিক-গোষ্ঠীর সম্বলহীন দরিদ্র অবস্থার মধ্যে, এক তীব্র বৈপরীত্যের সৃষ্টি করলো। ইংল্যান্ডে 'ক্ষুধার্থ চল্লিশের' (hungry forties) সময়ে বেঞ্জামিন ডিজরেলী ধনী আর দরিদ্র এই 'দুই জাতির' বিষয়ে লিখলেন, ওদিকে চার্লস্ ডিকেন্স তাঁর 'হার্ড টাইমস্' (hard times) এর নিরীক্ষা করলেন, এবং সাধারণ মানুষ টমাস হুডের সেলাইকর্মী মহিলাদের বিষাদময় জীবনের কবিতা 'সং অব দি সার্ট' (Song of the Shirt) পাঠ করলো।

দারিদ্র্যটা সব সময়ই ছিল এবং ধনী-দরিদ্র যুগ যুগ ধরেই পাশাপাশি বাস করে এসেছে। এই মানুষকেই সর্বদা 'বিরূপ প্রকৃতির' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু শিল্পায়ন প্রাচুর্যের আশ্বাস নিয়ে এলো। এই প্রথম যেন মনে হলো, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, তা উৎপাদন করা সম্ভব আর বেঁচে থাকার সেই সুকঠিন সংগ্রামের শেষটা অবশেষে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ম্যানচেস্টারের ধূসর বস্তিগুলো আর কয়লাখনির কালো দেশের দিকে দেখলে একটা ভিন্ন কাহিনীই পাওয়া যেতো। সম্ভাবনা আর বাস্তবতার মধ্যে দেখা গেল পার্থক্যটা বিরাট।

রাজধানীতেও সেই একই রকমে আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান ছিল। ১৭৮৯ সনের ফরাসী বিপ্লবীরা 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব' ঘোষণা করলো আর ঐ স্লোগানের দ্বারা ফরাসীরা প্রাচীন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সুবিধাগুলো উৎখাত করে সারা ইউরোপ থেকে সামন্তবাদ আর অভিজাততন্ত্রের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে কুচকাওয়াজ চালালো গোটা ইউরোপে। মনে হলো, এই স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের নতুন বিশ্বাস রাজনীতির ক্ষেত্রে এক পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে আসবে, যেমন শিল্পবিপ্লব আনলো দারিদ্র্য খতম করার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

কিন্তু নেপোলিয়ন পরাজয় নিয়ে এল বিপরীত প্রতিক্রিয়া আর উৎপীড়ন— এবং সুযোগ-সুবিধাসহ প্রাচীন ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন। এমন কি যেসব ক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল যেমন ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সে, সেখানেও সীমাবদ্ধ সংখ্যক সম্পদশালী ব্যক্তিই এতে অংশ নিত এবং খেটে-খাওয়া মানুষের দলের কোন ভোটাধিকার ছিল না। দৃশ্যতঃ গণতন্ত্রটা ছিল যেন মধ্যবিত্তদের জন্য একটা চমৎকার ব্যবস্থা, কিন্তু শ্রমিকদের এই ধারণার আওতায় আনলেই তা হয়ে যাবে বিপদজনক।

www.pathagar.com

বহু লোকের কাছেই মনে হয়েছিল যে শিল্পবিপ্লব আর ফরাসী বিপ্লব হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু যুগের আকাংখিত সুপ্রাচীন আদর্শ সকল বাস্তবায়নের একটা উপায় স্বরূপ – প্রাচুর্য্য, ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের শেষ এবং ভ্রাতৃত্বের আর সাম্যের জয় জয়াকার। অতঃপর দেখা গেল নেপোলিয়ন-পরবর্তী সময়ের প্রতিক্রিয়ার অন্ধকারে এই সবই ভেসে গেল এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালের মন্দা যেন দারিদ্র্য আর অভাবকে আগের আমলের চেয়ে তীব্রতর করে উপস্থিত করলো, কারণ তখন আর বেকার শ্রমিকদের জন্য ফিরে গিয়ে দু'মুঠো খাদ্য উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র এক টুকরো জমিও অবশিষ্ট ছিল না। প্রথম যুগের সমাজতন্ত্রীদের কাছে মনে হলো, সমাজের এই কষ্টের উৎস হচ্ছে উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা। কলকব্জা, কারখানা এবং অন্যান্য পুঁজির মালিকানা ধনী শ্রেণীকে মোটা মুনাফা অর্জনের আর পরবর্তী সময়ে বসে খাবার সুযোগ এনে দিল। আর ওদিকে অন্যদের জন্য ব্যবস্থা হলো খেটে খাওয়ার। একই সাথে আবার অর্থনৈতিক সুযোগ তাদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা এনে দিল। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে পঞ্চাশ বৎসরের সামাজিক বিপ্লবের ফলে সম্পদ আর ক্ষমতা বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের বদলে মাত্র কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে এসে জমা হলো। সমালোচকদের মতে গোটা সমাজ অল্প কয়েক জনের লাভের স্বার্থে এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে পড়লো।

রবার্ট ওয়েন, নিখুঁত রাষ্ট্রের কল্পনাবাদী (UTOPIAN)

প্রথম যুগের সমাজতন্ত্রের মানবিক আর আদর্শগত ভিত্তিটা ইংরেজ রবার্ট ওয়েনের (১৭৭১–১৮৫৮) লেখা এবং কাজের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। তাঁর শিক্ষানবিশী শুরু হয় ১০ বৎসর বয়েসে একজন ক্ষৌম-বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানে, তার পর যৌবনে তিনি বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, যার মধ্যে একটি দোকানে 'প্রায়ই কর্মচারীদের সকাল আটটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করানো হতো'। নিজের ব্যবসা করতে গিয়ে তাতে অকৃতকার্য হয়ে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে, তিনি একটি বস্ত্র কারখানার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। সাত বৎসর পর তিনি স্কটল্যান্ডের নিউলানার্কের বস্ত্র কারখানাগুলোর মালিকানা খরিদ করতে সক্ষম হন, এবং ১৮০০ সনে তিনি সেগুলোর সক্রিয় ব্যবস্থাপনা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। প্রাক্তন ব্যবস্থাপকগণ এই সব কারখানায় শ্রমিক হিসাবে এতিমখানার শিশু নিয়োগ করতো, বয়স্ক শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই ছিল 'চোর, মাতাল এবং নানা ধরনের অপরাধী'। শিশু এবং বয়স্ক উভয়ের জন্যই কাজের সময় ছিল ভোর ছয়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এবং কারখানা, শহরের

www.pathagar.com

গৃহগুলো ছিল এক কামরার কাঠের ঘর। সে সময়ের অন্যান্য কারখানার তুলনায় এই কারখানার কাজের এবং থাকবার অবস্থা তবুও মন্দ ছিল না বলা যায়।

ওয়েন একজন ধার্মিক লোক ছিলেন এবং তার বিশ্বাস ছিল যে নিউলানার্কের শ্রমিকরা তাদের পারিপার্শ্বিকতার জন্যই খারাপ হয়েছে। আর তাই তিনি স্থির করলেন যে নিউলানার্ককে একটি আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত করবেন। তিনি আর নতুন করে দরিদ্র আশ্রম বা এতিমখানার শিশুদের কাজের জন্য নিতেন না এবং দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের কাজ করতে অনুমতিই দেননি। শিশু এবং বয়স্ক সকলের জন্যই কাজের সময় স্থির করা হলো দিনে সাড়ে দশ ঘন্টা। তিনি শিশু কর্মীদের জন্য সন্ধ্যায় স্কুলের ব্যবস্থা করলেন (একজন শিশুর সাড়ে দশ ঘন্টা কাজের পর আবার স্কুলের পড়া, চিন্তা করুন) এবং একেবারে ছোটদের জন্য নার্সারী স্কুল খুললেন। তাঁর বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য 'চরিত্রের খাতা' খোলা হলো, যার মধ্যে মাতলামী বা বেআইনি যৌন সম্ভোগ এবং ঐ জাতীয় অপরাধের কথা এমনভাবে লিখে রাখা শুরু হলো, যে শহরের মদের আড্ডাগুলো (pubs) সব অদৃশ্য হয়ে গেল এবং দীর্ঘ নয় বৎসরে সেখানে মাত্র আটাশটি জারজ সন্তানের জন্ম হয়। 'বাগ হান্টারস (bug hunters) নামে মহিলাদের একটি নির্বাচিত কমিটি সপ্তাহে একবার করে সব বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বাড়ির পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করতো। আহত, অসুস্থ আর বৃদ্ধদের সাহায্যের জন্য একটি তহবিল গঠন করা হলো, যেখানে শ্রমিকদের মজুরীর ১/৬০ অংশ চাঁদা দিতে হতো। সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং যারা ঐ ব্যাংকের সাথে কারবার করবে, তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল বাসস্থান বরাদ্দের ব্যবস্থা হয়। পরিশেষে ওয়েন এমন একটি দোকান খুলে দেন যেখানে শ্রমিকরা বাহিরের দোকানের তুলনায় কম দামে উচ্চ মানের খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিস কিনতে পারতো।

বস্ত্রশিল্পের মতো একটা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে ওয়েন কিভাবে এত সব ভাল কাজ করার পরেও লাভ করতে পারতেন? দৃশ্যতঃ এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ তাঁর কারখানাগুলো এমন একটা এলাকায় অবস্থিত ছিল, যেখানে বাড়তি শ্রমিকের সরবরাহ ছিল, ফলে সেখানে মজুরীটা কম ছিল। ১৮১৯ সনের এক অনুসন্ধান কমিটির বিবরণে জানা যায় যে তিনি পুরুষদের সপ্তাহে ৯ শিলিং এগার পেন্স এবং মহিলাদের সপ্তাহে ৬ শিলিং করে মজুরী দিতেন, যা ঐ সময়ের গড় মজুরীর চেয়ে কম ছিল। দ্বিতীয়তঃ যদিও তাঁর নিয়মকানুন পিতৃসুলভ ছিল, কিন্তু তিনি শ্রমিকদের দিকে যে মনোযোগ দিতেন

www.pathagar.com

তার ফলে উৎপাদন-ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮১৯ সনে তাঁর লাভ ছিল বিনিয়োগকৃত মূলধনের শতকরা ১২.৫ ভাগ।

ওয়েন নিজেই স্বীকার করেন যে নিউলানার্কের সংস্কারগুলো শ্রমিকদের তরফ থেকে না এসে বরং এসেছিল শুভাকাংখীর তরফ থেকে, এবং অতঃপর আসতে হবে শিল্পে স্বায়ত্বশাসনের কোন একটি ব্যবস্থা। ১৮১৬ সনে যখন ইংল্যান্ডে শ্রমিকদের কাজের সময় এবং শিশু-শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম ফ্যাক্টরী আইন প্রণয়ন নিয়ে বিতর্ক চলছে, ঠিক সেই সময়ে তিনি তার মতামত প্রকাশ করলেন 'দি নিউ ভিউ অব সোসাইটি'তে, যেটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে এক যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। ওয়েন স্বয়ং ফ্যাক্টরী-আইনের পক্ষে যথেষ্ট প্রচার করেন, কিন্তু এ আইনে শিশু শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় অকৃতকার্যতা তাঁকে হতাশ করে এবং অন্যান্য মালিকরা যখন নিউ লানার্কের উদাহরণ অনুসরণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন তিনি আরো মৌলিক কর্মপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হন।

তিনি এক ধরনের সমবায়ী গোত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন যেখানে জমির মালিকানা হবে সর্ব সাধারণের, এবং ১৮২৪ খীষ্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন ইন্ডিয়ানা রাজ্যের নিউ হারমনিতে ঐগুলোরই একটা শুরু করতে। কিন্তু আমেরিকার এবং ইংল্যান্ডের ঐ ধরনের গোত্রগুলো অকৃতকার্য হলো, যাতে ওয়েনকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি পোহাতে হয়। বরং তার চেয়ে অধিক সফল হয়েছিল ওয়েনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে সমবায়ের ভিত্তিতে যেসব খুচরা দোকান খোলা হয়েছিল সেগুলো, আর সেখান থেকেই শুরু হয় এক সুদূরপ্রসারী ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন যা ইংল্যান্ডে এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে অত্যন্ত সফল হয় এবং তা যুক্তরাষ্ট্রেও কিছুটা গড়ে উঠেছিল বলা চলে। ওয়েন উৎপাদনকারীদের সমবায়ও শুরু করেন, অর্থাৎ শ্রমিকদের দল যারা তাদের কার্যস্থলে ছোট কারখানার মালিক, তাদের নিয়েই ছিল এই সংগঠন। কিন্তু সে সব প্রকল্প সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

ওয়েন ছিলেন একজন কল্পনাপ্রবণ মানুষ, যিনি শ্রমিকদের মালিকানা ভিত্তিক গোত্র বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন, যেখানে মুনাফাখোরী বন্ধ হবে। তিনি মনে করতেন, যে কোন দলের সমবায় ভিত্তিক সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে তাতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জীবন অধিক অর্থপূর্ণ এবং সার্থক হতে পারবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক যুগে তাঁর সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই বিফল হতে বাধ্য ছিল। তিনি সম্ভবতঃ সত্য কথাই লিখেছিলেন, যখন তার

www.pathagar.com

এক ব্যবসায়ের সহযোগীকে চিঠিতে বলেন, "তুমি আর আমি ছাড়া আর গোটা দুনিয়াকেই আমার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হয়, আমার মনে হয় তুমি এসব দেখে একটু ব্যথিতই হও"।

কার্ল মার্কস্, বিপ্লবী

আদর্শবাদী আর বাস্তব জ্ঞানহীন ওয়েনের বিপরীত ছিলেন তীব্র জার্মান কার্ল মার্ক্স (১৮১৮–১৮৮৩)। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জার্মানীর সবচেয়ে অগ্রগামী অঞ্চল রাইনল্যান্ডে তাঁর জন্ম এবং শৈশব কাটে, তাঁর পিতা ছিলেন আইন বিভাগের ক্ষুদ্র সরকারী কর্মকর্তা এবং অল্প বয়সেই মার্কস প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেন। বন এবং বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে পাঠানো হয়, এবং প্রথমে সরকারী উচ্চপদের আশায় তিনি আইন বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করেন, কিন্তু জার্মানীর স্বৈরাচারী সরকারের বিরোধিতা করায় তাঁর সে সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। তখন তরুণ মার্কস্ অধ্যাপক হবার আশায় দর্শনশাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন। বার্লিনে তাঁর দর্শন আর ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সময় "খীষ্ট ধর্মের তত্ত্বে নির্বিকারবাদী (stoic) এবং ভোগবাদী (epicurean) মূল" বিষয়ে তিনি একটি গবেষণা–নিবন্ধ (doctoral dissertation) রচনা করেন এবং দেখা গেল তিনি নিরীশ্বরবাদের (atheism) দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাই এবার মার্কস্ সাংবাদিকতায় যোগ দিলেন এবং ১৮৪২ সনে কোলনের একটি উদারপন্থী সংবাদপত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন। এ কাজে অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে লিখতে গিয়েই রাজনীতির অর্থনৈতিক ভিত্তির বিষয়ে তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে, সকল রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতারই তলে তলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ কাজ করে চলেছে। অবশ্য অল্প দিনের মধ্যে উদার মতবাদের জন্য সরকার তাঁর পত্রিকা বন্ধ করে দেয় এবং মার্কস্ প্যারিসে চলে যান, সেখানে তাঁর শৈশবের প্রেমিকা এক জার্মান ব্যারনের কন্যাকে বিয়ে করেন, আর সেখানেই কয়েকজন সমাজতন্ত্রীর সাথে তাঁর পরিচয় হয়।

এদের মধ্যে একজন ছিলেন সমাজতন্ত্রী নেতা পিয়েরে যোসেফ প্রুদোঁ (১৮০৯–১৮৬৫), যিনি তাঁকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেন। প্রুদোঁর (Proudhon)

www.pathagar.com

প্রধান কাজ ছিল 'সম্পত্তি কি?' এই নামে একটি বই ('সম্পত্তি হচ্ছে চুরি' এটাই ছিল তার নিজের উত্তর), যাতে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলা হয় যে শিল্পের সম্পূর্ণ উৎপন্নটাই শ্রমিকদের প্রাপ্য এবং উৎপাদনের উপকরণ যখন ব্যক্তিগত সম্পদ হয়, তখন পুঁজিমালিক এর দ্বারা শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্য সম্পদ নিজে গ্রাস করে। এই ধারণাটা, যা প্রুদোঁরও নিজস্ব ছিল না, এটাই হলো উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের মূল মতবাদ এবং ধনতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসের নিজস্ব মতামতেরও প্রধান অংগ। প্রুদোঁর আর একটি বই যার উপশিরোনাম ছিল 'দারিদ্র্যের দর্শন' তাতে সমসাময়িক গোঁড়া অর্থনীতিকে এবং বিশেষভাবে তার অন্তর্ভুক্ত 'মজুরীর লৌহ কঠিন সূত্র'কে আক্রমণ করা হয়। যে সূত্রে ম্যালথাসের যুক্তি মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মজুরীর প্রবণতা হলো বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণের দিকে নেমে যাওয়া। প্রুদোঁর যুক্তি শুধু আপাতঃ দৃষ্টিতে ন্যায্য বলে মনে হয়, প্রকৃত নয়। এই বিশ্বাসে মার্কস্ তার বন্ধুকে আক্রমণ করে বিদ্রুপাত্মক 'দর্শনের দারিদ্র্য' শিরোনামে একটি বই লেখেন। জনশ্রুতি অনুসারে এর পর প্রুদোঁ কখনো মার্কসের সাথে কথা বলেননি।

যাঁদের সাথে প্যারিসে মার্কসের পরিচয় হয় তাঁদের মধ্যে আর একজন ছিলেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (১৮২০–১৮৯৫), এক ধনী জার্মান বস্ত্রশিল্প মালিকের সন্তান, এঙ্গেলস্–এর পিতার ইংল্যান্ড এবং জার্মানী উভয় দেশেই কারখানার মালিকানা ছিল। এঙ্গেল্সের সাথে মার্কসের বন্ধুত্ব তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী এবং তাঁরা দুইজন একত্রে যে চিন্তাধারা গড়ে তোলেন তা পরে মার্কস্ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিকাংশ সময় মার্কস্ এবং তাঁর পরিবারের ভরণ–পোষণ আসে এঙ্গেল্সের কাছ থেকেই।

প্যারিসে থাকার সময়ে মার্কস্ তাঁর সাংবাদিকের পেশাটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন; তাঁর লেখায় বিশেষভাবে প্রুশিয়ার সমালোচনা করা হয় এবং এর ফলে প্রুশিয়ার সরকারের অনুরোধে অচিরেই তাঁকে ফ্রান্স থেকেও বহিষ্কার করা হলো। ১৮৪৮ সনে ঐ বছরে সংঘটিত বিপ্লবের ঠিক আগে ব্রাসেল্সে এসে মার্কস্ এবং এঙ্গেল্স্ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচনা করলেন; ইউরোপ এক আতঙ্কময় অপচ্ছায়ার কবলে পড়েছে.... দুনিয়ার মজদুর এক হও, শুধু শৃংখল ছাড়া তোমাদের আর কিছুই হারাবার ভয় নাই। একজন সক্রিয় বিপ্লবী হিসাবে মার্কসের নবজীবন তখন শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিপ্লবের প্রারম্ভে মার্কস্ কোলোনে ফিরে এলেন, আবার তাঁর খবরের কাগজ চালু করলেন এবং গোটা ইউরোপ তোলপাড় করা এই বিপ্লবের প্রচারে

www.pathagar.com

লেগে গেলেন। কিন্তু বিপ্লব দমন করা হলো, আর মার্কস্ হলেন জার্মানী থেকে বিতাড়িত এবং ফ্রান্সেও অনাহুত হবার ফলে তিনি গেলেন ইংল্যান্ডে এবং সেখানেই তাঁর বাকী জীবনটা অতিবাহিত হয়। সময় সময় তাঁর সাংবাদিকতার পেশাও চালু ছিল। কিছু কালের জন্য তিনি 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে'র ইংল্যান্ডস্থ সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেন, এবং ১৮৭০ সনের ফরাসী কমিউন সম্পর্কে লেখেন 'লন্ডন টাইম্‌সে'। কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই ব্যয় হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে অর্থনীতি বিষয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার কাজে এবং তার মহান অবদান 'ক্যাপিটাল' রচনায়। এই গ্রন্থটি ছিল একাধারে সর্বসাধারণের সমক্ষে ধনতান্ত্রর বিরুদ্ধে নিন্দা (denunciation) কথাটা মার্কসেরই আবিষ্কার এবং কেন এই ব্যবস্থা বিফল হতে বাধ্য, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১৮৬৭ সনে প্রকাশিত হয় এবং শুধু এই অংশটাই মার্কসের নিজের হাতে সমাপ্ত। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সনে, মার্কসের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে এবং এঙ্গেল্‌সের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে সর্বশেষ খণ্ড ১৮৯৪ এর আগে প্রকাশিত হয়নি।

পাণ্ডিত্য অবশ্য তাঁর বৈপ্লবিক উত্তেজনার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারেনি। কারণ যখন ১৮৬৪ সনে 'ইন্টারন্যাশন্যাল' সংগঠিত হয় (বিপ্লবী দলগুলোর একটি আন্তর্জাতিক মৈত্রী বন্ধন), মার্কস তাতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তিনি মনে করতেন যে শুধু তাত্ত্বিকই যথেষ্ট নয়, কারণ যখন ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থার পতন হবে, তখন অবস্থাটা সামলে নেবার জন্য একটা বিপ্লবী দলও থাকতে হবে। তিনি সম্পদহীন দরিদ্রদের (proletarian) বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমর্থনে আর ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে প্রচুর লেখেন। সর্ব সাধারণ্যে তিক্ততাপূর্ণ ভাষায় নিন্দাবাদের যে নজির তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন, আজ পর্যন্তও নিয়মতান্ত্রিক আমূল সংস্কারবাদের (left wing radicalism) জন্য তা এক অভিশাপ হয়ে রয়েছে।

বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করে দেয়ার পর ১৮৮৩ সনে মার্কসের মৃত্যু হয়। মনে প্রশ্ন জাগে যে আজকের পৃথিবীটা এখন যা, তার চেয়ে কি ভিন্ন হতো না, যদি নেপোলিয়ন পরবর্তী প্রুশিয়ার কড়া স্বৈরাচারী সরকার মার্কসের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী পাওয়াটা সেকালে বন্ধ না করতো?

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের মত

মার্কসের শক্তি আর সংগতির প্রতি অবিচার না করে তাঁর চিন্তাধারার সেই বিশাল পরিধির কোন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা দুষ্কর। মার্কসের যুক্তি সুদীর্ঘ আর জটিল, যার প্রত্যেকটি অংশ যুক্তি ভিত্তিতে একে অপরের সাথে সংযুক্ত, শুধু এই কারণেই তাঁর বক্তব্যের যে কোন সংক্ষিপ্ত সার প্রায় সত্যের অপলাপ হয়ে পড়ে। তবুও শুধু এই কারণেই যুক্তিটা বুঝে নেয়া অত্যন্ত জরুরী যে, বর্তমান জগতের একটি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান মতবাদের ওটাই হলো ভিত্তি।

মার্কসের ধারণার শুরু হয় এই বলে যে, অর্থনৈতিক সম্পর্কটাই যে কোন সমাজের মৌলিক পরিচালন–শক্তি। বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজে অবশ্যই মানুষের সকল প্রেরণার উৎস অর্থনৈতিক স্বার্থ, কিন্তু সেটা তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক, 'এ কন্ট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পোলিটিক্যাল ইকনমি'র (১৮৫৯) ভূমিকায় তিনি বলেছেনঃ

"মানুষ সামাজিক উৎপাদনে যে কাজ করে, তাতে তার এমন এক নিশ্চিত সম্পর্কের মধ্যে যেতে হয় যা অনিবার্য আর তার ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল নয়, উৎপাদনের এই সম্পর্ক মানুষের বাস্তব উৎপাদন ক্ষমতা বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরের অনুরূপই হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সম্পর্কের এই যোগফলের দ্বারাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত হয় আর ওটাই হচ্ছে সমাজের প্রকৃত ভিত্তি, যার উপর গড়ে উঠে আইন এবং রাজনীতির অবকাঠামোগুলো যা আবার হয় সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট আকারের অনুরূপ। বাস্তব জগতে উৎপাদনের পদ্ধতিই স্থির করে দেয় যে জীবনের সামাজিক রাজনৈতিক এবং আত্মিক প্রকৃতিটা কেমন হবে।"

মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে দুটি সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক স্বার্থ হলো পুঁজিমালিকের আর শ্রমিকের। এই দুটি শ্রেণী একে অপরের বিপরীতে দাঁড়ায়, কারণ পুঁজিমালিক বিত্তশালী হয় শুধু শ্রমিককে শোষণ করেই। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারা এমনই যে তাতে এদের এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করেই টিকে থাকে। আর এই দিক দিয়ে দেখলে, পুঁজিবাদটা হলো সেই ধারা–ক্রমের সর্বাধুনিক সংযোজন। দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮) কথাটা একদম খোলাসা করে বলেছে ঃ

"ইতিপূর্বে যেসব সমাজ দেখা গিয়েছে, তাদের সকলেরই ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী–সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন আর দাস, সম্ভ্রান্ত (patrician) এবং হীন

www.pathagar.com

(plebian), জমিদার আর সামন্ত, গীল্ডমাস্টার আর জার্নিম্যান, এক কথায় অত্যাচারী আর অত্যাচারিত, সব সময় এরা একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে... একালের বুর্জোয়া সমাজ (bourgeois society) গজিয়ে উঠেছে সামন্তবাদী সমাজের (feudal society) ধ্বংসাবশেষ থেকে, তাই এরা শ্রেণী বিরোধী সম্পর্ক বিসর্জন দিতে পারেনি। এতে বরং প্রতিষ্ঠা হয়েছে নতুন শ্রেণী বিন্যাসের, নতুন উপায়ের, এবং পুরাতন সংগ্রামের স্থলে এসেছে তার নতুন আকার।"

পুঁজিবাদের উপর মার্কস্ তার আক্রমণ শুরু করেছিলেন 'মূল্যের শ্রম বিষয়ক তত্ত্ব' (Labour Theory of Value) দিয়ে। স্মরণ করা যেতে পারে যে এই তত্ত্বটা অর্থনৈতিক উদারপন্থী এবং ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের দ্বারা রচিত হয়। আর এতে বলা হয় যে, কোন দ্রব্য বা সেবার প্রকৃত মূল্য হলো শুধু তা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত শ্রমের পরিমাণের তুল্য। সুতরাং একটি টেবিল বানাতে যদি দশ ঘন্টার পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, আর একটা চেয়ার বানাতে যদি পাঁচ ঘন্টার পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তবে টেবিলের মূল্য চেয়ারের মূল্যের দুইগুণ।

মার্কস্‌ের মতে পুঁজিবাদে শ্রমিককে শোষণ করা হচ্ছে এই অর্থে যে উৎপন্ন জিনিস বা সেবার সম্পূর্ণ মূল্যটা তাকে দেওয়া হয় না। পুঁজিমালিক শ্রমিকের কাজের বিনিময়ে তাকে চালু হারে মজুরী দেয় আর রোজ তাকে দিয়ে যত সম্ভব বেশী সময় কাজ করিয়ে নেয়, যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে যে শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যটা তাকে দেয়া মজুরীর চেয়ে যেন বেশী হতে পারে। মজুরী আর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের এই পার্থক্যটাকেই মার্কস নাম দিয়েছেন "বাড়তি মূল্য" (surplus value) যেটা হয়ে যায় পুঁজিমালিকের মুনাফা। শ্রমিককে শোষণ করা তীব্রতর হতে পারে, এবং পুঁজিমালিক বাড়তি মূল্যও বেশী করে গ্রাস করতে পারে, যদি শ্রম-নিয়োগকারী হিসেবে সে মজুরীর হার কমাতে পারে, কাজের সময় বাড়িয়ে নিতে পারে, আর তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় বালক আর মহিলা শ্রমিক ব্যবহার করতে পারে। এই ভাবেই মার্কস্ তৎকালীন শিল্প অর্থনীতির কতকগুলো বহুল বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করেন।

আরো এক হিসেবে শোষণ চলছে। মার্কসের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদ হলো এক বিশাল যন্ত্র যার মাধ্যমে শ্রমিকের পরিশ্রমের সময়টা প্রথমে রূপান্তরিত হচ্ছে মুনাফায়, আর পরে মুনাফা রূপান্তরিত হচ্ছে মূলধন বা পুঁজিতে। শ্রমিকের কাজের সময়ের মালিক যদিও শ্রমিক, কিন্তু পুঁজিটা হচ্ছে পুঁজিমালিকের সম্পদ। এই পদ্ধতিতে পুঁজিমালিক শ্রেণী ক্রমশঃ শ্রমিক শ্রেণীর পরিশ্রমের দ্বারা ধনী

www.pathagar.com

হচ্ছেঃ প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আমেরিকার এক মৌলিক পরিবর্তনপন্থী সংগীতের ভাষায়, "তারা আমাদের প্রাণের রক্তই সোনায় রূপান্তরিত করে"।

শ্রমিকদের এই শোষণটা তাদের উপর ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রতিফল মাত্র। এ ছাড়াও আছে একটা মানসিক প্রতিফল। 'কাজ' হলো মার্কসের দৃষ্টিতে মানুষ, প্রকৃতি আর শ্রমের উৎপাদনের মধ্যে এক বিরামহীন মিথস্ক্রীয়া (interaction)। মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠার জন্য 'কাজ' একটি অপরিহার্য উপাদান, তাই পূর্ণ আত্ম-উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন, প্রত্যেক মানুষের সাথে তার উৎপাদন উপকরণ আর উৎপন্ন দ্রব্যের একটি পূর্ণ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিককে তার পরিশ্রমের ফল এবং তার উৎপাদনের যন্ত্রপাতি থেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে, যেহেতু সেগুলো এখন নিয়োগকর্তার সম্পত্তি। ফলে পূর্ণ আত্মোন্নতি এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় এমন এক পরিব্যাপক বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয় যা সকল ব্যক্তিগত আর সামাজিক সম্পর্ককে করে মানবতাবর্জিত। মানবিক অনুভূতি আর মানবিক সম্পর্কের স্থান দখল করে বাজার বিনিময় আর টাকার লেনদেন, তাতে জীবন হয়ে পড়ে মানবতাবর্জিত এবং উদ্দেশ্যহীন। ফলে দেখা দেয় বহুবিধ সামাজিক আর মানসিক বিকার অবস্থা, যা ছড়িয়ে আছে সারা ধনতান্ত্রিক সমাজে, আর তা ঐ সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীরই সহজাত।*

শোষণ আর বিচ্ছিন্নতা হলো পুঁজিবাদের এক দিক। অপর দিকটি হলো পুঁজির সঞ্চয় আর সম্পদের প্রবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার এই দিকটিও পুঁজি আর শ্রমিকের সম্পর্ক থেকেই গড়ে উঠে। নিয়োগকর্তা তার শ্রমিককে যতই শোষণের চেষ্টা করুক, মজুরীর হারটা প্রকৃত প্রস্তাবে স্থির হবে শ্রমিকের বাজারে; আর কত ঘন্টা কাজ করানো যাবে সেটা নির্ভর করবে মানুষের সহ্যসীমার উপর ; আর মহিলা এবং শিশু নিয়োগ করা যাবে কিনা, সেটা প্রভাবিত হবে প্রকৌশলিক বিষয়গুলো এবং শ্রমিক-বাজারের সম্মিলিত অবস্থার দ্বারা। এসব বিষয়ে নিয়োগকারীর অল্পই স্বাধীনতা আছে আর সহজে অন্য

---

* মার্কস তাঁর আধুনিক সমাজ সম্পর্কে এই সব অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির উপর বেশী জোর দেন নাই। প্রথম দিককার রচনায় তিনি এ সব চিন্তা করেছিলেন, যেগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে প্রকাশিত হয়নি; 'ক্যাপিটাল'-এ দুটি পরিচ্ছেদ আছে, যেখানে এ বিষয়ে আংশিক আলোচনা আছে। কিন্তু এটুকুই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অনেককেই যথেষ্ট নাড়া দেয়, যার ফলে তাঁরা একটি মতধারার সৃষ্টি করেছেন যাতে বিচ্ছিন্নতাবোধকে মানসিক ব্যাধির একটা উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পুঁজিমালিকদের উপরে সে প্রতিযোগিতায় খুব একটা সুবিধা করতে পারে না, যাদি সে তার অর্জিত 'বাড়তি মূল্য' নতুন কলকজায় পুনরায় বিনিযোগ না করে, (যাতে করে শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফা আরো বৃদ্ধি পায়)। নিঃসন্দেহে তাকে টিকে থাকার প্রয়োজনেই এসব করতে হবে, কারণ তার প্রতিযোগীরা তো তাই করবে। ফল হবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির এক বিরামহীন প্রচেষ্টা। এইভাবে মার্কস বিশ্লেষণ করলেন পুঁজি সঞ্চয়ের পদ্ধতি, উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি এবং এইভাবে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সামগ্রী। তা হলে দেখা যায়, পুঁজিবাদের দুটি চেহারা। একদিকে পুঁজির সঞ্চয়ন এবং প্রবৃদ্ধি, অপরদিকে শোষণ এবং বিচ্ছিন্নতা।

পুঁজিবাদের পতন

মার্কস্ বিশ্বাস করতেন যে পুঁজিবাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, এবং সেটা প্রমাণ করার জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজের 'গতির সূত্র' নিয়ে এক জটিল বিশ্লেষণ গড়ে তোলেন। একদিক দিয়ে দেখলে, এই যুক্তির একটি নৈতিক ভিত্তি আছে। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অবিচারের ফলে যে অর্থনৈতিক আর সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা বজায় রাখা চলে না। অপর দিক দিয়ে দেখা যায়, যুক্তিটা সমাজ বৈজ্ঞানিকঃ ক্ষয়িষ্ণু সংখ্যক ক্রমাগত অধিক পরিমাণ সম্পদশালী পুঁজিপতি এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ক্রমাগত অধিক দরিদ্র হচ্ছে এমন দুঃখভোগী শ্রমিকের দল, এদের মধ্যে এক শ্রেণীর সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে যুক্তিটা অর্থনৈতিক। ব্যক্তিগত মালিকানায় পুঁজি সঞ্চয়ের ফলে প্রাচুর্যের সৃষ্টি হয়, এরই ফলে আসে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক পতন। প্রত্যেক স্তরে 'সংঘাতের' ধারণার উপর জোর দেয়া হয়েছে। আদর্শ আর বাস্তবের সংঘাতে, পুঁজি আর শ্রমিকের মধ্যে, প্রবৃদ্ধি আর মন্দার সংঘাত। সংঘাত থেকেই আসে পরিবর্তন, এবং প্রধানতঃ এই কারণেই, মার্কসের মতে পুঁজিবাদের বদলে আসবে আর এক ধরনের সমাজ, যেখানে সংঘাতের বদলে আসবে নৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক সমন্বয়।সংঘাতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আসাটাই হচ্ছে 'অস্তি-নাস্তির পদ্ধতি' (dialectical process) যার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের স্থানে আসবে সমাজতন্ত্র। মার্কস্ অনুভব করতেন যে সমাজের পুঁজিমালিক আর শ্রমিক হিসাবে ভাগ হয়ে যাওয়ার একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে। এদের মধ্যে সম্পর্কটা শোষণের, যেখানে উৎপাদন উপকরণের

www.pathagar.com

মালিকদের ক্ষমতাই বেশী। তিনি যুক্তি দেখালেন যে সংঘাত এই পরিস্থিতিতে জন্মগত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের গোটা কাঠামোটাই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে না যাবে, ততক্ষণ এই সংঘাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধিই পাবে।

শ্রমিককে শোষণ করাটা হচ্ছে শুরু। এ থেকে ক্রয় ক্ষমতার অভাব, 'বাড়তি মূল্য' এবং ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে হয় পুঁজি সঞ্চার। এখানে অবশ্য পুঁজিবাদের ব্যবস্থায় একটা গড়মিল দেখা যায়। অর্থনীতিতে যখন প্রাচুর্য দেখা দেয়, তখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মালিকদের জন্য 'বাড়তি মূল্য' অর্জন করে, আর তারা তখন সেটা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আবার বিনিয়োগ করে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বাজারে ক্রয় ক্ষমতা কমে গিয়েছে, এর কারণ আংশিকভাবে এই যে শ্রমিকদের তো তাদের শ্রমের পুরো মূল্যটা দেওয়া হয়নি, আর আংশিকভাবে এও কারণ যে পুঁজি বিনিয়োগ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেয়। কিছু দিনের মধ্যেই বাজারে অবিক্রীত সামগ্রীর প্রাচুর্য দেখা যাবে। তখন উৎপাদন হ্রাস করা হবে আর জিনিসের দাম কমে যাবে। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, মুনাফা হ্রাস পাবে, এবং পুঁজির সঞ্চয় ব্যাহত হবে। ধনতন্ত্রের এই 'সংকট' চলতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাজারের বাড়তি জিনিস বিক্রি হয়ে যায়, দাম বাড়তে থাকে, মুনাফা বৃদ্ধি পায়, এবং পুঁজির সঞ্চয় আবার শুরু হয়, এবং বাজারে পুনরায় প্রাচুর্য দেখা দেয়ার আগে পর্যন্ত তা চলতেই থাকবে। মার্কস্ যুক্তি দেখান যে এই প্রক্রিয়াটা বারে বারে প্রাচুর্য আর মন্দার চক্র সৃষ্টি করবে, আর এ হচ্ছে পুঁজিবাদের একটা জন্মগত দুর্বলতা।

মার্কস্ আরো বলেছিলেন যে ধনতন্ত্র যত অগ্রসর হবে, ঐ সংকট ততই তীব্রতর, দীর্ঘ স্থায়ী আর গভীরতর হতে থাকবে। এক সংকট থেকে আর এক সংকটে পৌঁছানোর পথে মোট পুঁজি আর অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এবং শ্রমের তুলনায় পুঁজির অনুপাত বেড়ে যাবে। এই সব পরিবর্তনের ফলে বাজারে অতি-সরবরাহের (glut) পরিমাণ প্রতি দফায় আগের চেয়ে বেশী হবে, বিক্রির জন্য দীর্ঘতর সময় প্রয়োজন হবে, এবং ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উৎপাদন হ্রাসের প্রয়োজন দেখা দেবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, প্রথমতঃ এই অতি সরবরাহটা ঘটবেই বা কেন? সমৃদ্ধির উর্ধ্বগতির কারণে কি কর্ম নিয়োগ, মজুরী আর ক্রয়-ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে না? মার্কস্-এর উত্তর এই যে এমন কি সমৃদ্ধির সময়েও বেকারদের 'রিজার্ভ আর্মি'তে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, কারণ ক্রমাগত নতুন ধরনের মেশিন শ্রমিকের কাজ নিয়ে নিতে থাকে। পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা শ্রমিকের বিকল্প

www.pathagar.com

হিসাবে পুঁজি ব্যবহার হয়। এইটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়, যার দ্বারা পুঁজি মালিক তার 'বাড়তি মূল্য' সংগ্রহের হার বৃদ্ধি করতে পারে। সুতরাং সমৃদ্ধির সময়ে পুজির সঞ্চয় কারিগরি বেকার সমস্যার (technological unemployment) সৃষ্টি করে এবং মজুরী আর ক্রয়-ক্ষমতাকে নিম্নমুখী করে, যেমনটা মন্দার সময়েও ঘটে, দ্রব্যের অতি সরবরাহের ফলে। উভয় ক্ষেত্রেই ফল হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর কর্মনিয়োগ হ্রাস।

এটাও আবার মাত্র আধখানা ছবি। পুঁজি মালিক শ্রেণীর মধ্যেও পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমতঃ ব্যবসায়ীর মোট বিনিয়োগের মধ্যে যখন যন্ত্রপাতির খাতে বিনিয়োগের অনুপাতটা বাড়তে থাকে, তখন তার মুনাফার হারটাও কমতে থাকে। (মার্কসের এটাই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যখন তিনি 'ক্যাপিটালের' প্রথম খণ্ড লেখেন। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের জন্য তিনি যে সব টোকা (notes) রেখে গিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যে মুনাফার হার কমবেই, এ বিষয়ে তখন আর তিনি ততটা নিঃসন্দেহ ছিলেন না] দ্বিতীয়তঃ ধনতন্ত্রের সৃষ্টি ব্যবসায়িক-চক্র (business cycles) বড় পুঁজিপতিদের দ্বারা ছোটদের গ্রাস করার সুযোগ এনে দেয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ বেশী থাকে, তারা বেঁচে যায় এবং কালে কালে শিল্পের মালিকানা ক্রমশঃ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে চলে যেতে থাকে, ফলে শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েকজন ধনকুবের সবগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে। এই টিকে থাকা পুঁজিমালিক শ্রেণী ক্রমশঃ ধনশালী হতে থাকে, আর সেই তুলনায় দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর (proletariate) দুর্দশা ততই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যত ছোট ব্যবসায়ীর দল, অকৃতকার্য হয়ে তাদের দলে এসে ভিড় জমায়। প্রকৌশলিক পরিবর্তনের কারণে উৎপাদনের প্রত্যেকটা যৌগিক কাজ যত ছোট ছোট অংশে পৃথক করা হয়, ততই দক্ষ কাজ (skilled jobs) আধা দক্ষ কাজে রূপান্তরিত হয়, শ্রমিক শ্রেণী ততই অধিক অধঃপাতে যেতে থাকে। শেষে বিপ্লব সংগঠিত হয়, বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠের এই গণ-বিদ্রোহ হচ্ছে ধনী কতিপয়ের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে, আর তাদের নতুন সমাজ গঠনের কাজে অগ্রসর হয়।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ বিকাশের মার্কসীয় তত্ত্বের পরিকাল্পনিক নক্সা

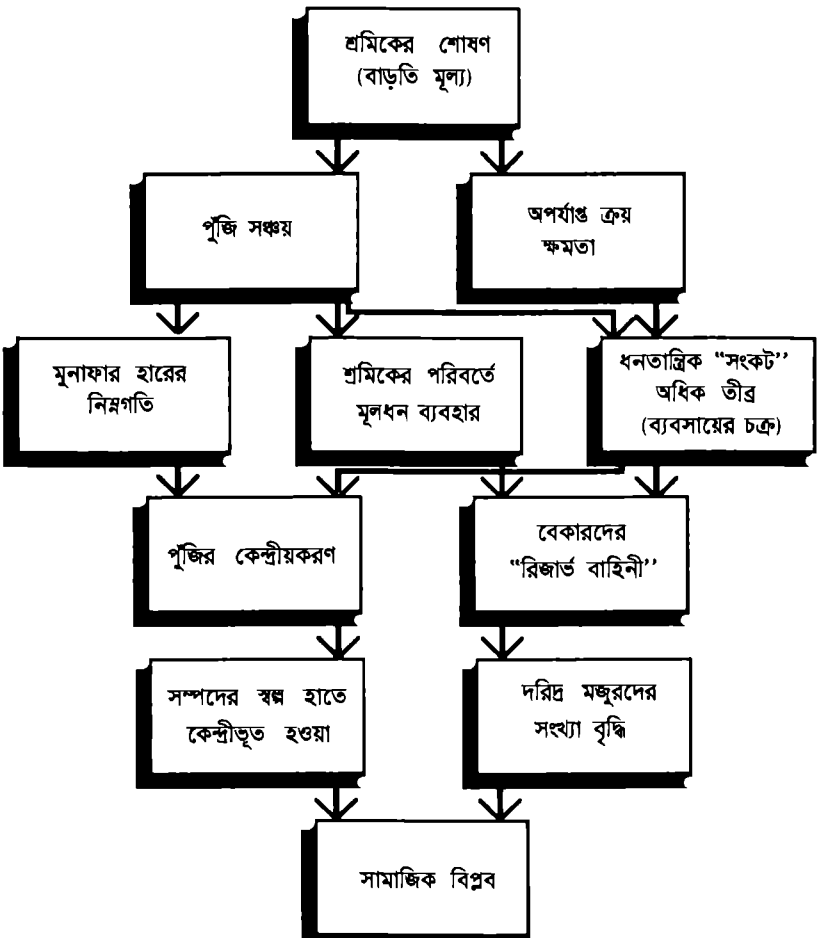

পুঁজিবাদী উন্নয়ন পদ্ধতি

"ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক শোষণের সূত্র থেকেই পুঁজির সঞ্চয় হয়,যার দ্বারা শ্রমিকের বিকল্প হিসাবে পুঁজি ব্যবহার করে 'বাড়তি লাভ' বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। কাজ কমে যাওয়ায়, বাড়তি উৎপাদন এবং অপর্যাপ্ত ক্রয়-ক্ষমতা সাথে করে আনে ব্যবসার চক্র, আর এই 'ব্যবসার চক্রে'র (business cycles) তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পায়, যত অর্থনীতি পরিণতির দিকে

www.pathagar.com

অগ্রসর হয়। এই দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলোর (পুঁজি সঞ্চয়, পুঁজির দ্বারা শ্রমের প্রতিস্থাপন, হ্রাসমান মুনাফার হার), সাথে ক্রমশঃ অধিক তীব্র অর্থনৈতিক সংকট এনে দেয়, (১) ক্রমশঃ ধনী হয়ে যাচ্ছে এমন একটি পুঁজিমালিক শ্রেণী, যাদের মধ্যে সম্পদের মালিকানা ক্রমশঃ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে; এবং (২) একটি ক্রমাগত অধিক দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণী, যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের শ্রেণী স্বার্থ আর পদ্ধতিগত শোষণ সম্পর্কে ক্রমশঃ অধিক সচেতন হতে থাকে।"

মার্কস্ ভালই জানতেন যে, এই অর্থনৈতিক প্রবণতাকে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা সংশোধন করা সম্ভব। পুঁজি আর শ্রমের সংঘাত থেকে উদ্ভূত শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর পক্ষে শ্রমিকের শোষণ লাঘব করাও সম্ভব, কিন্তু মার্কসের ভয় ছিল যে সুবিধাবাদী ইউনিয়ন নেতারা হয়তো শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে এসে শ্রেণী সমন্বয়ের পক্ষেই যাবে। যদিও সরকারে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক স্বার্থেরই প্রাধান্য থাকে, তবুও তারা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সমাজকল্যাণমূলক আইন করতে পারে। আর সংসদীয় গণতন্ত্র দিয়েও জনগণের অংশ গ্রহণের চেহারা সৃষ্টি করা যায়, যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থনৈতিক ভিত্তিটা ক্রমশঃই কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে। এসব সত্ত্বেও মার্কস-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক প্রবণতা আর সংঘাতই প্রাধান্য লাভ করবে এবং শেষে এমন এক বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি করবে যাতে ধনতন্ত্র মোটামুটি শীঘ্রই সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে।

মার্কসীয় কল্পনা (THE MARXIST VISION)

পুঁজিবাদী উন্নয়ন সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণের ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে মনুষ্য সমাজের বিকাশে দুটো বৃহৎ শক্তি বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে। প্রথমটি হলো প্রকৃতির বিপক্ষে মানুষের সংগ্রাম-জীবিকা আর আরামের আশায়। এই সংগ্রামের একটি ফল হলো প্রকৌশল আর উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ, এবং পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে এ থেকেই এসেছে প্রাচুর্যের পথে বড় এক পদক্ষেপ। কারখানার উৎপাদন আর যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী করেছে, এবং ধনতন্ত্রের প্রতিযোগিতামূলক প্রকৃতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের অর্জিত মুনাফা বিরামহীনভাবে নতুন আর উন্নত উৎপাদনের কৌশলপূর্ণ বিনিয়োগ করতে বাধ্য করেছে। এই পদ্ধতিটি যে অবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি, এবং সময় সময় যে ব্যবস্থাটা অচল হয়ে পড়েছে, সংকট সৃষ্টি হয়েছে, পুঁজিবাদের বিফলতার কারণটা তাতেই নিহিত।

www.pathagar.com

মার্কসের মতে, টিকে থাকার সংগ্রামই সৃষ্টি করেছে অর্থনৈতিক আর সামাজিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তিটাঃ মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম। মানুষ এক ধরনের উৎপাদনমূলক সম্পদ আর তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকাটা এমন এক উপায় যার দ্বারা কিছু লোক তাদের সম্পদ আর কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারে। সুতরাং মার্কস যুক্তি দেখালেন যে টিকে থাকার সংগ্রাম (struggle for existence) অনিবার্যভাবেই কারো দ্বারা অপরদের শোষণ ঘটিয়ে দেবে। আদি সমাজে এই নীতির উদাহরণ ছিল পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার (patriarchal family), প্রাচীন কালের দাস ভিত্তিক অর্থনীতি এবং সামন্ততন্ত্র। শেষে উল্লিখিত ব্যবস্থাটা আবার পরিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিবাদের মজুরী ব্যবস্থা। সমাজের এই প্রত্যেকটি ক্রমোন্নত স্তরই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের এক-একটি বিজয় নিদের্শক, যার থেকে এসেছে ক্রমবর্ধমান মানবিক স্বাধীনতা (সকলের জন্য না হলেও, অন্ততঃ কারো কারো জন্য), আর এগুলোর প্রত্যেকটিই সম্ভব হয়েছিল উন্নত প্রকৌশলের এবং উন্নত উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের ফলে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে, তাঁর মতে, অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রাচুর্য অর্জন এবং সকলের জন্যই যথেষ্ট উৎপাদন করাটা সম্ভব। আর মানব ইতিহাসের সেই পর্যায়ে সকল মানুষই হবে সম্পূর্ণ মুক্ত, কি অর্থনীতি, কি রাজনীতির দৃষ্টিতে। পুঁজিবাদের পক্ষে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়, কারণ ঐ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রকৌশলের পূর্ণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, এতে কিছুদিন পর পরই পুঁজি সঞ্চয় থেমে যায়, এবং সামাজিক বিপ্লবের অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পক্ষে ঐ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব, কারণ এই ব্যবস্থায় শোষণ পরিহার করা হয়, এবং যেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধাগুলো এই ব্যবস্থায় নির্মূল করা হয়।

মার্কস এই উপসংহারে পৌঁছেন যে, একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থাতেই অর্থনৈতিক প্রাচুর্য সম্ভব। সেই অর্থনৈতিক প্রাচুর্য যেদিন আসবে, সেদিন আর সামাজিক বা অর্থনৈতিক পার্থক্যের প্রয়োজন থাকবে না, আর এর অনেক আগেই শোষণ খতম হয়ে যাবে। আয়ের বন্টন তখন যে নীতির ভিত্তিতে হবে, তা হলোঃ "প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী পাওয়া থেকে, প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পেতে থাকবে"। এই পর্যায়ে মানব জাতির সেই বৃহৎ দুই সংগ্রামঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে জনগণ এবং অন্য মানুষদের বিরুদ্ধে জনগণ, ও দুটিরও হবে শেষ। এই হলো মার্কস্‌বাদের স্পষ্টরূপে বর্ণিত (positive) দিক যার অন্তর্ভুক্ত প্রাচুর্য, সাম্য, আর স্বাধীনতা সম্পন্ন এক মহান বিশ্বের কল্পনা।

www.pathagar.com

মার্কস্ কি ঠিক বলেছেন ?

বিংশ শতাব্দীর সব চেয়ে বেফায়দা বিতর্কগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, মার্কসের পুঁজিবাদের বিশ্লেষণের যথার্থতা বিবেচনা। ভিন্ন মতাবলম্বীরা মার্কসের ভুলের প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরেন আধুনিক জাতিগুলোর ক্রমবর্ধমান জীবনধারণের মান। শ্রমিকদের ক্রমশ অধিক দুর্দশা পোহাতে হয়নি, এবং সকল শিল্পোন্নত দেশেই শ্রমিক ইউনিয়নগুলো অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছে। তা ছাড়া, বর্ধিত সম্পদ, আয় আর অর্থনৈতিক লাভ যা সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যেই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে, শ্রমিক শ্রেণীও তার ভাগ পেয়েছে।

মার্কস্‌বাদীরা উত্তর দেয় যে চরম শোষণটা আভ্যন্তরীণ শ্রমিক শ্রেণীর উপর থেকে সরিয়ে এখন তা চাপানো হয়েছে উপনিবেশ আর কম উন্নত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর উপর। এখন বৃহৎ ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুরুব্বিয়ানার অধীন দেশগুলোই শোষণের সবচেয়ে বড় বোঝাটা বহন করছে, যার ফলে পুঁজিবাদীরা নিজেদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে কিছুটা আরামে রেখেছে আর তাদের জীবন ধারণের মানও কিছুটা বাড়তে দিয়েছে। এ ছাড়া জাতিতে জাতিতে এখনো যে দারিদ্র্য আর প্রাচুর্যের বিশাল পার্থক্য চলতে দেওয়া হচ্ছে, তারা সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বড় ব্যবসায়ী আর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অভ্যুদয়, রাজনীতির উপর ব্যবসায়ী মহলের বিপুল প্রভাব এবং ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের বেকারসমস্যা আর ব্যবসায়ের মন্দা প্রতিরোধ করার অক্ষমতাকে, মার্কসের বিশ্লেষণ যে আদতেই ঠিক ছিল, এসব তারই আলামত বলে তারা মনে করে। শ্রমিক শ্রেণীকে যেভাবে খাতির করা হয়েছে, সমাজকল্যাণমূলক আইন, ইউনিয়ন সংগঠন, উঁচু জীবন ধারনের মান— এসব সত্ত্বেও, মার্কসবাদীদের মতে ধনতন্ত্রের মৌলিক দোষগুলো রয়েই গিয়েছে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধা পাচ্ছে আর প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজের বিকাশ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে।

দুর্দশার বৃদ্ধি এবং দুই বিপরীত মেরুতে কেন্দ্রীভূত হবার বিষয়ে মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী যদি ভুল হতো, তবুও মার্কসের যুক্তিতে যথেষ্ট ভাবনার বিষয় ছিল। যে সমাজের একটা বড় অংশই তার সুবিধাগুলো ভোগ করা থেকে বঞ্চিত, তেমন সমাজ বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না– যেমন অবস্থা বাস্তবেই ছিল বহু শ্রমিক আর তাদের পরিবারের, মার্কসের আমলে আর উনবিংশ শতাব্দীতে

www.pathagar.com

ইউরোপের সেই অশান্তি আর গোলযোগের সম্ভাবনাপূর্ণ দশকগুলোতে। অনেক দিক দিয়েই মার্কসের বিশ্লেষণ ছিল বাস্তব অবস্থারই একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

১৮৭০ সনের পরবর্তী বছরগুলোতে অবশ্য ইউরোপের দৃশ্যপটে অনেক বড় বড় পরিবর্তন আসে। ভোট দেবার অধিকার, রাজনৈতিক গণতন্ত্র– এসব ক্রমশঃ শ্রমিকদের দিকেও প্রসারিত করা হয়। শিল্পায়িত অবস্থার সব চেয়ে বড় কুফলগুলোর বিরুদ্ধে রক্ষা–ব্যবস্থা ছিল জাতীয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক আইনসমূহ। শ্রমিক ইউনিয়ন সমূহের উদ্ভব, এবং ইউরোপে শ্রমিকদের রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় শ্রমিকদের নতুন মর্যাদা দিয়েছে এবং শিল্প–শ্রমিকরা নিজেদের জন্য যে একটা স্থান করে নিচ্ছে, এ থেকে তাই বোঝা যায়। নিজেদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট অনেক ইউরোপবাসী দেশান্তর গমনের সেই 'নিরাপত্তা–কপাটক' উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অথবা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নতুন এবং স্বাধীন জীবন শুরু করতে পেরেছিল। আর সাম্রাজ্যবাদও প্রচুর অর্থনৈতিক সুযোগ এনে দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে বলার মত যদিও অনেক কথাই আছে।

ইউরোপের অর্থনীতিতে যদি প্রবৃদ্ধি না থাকতো, তাহলে অবশ্যই ঐসব ঘটনার পরেও সামাজিক উত্তেজনার খুব একটা লাঘব হতো না। শিল্প বিস্তার বুদ্ধিমান উচ্চাভিলাষী মানুষদের জন্য অনেক দরজা খুলে দিয়েছিল, রবার্ট ওয়েন হলেন তারই একটা উদাহরণ। যদিও এটা সর্বদাই সত্য যে কেউ যদি প্রায় চূড়ার কাছে থেকে উপরে উঠতে শুরু করে, তবে সে অনেক সহজে অপরদের চেয়ে অগ্রগামী থাকবে, তবু এটাও সত্য যে তুলনামূলকভাবে স্থবির অর্থনীতির চেয়ে বর্ধিষ্ণু পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে সুযোগ থাকে অনেক বেশী। দেশের ভিতরের এবং বিদেশের অবিরাম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইউরোপকে শিল্পায়নের ফলে সৃষ্টি চাপগুলোর মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের অবকাশ দেয়, যার মাধ্যমে শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় আর বাজার অর্থনীতির অত্যন্ত নির্দয় প্রতিফলগুলো থেকে তাদের রক্ষা করা সম্ভব হয়। মার্কস্‌বাদ থেকে এই নীতি কথাটাই বেরিয়ে আসে যে, কোন সমাজকে যদি সুস্থ রাখতে হয়, তবে তাদের অর্থনীতিতে সকলের জন্যই মর্যাদা আর পর্যাপ্ত সুযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং একটি গণতান্ত্রিক, সাম্যভিত্তিক এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মার্কস্‌বাদের ভবিষ্যৎবাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমাগত কেন্দ্রীভূতে হবার বিষয়ে দেওয়া ভবিষ্যৎবাণীটা অবশ্য ঘটনাবলীর দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যদিও কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে এর কারণ মার্কস্ যা বলেছিলেন তা

www.pathagar.com

থেকে ভিন্ন। আর রাশিয়া এবং চীনে কমিউনিস্ট শাসনের অভ্যুদয়, এবং বহু অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র বিস্তার লাভ করায়, এখন ধনতন্ত্রকে আত্মরক্ষার অবস্থায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐসব অ-পুঁজিবাদী দেশে অগণতান্ত্রিক (authoritarian) রাজনৈতিক শাসন-পদ্ধতি, নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সামাজিক বৈষম্য এবং শোষণের নতুন নতুন রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। ধনতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসের উষ্মার অন্তর্নিহিত যে একটা মানবিক লক্ষ্য ছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অধনতান্ত্রিক সরকারগুলো সেই লক্ষ্য অর্জনের তেমন একটা কাছাকাছিও এগুতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এই অবস্থা বাদবাকী উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বামপন্থীদের মধ্যে এক সংকটের সৃষ্টি করেছে, আর তারা মার্কসীয় তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন করে জানবার চেষ্টা করছে যে ভুলটা কোথায় হলো।

তবুও মার্কসবাদ আজকের বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিরাজ করছে। মানবতার দুরবস্থার বিরুদ্ধে এতে প্রকাশ পেয়েছে এক নৈতিক প্রতিবাদ। অবস্থা পরিবর্তিত হলে কি হতে পারে এতে রয়েছে তার এক জমকালো কল্পনা। এতে আধুনিক পুঁজিবাদকে দেখা হয়েছে একটা গতিশীল ব্যবস্থা হিসেবে যার প্রবৃদ্ধির পদ্ধতিই পরিণতিতে গোটা ব্যবস্থাকে এক সংকট অবস্থায় নিয়ে যাবে, যেখানে এর পক্ষে আর বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কে মার্কসবাদের শ্রেণী রঞ্জিত মত এমন একটি কাঠামো দিয়েছে, যার মধ্যে আধুনিক জগতে যা ঘটছে তার অনেকটাই বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও একটা ভিত্তি দেয়া হয়েছে, আর আছে এমন এক মতাদর্শ যাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন মতাবলম্বীরা একত্রিত হতে পারে। কোন একটি বিশেষ মানবিক সমস্যা সম্পর্কে তাদের বিশ্লেষণ ঠিক বা ভুল কি না, তার চেয়ে মার্কসবাদের উপরোল্লিখিত দিকগুলো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যেখানেই অত্যাচারিত বোধ করবে, সেখানেই মার্কস্‌বাদ তাদের ক্ষোভ আর আশার প্রকাশস্থল হতে পারে, আর তুলনামূলকভাবে একটা ভাল পথের সন্ধানও দেয়। মার্কসবাদের এই বৈশিষ্ট্যই আধুনিক জগতে একটা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

www.pathagar.com

৬

ব্যক্তিতাবাদের দর্শন

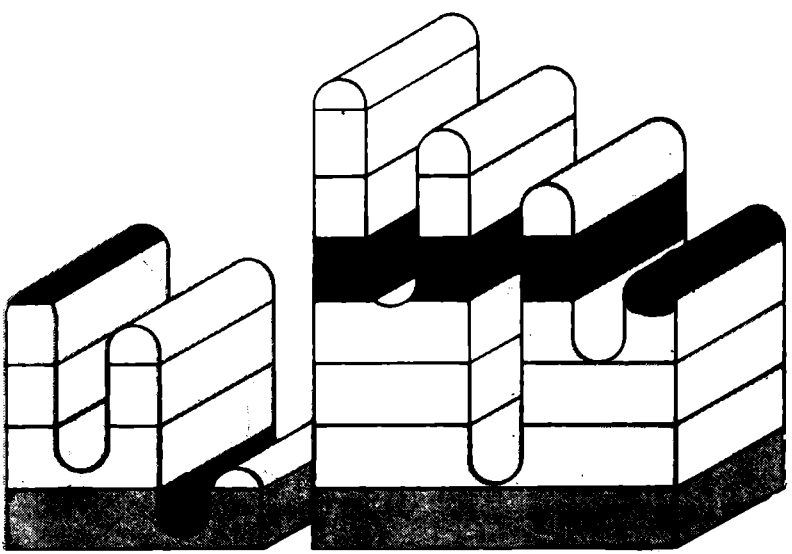

সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় এবং তার সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবী তৎকালীন প্রচলিত তন্ত্রের (order) সমর্থকদের নিজেদের ঘর সামলাতে বাধ্য করে। তাত্ত্বিক দিক থেকে একটি যুক্তি খণ্ডনের প্রয়োজনও ছিল, কারণ পুঁজিবাদের মার্কসীয় সমালোচনাটা আসলে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির অনুমানগুলোর ভিত্তিতেই রচিত, যেমন, মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (Labour Theory of Value) এবং পুঁজি সঞ্চয়ের তত্ত্ব। তিনি ঐ প্রভাবশালী মতাদর্শকে এমন অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলেন যা সেই ব্যবস্থার আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হয়েছিল।

www.pathagar.com

মার্কস্ এবং সমাজতন্ত্রের একটি প্রত্যুত্তর ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিতাবাদের দর্শন (Philosophy of Individualism) ব্যবসায়িক সভ্যতার চিন্তাধারা হিসেবে যার বিকাশ ঘটে ১৮৫০ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। মার্কস্‌বাদ যেমন পরাজিত এবং নিঃস্ব মানুষের মোহমুক্তিকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনই যারা সাফল্য লাভ করেছে, তাদের পক্ষ থেকে তত্ত্ব হিসেবে নব শক্তিতে পুনঃপ্রবর্তিত হলো 'সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি' (laissez faire)। নয়া ব্যক্তিতাবাদের সমর্থকদের কাউকেই সত্যিকারের অর্থনীতিবিদ বলা চলে না– এদের মধ্যে অধিক বিখ্যাতরা ছিলেন দার্শনিক, আইনবিদ আর ব্যবসায়ী– কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক চিন্তা তখনকার দুনিয়ায় যে প্রভাব বিস্তার করে তা শত শত কেতাবি পণ্ডিতের পক্ষেও সম্ভব হতো না।

মার্কসের বিপরীতে দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হলো অর্থনীতি শাস্ত্রেরই পুনর্গঠন, যা অর্জিত হয় এর দুর্বল অংশগুলো বাদ দিয়ে আর বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা জোরদার করে, মৌলিক ধারণাগুলোকে সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করে, সমসাময়িক জগতের সাথে একে খাপ খাইয়ে নিয়ে। সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব আর সমালোচনার চাপে পড়ে অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান হিসেবে অনেক শক্তিশালী হতে পেরেছে। কিন্তু এই–পুনর্গঠিত অর্থনীতির যখন বিকাশ ঘটে, সে সময়ের প্রচলিত ধারা এবং মতামতের পরিবেশ সৃষ্টিতে তখনকার দিনে অপর অনেক কর্মদক্ষ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অবদান ছিল।

দর্শন

হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০–১৯০৩) নামক একজন ইংরেজ দার্শনিক এবং এক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম গ্রাহাম সুম্‌নার্ (১৮৪০–১৯১০) ব্যক্তিতাবাদ দর্শনের সমধিক বিকাশ সাধন করেন। এই দুই জন যে ভাবতত্ত্ব (ideology) রচনা করেন, সেটাকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠে পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর আইন–কানুন আর লোকাচার। স্পেন্সার ছিলেন ডারউইনের পূর্বসূরী একজন অভিব্যক্তিবাদী (evolutionist)। ১৮৫০ সালেই তিনি তাঁর 'সোস্যাল স্ট্যাটিকস্' নামক গ্রন্থে বলেন যে সকল সামাজিক ব্যবস্থাই এমন একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে যার ফলে ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। তাই প্রাকৃতিক বিকাশের পদ্ধতিটা, তাঁর যুক্তি মতে, ব্যক্তিদের

www.pathagar.com

মধ্যে প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত হয় আর এতে সরকারের তরফ থেকে কোন রকম বাধা দিলে ওটার পূর্ণ লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হবে। স্পেন্সারের প্রাথমিক ঐ বিবৃতির পর অন্যান্য রচনা এবং 'সিনথেটিক ফিলসফি' নামে দশ খণ্ডের এক গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে, অভিব্যক্তিবাদী প্রগতি সকল ব্যাপারেই ঘটে থাকে, জীবজগতে, মানুষের মনে, সমাজে আর নীতিশাস্ত্রে। যে ক্ষেত্রে ডারউইন 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের' দ্বারা বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যা করেন সেই অর্থেই উন্নতির উৎস হিসেবে 'সর্বোত্তমই টিকে থাকতে পারে' (survival of the fittest) এই বাকধারার প্রবর্তন করেন স্পেন্সার।

"যে কোন প্রাণী বা সমাজদেহ বাহ্যিক প্রভাবের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে পরিবর্তিত হয়, আর এই প্রক্রিয়ায় সে প্রাণী উপকৃতই হয়। যেসব জীব তার পারিপার্শ্বিকতার জন্য সব চেয়ে মানানসই, বা যারা নিজেদেরকে পরিবর্তিত করে পারিপার্শ্বিকের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তারাই টিকে থাকবে। যেগুলো সবচেয়ে কম মানানসই, তারা মরে যাবে, টিকে থাকবে শুধু সব চেয়ে মজবুত আর 'শ্রেষ্ঠ'।

এই ভাবেই অগ্রগতি হয়ে থাকে আর দুর্বলতম ব্যক্তি এবং সবচেয়ে কম দরকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাতিল হতে থাকে। যেহেতু ব্যক্তিরাই হচ্ছে সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর দল, পরিবর্তনের মাধ্যমে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিকাশ লাভ করে, সেটা ব্যক্তির প্রয়োজনের সাথেই খাপ খাইয়ে গড়ে উঠে। অগ্রগতির অর্থ এই যে, তাতে ব্যক্তির কল্যাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

এই সব ধারণা থেকেই এলো আদর্শ সমাজের বর্ণনা, যাতে সমাজকে কল্পনা করা হলো মানুষের ব্যক্তিগত এবং প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের পূর্ণ প্রয়োগের ফলে পারিপার্শ্বিকতার সাথে তার একটা স্থির এবং সমতার ব্যবস্থা হিসাবে। সরকার হলো একটা প্রয়োজনীয় জঞ্জাল, যাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে শুধু মানুষের জীবন আর ধনসম্পদ রক্ষা এবং তাদের ব্যক্তিগত চুক্তির বাস্তবায়ন করার জন্য – আর কোন কাজই তাকে দেয়া চলবে না। সমাজ যেহেতু আদি যুগের হিংস্রতা আর সামরিক নিয়ন্ত্রণের অবস্থা থেকে উচ্চতর পর্যায়ের শিল্পায়ন আর শান্তির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হবে, তাই এমন কি সরকারের ঐ রক্ষামূলক ভূমিকাও ক্রমশঃ হ্রাস করা যেতে পারবে, আর এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে এক সময়ে স্বর্গরাষ্ট্রের দার্শনিক নৈরাজ্য অবস্থায় সরকার ক্ষয় হয়ে শেষও হয়ে যেতে পারে। অন্তবর্তীকালে অবশ্য শিল্পের উপর কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ রাখাটা উচিত হবে না। রাষ্ট্রের কোন গীর্জা, সংগঠিত কোন উপনিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা, দরিদ্রের

www.pathagar.com

সাহায্য দেয়া, সামাজিক আইন প্রণয়ন, সরকারী টাকশাল, সরকারী মালিকানায় পোস্ট অফিস, সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টা, এসব কোন কিছুই থাকা উচিত হবে না। ব্যক্তিকে অবাধ কর্মপ্রচেষ্টার অনুমতি দিতে হবে, আর প্রাকৃতিক নির্বাচন–পদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, এমন কোন কিছুই করতে দেয়া উচিত হবে না, এমন কি জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাও করা চলবে না, কারণ তার ফলে আবার দুর্বলদের চিরকাল বেঁচে থাকতে দেয়া হতে পারে (যা করা উচিত হবে না)।

স্পেন্সারের দর্শন তাঁর নিজের দেশের চেয়েও বরং যুক্তরাষ্ট্রে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকায় তাঁর সবচেয়ে বড় শিষ্য ছিলেন উইলিয়াম গ্রাহাম সুম্‌নার নামক একজন গির্জার বিশপ এবং ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ, যিনি সে সময়ের একজন শীর্ষস্থানীয় সমাজ বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল সমাজবিজ্ঞানের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ ফোক্‌ওয়েজ (১৯০৭) যেখানে সামাজিক আচার–আচরণ (mores) সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়– সমাজের প্রতিষ্ঠান আর চলিত প্রথাগুলো সর্বক্ষণ ব্যক্তির আর সমাজের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে পরিবর্তিত হয়ে বিকাশ লাভ করছে। ঐসব প্রতিষ্ঠান যদি কল্যাণ এবং বেঁচে থাকায় সাহায্য না করে, তবে ক্রমশঃ অন্য অধিক কার্যকরী উপায়ের দ্বারা ওগুলোর প্রতিস্থাপন হয়ে যাবে। যেসব সামাজিক বিধান অতীতে প্রয়োজনীয় বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, সেগুলোর বদলে অন্য ভাল কোন উপায় বের হবার পরই শুধু তা বদল করা বা তুলে দেওয়া যায়, নচেৎ সহজে তা সম্ভব হবে না। সুতরাং সুমনারের মতে সামাজিক ব্যবস্থাটা একাধারে সংরক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল, পরিবর্তন বিরোধী আবার পরিবর্তনশীল। *

সামাজিক ব্যবস্থার ভিতরেও সুমনারের মতে ব্যক্তিরা সর্বক্ষণ কেউ উঠছে, কেউ নামছে। যে লোকের যোগ্যতা, বুদ্ধি আর কর্মোদ্যম আছে সে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে খ্যাতি লাভ করবে। যে আলসে, মূর্খ এবং দুর্বল, সে ক্রমশঃ নজরের বাইরে চলে যাবে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অভ্যুদয়ে অগ্রগতি আসে, কারণ সমাজে তারাই নতুন আবিষ্কার এনে দেয়, চিন্তা করে, আর নতুন ধ্যান–ধারণার জন্ম দেয়। এদের মধ্যে আবার প্রতিযোগিতার ফলেই সমাজ অধিক কর্মপ্রেরণা পায় আর উন্নত সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠে। সামাজিক শ্রেণীগুলোর একের প্রতি অপরের কর্তব্য 'যে মানুষকে আমরা ভুলে গিয়েছি' এবং সম্পদের স্বল্প হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়াঃ তার অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা, এই ধরনের কতকগুলো লম্বা রচনার মাধ্যমে সুমনার তাঁর সমাজ বিষয়ক তত্ত্ব তৎকালীন কর্মনীতিতে প্রয়োগ করেন। যে মানুষকে আমরা ভুলে গিয়েছি, সে কঠিন পরিশ্রম করে, উৎপাদন করে, ট্যাক্স দেয়, সঞ্চয় করে এবং

www.pathagar.com

বিনিয়োগ করে, আর এইভাবে সমাজকে কঠিন পরিশ্রম আর কর্মোদ্যমের সুফলগুলো এনে দেয়, যদিও সেই লোকটিই রক্ষণমূলক কর (protective tariffs) সরকারের সমাজসেবা আর শ্রমিক ইউনিয়নদের চাপানো উচ্চ ব্যয়ভারের বোঝাও বহন করে থাকে। সম্পদ স্বল্প হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে করা হলো, কারণ তা অপরের জন্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সম্পদ যদি অপব্যয় করা হয় বা অব্যবহৃত রাখা হয়, তবে তা কখনোই অমন কেন্দ্রীভূত হতে পারবে না। অর্থনৈতিক ঐ সেরা মানুষগুলো (economic elite) শীর্ষে পৌছতে পেরেছে, কারণ তারা অপরদের সাথে প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করেছে এবং এমন সব দ্রব্য আর সেবা প্রস্তুত করেছে, সমাজে যেগুলোর প্রয়োজন আর চাহিদা রয়েছে। সমাজে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর কারো কাছেই অপর কারো কিছু প্রাপ্য নেইঃ তাদের শুধু নিজেদের স্বার্থের দিকেই দেখতে হবে আর অপরেরাও তা থেকে আপনা-আপনিই লাভবান হবে।

এই ছিল সমাজ-ব্যবস্থায় অভিব্যক্তিবাদী দর্শনের প্রয়োগ। এতে সীমাহীন পরিমাণ ব্যক্তিতাবাদ সমর্থন করা হয়, এই কারণে যে, তাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক মংগল হবে। এতে প্রচুর সম্পদ থাকাটা সমর্থন করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে সম্পদের অস্তিত্ব আছে শুধু অপরের খেদমতের জন্য। এতে অপরদের প্রতি দায়িত্বহীন হওয়াটা সমর্থন করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে প্রতিযোগিতা তাকে ধ্বংস করেছে। তাকে আর সমাজের কোন কাজে লাগবে না বলে টিকে থাকার অযোগ্য মনে করা যেতে পারে। এই কঠোর দর্শনে সাফল্যকে সত্যের সাথে আর পরাজয়কে মিথ্যার সাথে, সম্পদকে জনগণের খেদমতের সাথে আর দারিদ্র্যকে অপদার্থতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছিল।

ব্যক্তিতাবাদ এবং আইন

ব্যক্তিতাবাদের দর্শন অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে সবচেয়ে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-১৮৬৫) উত্তর পূর্বের শিল্পপতিদের স্বার্থকে রাজনৈতিক প্রাধান্যে এনে দেয়, এবং সংঘাতের সময়ে এমন কতকগুলো আইন

---

* হাস্যকর ব্যাপার এই যে ফ্র্যাঙ্কলিন রুসভেল্ট সুমনারের ঐ কথা 'যে মানুষকে আমরা ভুলে গিয়েছি' (the forgotten man) সম্পূর্ণ উল্টো অর্থে, যারা দুঃখ-দূর্দশায় আছে তাদের সম্পর্কে ব্যবহার করে 'নিউ ডিল' এর সহকারী কল্যাণমূলক কর্মপন্থায় এরা উপকৃত হবে এই অজুহাতে ব্যবস্থা নেন, যা সুমনার জানলে আঁৎকে উঠতেন।

www.pathagar.com

পাশ হয়, যার ফলে একজন সমালোচকের ভাষায় এক 'বিরাট কাবাব বানানোর' (the great barbecue) পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। মোরেল্ ট্যারিফ্ (১৮৬১) বসানোর ফলে আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি পায় আর এর ফলে যুদ্ধের পর কর বৃদ্ধির জন্য আইন পাশের রাস্তা পরিষ্কার হলো। হোমস্টেড্ আইন (১৮৬২) চূড়ান্তভাবে পশ্চিমে ব্যাপক হারে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দিল। প্যাসিফিক রেলওয়ে আইনের (১৮৬২ এবং ১৮৬৪) দ্বারা আন্তমহাদেশীয় রেলরাস্তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকীর ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৪ সনে স্থানীয় নিয়োগকারীদের পক্ষে দেশান্তর আগমনকারীদের কর্মে নিয়োগের জন্য চুক্তি দিয়ে বিদেশ থেকে শ্রমিকদের আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। ন্যাশনাল ব্যাংক আইনে (১৮৬৩) মুদ্রা-ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হয় যাতে অর্থের সরবরাহ সীমাবদ্ধ এবং উত্তম অবস্থায় রাখা যায়। শেষে দাসপ্রথার অবসানের ফলে সারাদেশে একটা স্থায়ী আর মুক্ত শ্রমের বাজার সৃষ্টি হয়ে গেল। দক্ষিণের ভূমিস্বার্থের অধিকারীরা যুদ্ধে যখন পরাজিত হলো, তখন ঐ ব্যবসা-প্রধান সভ্যতায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যবসায়ীদের প্রাধান্যের সকল ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

লাগামহীন ব্যক্তিতাবাদের দর্শনকে দেশের মৌলিক শাসনতান্ত্রিক আইনে স্থান দেয়া হলো। এই অবস্থার জন্য যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি একজন, এখন প্রায় ভুলে-যাওয়া, যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, স্টিফেন. জে. ফিল্ড (১৮১৬-১৮৯৯)। ফিল্ডের পিতা ছিলেন একজন নামজাদা বক্তা, ধর্মযাজক এবং তাঁর দুই ভাইও ছিলেন অনুরূপ খ্যাতিমান। প্রথম, সাইরাস ফিল্ড একজন ব্যবসায়ী যিনি প্রথম ট্রান্স আটলান্টিক টেলিগ্রাফ তার স্থাপন করেন এবং দ্বিতীয়, ডেভিড ডাড্লী ফিল্ড, নিউইয়র্কের এক প্রখ্যাত উকিল, যিনি ১৮৬০ সনের লিগ্যাল কোড্স্ (Legal Codes) সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং পরে 'যুদ্ধের বদলে সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তি' বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, যা ছিল 'লীগ অব নেশান্স' এর অগ্রদূত।

যখন তাঁর বয়স তিরিশের কোঠায় পড়লো, তখন স্টিফেন ফিল্ড ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ড-রাস্ এ যোগদান করেন। তিনি বিচারক নির্বাচিত হন এবং ১৮৫০ সনে রাষ্ট্রীয় পরিষদেও নির্বাচিত হন। ১৮৫৭ সনে তিনি রাষ্ট্রীয় সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৯ সনে প্রধান বিচারপতি হন। ফিল্ড ছিলেন সেই উন্নয়নশীল পশ্চিমেরই সৃষ্টি, যেখানে ব্যক্তিতাবাদী এবং মুক্ত সামাজিক কাঠামোতে মানুষ নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে পারতো।

আব্রাহাম লিঙ্কন্ তাঁকে ১৮৬৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে নিযুক্তি দেন, যে পদে তিনি পরবর্তী ৩৪ বৎসর ধরে কাজ করেন এবং দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শাসনতান্ত্রিক আইনের বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিগণিত হন। ১৮৭৬ সনে তিনি

www.pathagar.com

বিখ্যাত 'ইলেক্টোরাল কমিশনের' সদস্য ছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট পদের জন্য রিপাব্লিকান রাদারফোর্ড বি. হেজ-এর পক্ষে রায় দেন, যদিও প্রতিপক্ষ ডেমোক্র্যাট স্যামুয়েল জে. টিলডেনের পক্ষে বৃহত্তর মোট ভোট ছিল। তাঁর সুপ্রীম কোর্টের কার্যকালের মধ্যে ফিল্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ছিল কর্পোরেশনগুলোর বিষয়ে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর প্রয়োগে, সম্পদের সংরক্ষণ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা প্রসংগে। যদিও প্রথমে তাঁর দল সংখ্যালঘু ছিল, কিন্তু ফিল্ড অচিরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান বক্তা হিসেবে এই মত দেন যে সংবিধান সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যক্তি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রক্ষার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

বিখ্যাত 'কশাইখানা মামলায়' ১৮৭৩ সনে ফিল্ড তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে ব্যক্ত করার সুযোগ পেলেন। লুজিয়ানা রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিউ অর্লিন্‌সে কশাইখানা পরিচালনের জন্য কিছু শর্ত দিয়ে মাত্র একটি কোম্পানীকে একচেটিয়া ব্যবসা হিসেবে তা পরিচালনের অধিকার দিয়ে এক আইন পাশ করে। কশাই সম্প্রদায় এবং জন্তু ব্যবসায়ীরা এর বিরুদ্ধে ইনজাংশন প্রার্থনা করে দাবী করে যে, এই আইন সংবিধানের পরিপন্থী। তাদের যুক্তির মধ্যে এ কথাও ছিল যে ঐ একচেটিয়া অধিকার দেয়ার ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হচ্ছে এবং এটা চতুর্দশ সংশোধনীর পরিপন্থী এবং তাদের সম্পত্তি থেকে, আইনের পদ্ধতি অনুসরণ না করেই তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং আইনের চোখে তাদের সংরক্ষণের সমান অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে। যাঁরা ঐ আইনের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা যুক্তি দেখালেন যে রাষ্ট্রের পুলিশী ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য এটা একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। শেষে মামলার আপীল সুপ্রীম কোর্টে গেল, যেখানে সংখ্যাগুরুর মত হল এই যে, রাষ্ট্র সঠিক ক্ষেত্রেই তার পুলিশী ক্ষমতা ব্যবহার করছে এবং এতে কোন নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয় নাই। কিন্তু ফিল্ড একটা শক্তিশালী মতপার্থক্য বিষয়ক মন্তব্য লেখেন। তিনি মনে করতেন যে কশাইখানা বা যে কোন আইনসম্মত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা করার অধিকার সরকার কেড়ে নিতে পারে না। "আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যাকে ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার বলা হয়েছে, তা এমন বেপরোয়াভাবে নাগরিকদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া যেতে পারে, কিম্বা ঐ অধিকার হ্রাস করা যেতে পারে, যদি না তা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়; যে একই বয়স, লিঙ্গ বা অবস্থার সকল মানুষকে তা সমানভাবে প্রভাবিত করে।"

www.pathagar.com

সম্পত্তিতে মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার যে কোন সরকারই সম্মত পদ্ধতি ছাড়া কেড়ে নিতে পারে না– এই যুক্তিটা পরবর্তী বৎসরগুলোতে আরো পরীক্ষিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাগুরু অংশ সরকারী হস্তক্ষেপ সমর্থন করে, এমন অনেক ক্ষেত্রেই ফিল্ড তীব্রভাবে তাঁর মতানৈক্য ব্যক্ত করেন। কিন্তু মতের পরিবর্তন হয়, এবং ১৮৮৬ সনের মধ্যেই সমগ্র কোর্ট ফিল্ডের মতের সমর্থক হয়ে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার এক কাউন্টি কর্তৃক সাদার্ন প্যাসিফিক রেলওয়ের উপর ধার্য করা একটি বিশেষ করের বৈধতা সম্পর্কে, ফিল্ড এবার বলতে পারলেন, "চতুর্দশ সংশোধনী এইসব কর্পোরেশনের বেলায় প্রয়োগ করা যায় কি না, এই প্রশ্নে কোর্ট কোন যুক্তিই শুনতে রাজি নয়। আমাদের সকলেরই মত যে তা যায়।" সংবিধানের যে সংশোধনীটা সদ্যমুক্ত দাসদের রক্ষার জন্য করা হয়, সেটা অতঃপর কর্পোরেশন এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতে লাগলো, আর এই ক্ষেত্রেও স্থানীয় করটা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হলো। ফিল্ডের মতটা যখন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধনিক আইনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়াল তখন রাষ্ট্র পর্যায়ের অনেক আইনই বাতিল হয়ে গেল, যার অন্তর্গত ছিল কাজের সময় নিয়ন্ত্রণ, শিশুশ্রম নিয়োগ–বিধি, কারখানার অবস্থা এবং অর্থনৈতিক জীবনের অমন আরো অনেক বিধি–নিষেধ। যে সময়ে শিল্পের বিস্তার নানা ধরনের নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছিল, সেই সময়ে সরকারী হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ বিরোধী এক দর্শন এ দেশের আইন হয়ে রইলো, এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবসায় এবং চুক্তির স্বাধীনতায় সামান্যতম হস্তক্ষেপও অনুমোদন পেলো না। বৃথাই বিচারপতি অলিভায় ওয়েন্ডেল হোমস্ তাঁর এক বিখ্যাত মতানৈক্য টীকায় অনুযোগ করলেন ঃ চতুর্দশ সংশোধনী তো আর মিঃ হারবার্ট স্পেন্সারের 'সোসাল স্ট্যাটিক্স'–কে আইন হিসাবে পাশ করেনি।

ব্যক্তিতাবাদের লোকাচার

ব্যক্তিতাবাদের দর্শনটাকে একেবারে লোকাচার এবং সেই সাথে আইনের নীতিতে রূপান্তরিত করা হয়। একটি কাহিনী অনুসারে, দরিদ্র বহিরাগত এক বালক ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন স্তরে জীবন শুরু করে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে টাকা সঞ্চয় করে, তা বুদ্ধিমানের মতো বিনিয়োগ করায় শেষ পর্যন্ত সে ব্যবসায়ের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে পৌছায়। তারপর বিয়ে–থা করে এক সুখী পরিবার আর

www.pathagar.com

সহকর্মীদের শ্রদ্ধালাভ করলো। পরিণত বয়সে এই ব্যক্তি তার জ্ঞানের জন্য একজন প্রবীন রাজনীতিবিদ হলো, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যার মতামত শুনতেন। অতঃপর নাতিনাতনীদের ভালবাসা পেয়ে সুখে তাঁর কাল কাটে।

যদিও তুলনামূলকভাবে অল্প সংখক ব্যবসায়ের নেতাই অমন শীর্ষে পৌছতে পেরেছিলেন, (বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী বা পেশাধারীদের সন্তান, সাধারণের চেয়ে বেশী শিক্ষা পায় আর একদম তলা থেকে জীবন শুরু করে না)। তবু বলা চলে, এ ছিল এক উন্নয়নশীল অর্থনীতি, যেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রচেষ্টা বাধাহীন, আয়করহীন অবস্থায় যারা টাকা চেয়েছে তাদের জন্য সুযোগের এক উর্বর প্রান্তর উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কেউ কেউ একেবারে লোক–কাহিনীর জীবন্ত উদাহরণই ছিল, যদিও তারা কোন চালু প্রতিষ্ঠান থেকে উঠেনি, বরং নিজেদের তীক্ষ বুদ্ধি, যোগ্যতা আর সৌভাগ্যের দ্বারা নিজেরাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, এন্ড্রু কার্নেগীর জন্ম হয় স্কটল্যণ্ডে। তিনি ছিলেন এক তাঁতির ছেলে। যখন যন্ত্রচালিত বস্ত্রকলের চাপে তাঁদের ব্যবসা ত্যাগ করতে হলো, তখন তিনি পরিবারের সাথে আমেরিকায় চলে আসেন। তের বৎসর বয়স্ক এণ্ড্রু, পিটস্‌বার্গের নিকটে এক কাপড়ের কলে ববিন বয় হিসাবে কাজ করতে গেলেন, তাঁর মজুরী ছিল দিনে বিশ্ সেন্ট। কঠিন পরিশ্রমের জন্য তিনি উন্নতি লাভ করে ইঞ্জিন রুমের কাজ পেলেন, তাঁর অংকের জ্ঞান আর লিখবার ক্ষমতার জন্য কিছু দিন পরে কেরানীর পদে আরেকবার তাঁর পদোন্নতি হলো। অধিক সুযোগ থাকায় নতুন কর্মক্ষেত্রে সন্ধানী এন্ড্রু টেলিগ্রাফ সংবাদবাহক হলেন। টেলিগ্রাফী শিখলেন এবং ঐ যন্ত্রের চালকের পদ পেলেন। পরে আরো উর্বর ক্ষেত্রের সন্ধানে গিয়ে তিনি পেনসিলভানিয়া রেলরোডের টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরক হন। এবং পরে সেখানে সাধারণ পরিচালকের সচিবের পদ লাভ করেন। সাধারণ পরিচালক যখন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন, তখন সবে পঁচিশ বৎসরের এন্ড্রু রেলরোডের পশ্চিম বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন। অর্থ সঞ্চয় করে তিনি তা একটা স্লিপিংকার কোম্পানীতে আর তেলের জমিতে বিনিয়োগ করলেন, যেগুলো সে সময় নতুন আর সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবসা ছিল। গৃহযুদ্ধের সময় কার্নেগী পূর্বাঞ্চলের সম্পূর্ণ সামরিক রেলরোড আর টেলিগ্রাফের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন আর বরাবরের মতো এবারো তিনি যোগ্যতার সাথেই তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন।

www.pathagar.com

লোহা আর ইস্পাতের তৈরী ব্রিজ যে কাঠের তৈরী ব্রিজের চেয়ে উন্নত এ বিষয়ে পূর্বাভাষ দিতে পেরেছিলেন তিনি। তিনি নিজে কিস্টোন ব্রিজ ওয়ার্কস্ নামক একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন ১৮৬২ সনে। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরেই তিনি তাঁর নিজের কোম্পানীকেই কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য একটি ইস্পাত কারখানাও নির্মাণ করেন এবং ১৮৬৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রে 'বেসিমার' ইস্পাত প্রস্তুত-প্রণালীর প্রথম প্রয়োগ করেন। ক্রমাগত নির্মাণ আর সম্প্রসারণের দ্বারা তিনি আরো অনেক কারখানা, লোহা আর কয়লার খনি, রেলরোড এবং অপর যা-যা দেশে একটা সম্পূর্ণ একীকৃত (integrated) ইস্পাত কারখানা গঠনের জন্য প্রয়োজন, তা সম্পন্ন করেন। নিজে এটার পরিচালন ভার গ্রহণ না করে, তিনি বরং এজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক প্রতিভার সন্ধানে যত্নবান হন এবং যে পরিচালকদের এই কাজের ভার দেন, তাঁদের কাজে মনোযোগী এবং উন্নয়নকামী করার জন্য যথেষ্ট পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ১৯০১ সনে তাঁর এই কোম্পানী নব গঠিত 'যুক্তরাষ্ট্র' স্টিল কর্পোরেশনের কাছে প্রায় আধ-মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রি করে দেন। এতে কার্নেগীর ব্যক্তিগত অংশ প্রাপ্য হয়েছিল তিন শত মিলিয়ন ডলার। যে দর্শনে কার্নেগী বিশ্বাস করতেন এবং সেই অনুসারে জীবন ধারণ করতেন, তা এই যে ব্যক্তি শুধু তার অর্থের তত্ত্বাবধায়ক এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সমাজের মংগলের জন্য তা ব্যবহার। কোম্পানী বিক্রি করে দিয়ে বাকী জীবনটা তিনি শিক্ষা আর গবেষণার সমর্থনে ব্যয় করেন। তাঁর অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয় পিটস্‌বার্গ কর্নেগী ইনস্‌টিটিউট অব টেক্‌নলজি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ওয়াশিংটনে কর্নেগী ইনস্‌টিটিউট, শিক্ষা আর গবেষণার জন্য নিউইয়র্কে কার্নেগী কর্পোরেশন নামক ট্রাস্ট, কার্নেগী ফাউন্ডেশন ফর এডভান্সমেন্ট অব টিচিং, কার্নেগী এনডাউমেন্ট ফর ইনটারন্যাশনাল পীস্ এবং বীরত্বপূর্ণ কাজের পুরস্কার দেবার জন্য কার্নেগী হিরো ফান্ড। এ ছাড়াও সারা দেশে এক শত শহরে তিনি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে দেন। এই সকল দান কার্যে তাঁর নীতি ছিল স্বনির্ভরতা – যারাই সাহায্য পেয়েছে, তাদেরই সর্বক্ষেত্রে কিছু টাকা নিজে থেকে দিতে হয়েছে।

কার্নেগী তাঁর ব্যক্তিতাবাদ আর টাকার তত্ত্বাবধায়কত্ব বিষয়ক দর্শনের উপর কয়েকটি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেন ঃ ট্রায়াম্ফ্যান্ট ডেমোক্রেসি (১৮৮৬), গস্‌পেল অব ওয়েল্‌থ্ (১৯০০), এবং দি এম্পায়ার অব বিজিনেস্ (১৯০২)। এই সব গ্রন্থেই ব্যবসার পদ্ধতি, ব্যক্তিতাবাদ আর মুক্ত ব্যবসার সমর্থন করা হয়েছে; এই মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, সম্পদের উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যবহার নয়, এটা

www.pathagar.com

একমাত্র পুরো সমাজের মঙ্গলের জন্যই ব্যয় করতে হবে। 'সম্পদ' সম্পর্কে নর্থ আমেরিকান রিভিউ পত্রিকায় ১৮৮৯ সনে তাঁর লেখায় এই মতের সুন্দর প্রকাশ ঘটেঃ

"সমাজ প্রতিযোগিতার নিয়মের জন্য যে মূল্য দেয়.. এটা অবশ্যই বেশী; কিন্তু এই নিয়মের সুবিধাও অনেক, কারণ এই নিয়মটা থাকার কারণেই আমরা এক চমৎকার, বৈষয়িক উন্নয়ন অর্জন করেছি, যা আবার সকলের জন্যেই উন্নত অবস্থা নিয়ে আসে।

..... এই নিয়ম (law) যদিও সময় সময় ব্যক্তির জন্য কষ্টকর হয়, গোটা জাতির জন্য এটা উত্তম, কারণ এ ব্যবস্থা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিরই টিকে থাকার নিশ্চয়তা দেয়।

অল্প কয়েক জনের দ্বারা সম্পদ সঞ্চিত হলে তা এক 'সমন্বয়ের রাজ্য' এবং 'ধনী আর দরিদ্রের পুনর্মিলন' এনে দেবে, অবশ্য যদি ধনী তার ধন সবচেয়ে ভাল হিসাব করে সমাজের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করাটা তার কর্তব্য বলে মনে করে।

সঞ্চয়ের প্রথাটা বাধাহীন থাকবে, বিতরণের প্রথাও বাধাহীন থাকবে। ব্যক্তিতাবাদ চলতে থাকবে, কিন্তু কোটিপতিরা হবে মাত্র দরিদ্রের পক্ষে জিম্মাদার (trustee), স্বল্প কালের জন্য মাত্র সমাজের সব মানুষের বর্ধিত অর্থ তার হেফাজতে রাখা হয়েছে, আর তাকে এই সম্পদের প্রশাসন সমাজের মঙ্গলের জন্য এমন যোগ্যতার সাথে করতে হবে, যা তার নিজের জন্যও সে করতো না।"

এন্ড্রু কার্নেগী ছিলেন ব্যক্তিতাবাদের লোকাচারের এক জীবন্ত প্রতীক, যিনি ব্যক্তিগত সম্পদকে সামাজিক ব্যবস্থার একটি প্রাকৃতিক উপাদান বলে মনে করতেন, যা মানুষ কর্মের আর সঞ্চয়ের দ্বারা লাভ করে এবং যা তার মালিকের উন্নত চরিত্রেরই নির্দেশক। রাসেল কর্নওয়াল নামে সেই সময়ের একজন বিখ্যাত বক্তা তাঁর এক উদ্দীপনাপূর্ণ রচনা 'একারস্ অব ডায়ামণ্ডস্'-এ বলেছিলেন, 'ঈশ্বর সুলভ স্বভাবের সাথে ধনী হওয়া এক সূত্রে গাঁথা'। কিম্বা ধর্মযাজক উইলিয়াম লরেন্স বলেছিলেন, 'শেষ পর্যন্ত শুধু সাধু-ব্যক্তির (man of morality) কাছেই সম্পদ আসে'। বিপরীতক্রমে দারিদ্র্য আসে আলসেমী বা অপব্যয় বা অযোগ্যতার ফলে- আর এটার প্রয়োজন আছে শুধু এই কারণেই যে এ থেকে কঠিন পরিশ্রম আর সঞ্চয়ের শিক্ষা পাওয়া যায়। এই দর্শনটা কেবলমাত্র ধনবানদের দ্বারা তাদের ধনের সমর্থনে খাড়া করা একটা যুক্তিবাদই

www.pathagar.com

নয় (যদিও ব্যাপারটা তাই)। অধিকন্তু, এ ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের একটা বিশ্বাস (faith), আর ঐ মানুষের দলে বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত আর অনেক শ্রমিকও ছিল।

ব্যক্তিতাবাদের ফলাফল

ব্যক্তিতাবাদের একটা নোংরা দিকও ছিল। সম্পদের কৈফিয়ত দানকারীদের স্বীকার করবার মতো অনেক বিষয়ই ছিল। ১৯০০ সনে যখন কার্নেগী স্টীল কোম্পানীর মুনাফার পরিমাণ ২০ মিলিয়ন ডলারে পৌছায় (এর বেশীর ভাগই এন্ড্রু কার্নেগীর কাছেই যায়), ঐ বছরে গড়ে একজন শ্রমিকের বাৎসরিক মজুরী ছিল প্রায় ৬০০ ডলার। সমাজে এই রকম আয় বন্টনের মধ্যে দৃশ্যতঃ কোন ন্যায়বিচার ছিল না, এবং মার্কস্ যে ধরণের সামাজিক দলের মেরু প্রবণতার পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, এতে তার সম্ভাবনা ছিল। তবুও সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দর্শনের গোঁড়া সমর্থকরা পরমানন্দে এগিয়ে চলেছিল, এবং যে বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা তারা তৈরী করেছিল, তার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিল বলে মনে হয় না।

একবার যখন নিউইয়র্কে সেন্ট্রাল রেলরোড তাদের ভাড়ার অতিরিক্ত নিউইয়র্ক এবং শিকাগোর মধ্যবর্তী দ্রুতগামী ট্রেনটা বন্ধ করে দেয়, তখন জনসাধারণ হৈ চৈ শুরু করে। কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট এবং শেয়ারের প্রধান মালিক উইলিয়াম ভ্যাণ্ডারবিল্টকে যখন একজন খবরের কাগজের রিপোর্টার এ বিষয়ে প্রশ্ন করে, তখন সে একেবারে ফেটে পড়লো, "জনসাধারণ জাহান্নামে যাক, আমি তো কোম্পানীর শেয়ার মালিকদের স্বার্থে কাজ করি। জনসাধারণ যদি ঐ ট্রেনটা চায়ই তবে তারা বাড়তি ভাড়াটা দেয় না কেন?" এই বিবৃতির ফলে তুমুল আপত্তি উঠে। ভ্যাণ্ডারবিল্ট স্থির করলো যে এখন তার অন্য ব্যবসার দিকে যাবার সময় এসেছে। তার ৩০ মিলিয়ন ডলারের সেন্ট্রালের শেয়ার বিক্রি করে দিল।

এটা ছিল ফাটকাবাজারী, শিল্পে লগ্নিকারী আর লুটেরাদের পক্ষে এক মহাসুযোগের সময়। জায় গোল্ড এবং জিম ফিস্ক নামে দুই টাকার ফাটকাবাজারী আয়ার রেলরোড শেয়ার বাজারের সম্ভাব্য গোপন খেলায় হাত পাকিয়ে পরে নিউইয়র্ক টাকার বাজারে স্বর্ণের অবাধ সরবরাহের ক্ষেত্রে গোপন কেনাবেচায় 'করনার' (corner) করার চেষ্টা করে। ফেডারেল সরকারের

www.pathagar.com

নিউইয়র্ক সাবট্রেজারীর স্বর্ণ সরবরাহ তাদের এই কেনাবেচার সাথে প্রেসিডেন্ট গ্র্যান্টের শ্যালকের সাহায্যে বেআইনীভাবে জুড়ে নিয়ে তারা স্বর্ণের দাম খুব বাড়িয়ে ফেলতে পারে। ওয়াশিংটনে তাদের যোগাযোগ থাকায় সরকার যখন তাদের 'করনার' ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়, গোপনে তারা আগেই খবরটা ফাঁস করে ফেলে আর নিজেদের মওজুদ সময় মতো বিক্রি করে দিয়ে অনেক লাভ করে। যখন টাকার বাজারে আতংক আসে, তারা এমন কি তাদের নিজ দালালদেরও দেউলিয়া করতে ছাড়েনি। এই ১৮৬৯ সনের সেপ্টেম্বরের কালো শুক্রবার ছিল ফাটকাবাজারের সব চেয়ে বেশী রকমের খেলার উদাহরণ মাত্র যা সময় সময় অর্থনীতিকে অশান্ত করতে থাকে।

একচেটিয়া সৃষ্টিকারীরাও কাজ করে যাচ্ছিল। নব্য শিল্প অর্থনীতিতে বিশেষভাবেই প্রতিযোগিতার কারণে মূল্য-যুদ্ধের ঝুঁকি দেখা দিল। উদাহরণস্বরূপ, রেলরোড শিল্পে মোটা মুলধন বিনিয়োগ করতে হতো, আর প্রতিযোগিতা করে ভাড়া কমাতে থাকলে আয় মোট খরচের চেয়েও কমে এসে শুধু পরিচালন ব্যয়টাই উঠে আসতে পারতো। এই ভাবে 'ভাড়া যুদ্ধ' দুর্বল লাইনের জন্য দেউলিয়া অবস্থা সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু রেলের সম্পদ শুধু ট্রেন চলাচলের কাজেই লাগতে পারতো, তাই যে কোম্পানী প্রথমবার পরাজিত হতো, তারা নিজেদের আর্থিক বুনিয়াদ পুনর্গঠন করে নিয়ে আবার এই শিল্পযুদ্ধে যখন নতুন করে নামতো, তখন তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রথমবারের চেয়ে বেশী হতো। তাই আশ্চর্যের কিছুই ছিল না যখন দেখা যেতো যে রেল-রোড কোম্পানীরা একত্রিত হয়ে যাচ্ছে বা তাদের মধ্যে ভাড়ার হার বা পরিবহণের এলাকা ভাগ করার চুক্তি হচ্ছে, একে অপরের শেয়ার কিনে নিচ্ছে আর 'স্বার্থের একতা' গড়ে উঠছে।

একই ধরনের স্বার্থ অন্যান্য শিল্পেও দেখা দিচ্ছিলঃ ইস্পাত, কৃষি, কৃষি-যন্ত্রপাতি, চিনি এবং তৈলশোধন ও বিপণন এবং জনজীবনের অত্যাবশ্যক সেবা সরবরাহগুলো। প্রকাণ্ড সব 'ট্রাস্ট' গড়ে উঠলো যাতে 'প্রতিযোগিতার' ফলে সৃষ্ট শিল্পের অশান্ত অবস্থার বদলে সেখানে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে-যে 'প্রতিযোগিতা' তাত্ত্বিকদের মতে ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য ভিত্তি স্বরূপ। একত্রিত করার সময় টাকা লগ্নীকারকরা অনেক সময় বড় উকিলের ফি বা লগ্নীকারকের ফি পাবার আকর্ষণে, ঐ কাজের ফলে কোম্পানী, শেয়ার মালিক বা জনসাধারণের কি অর্থনৈতিক লাভ হবে সেটা আর লক্ষ্য করতো না। ১৮৯০-এর দশকে যখন জে.পি. মরগ্যান ইস্পাতের ছোট কারখানাগুলো

www.pathagar.com

মিলিয়ে বড় কোম্পানী গড়ে তুলেছিলো, সে দেখতে পেলো যে সংযুক্ত সম্পদের শেয়ারগুলোর প্রকৃত মূল্যের চেয়ে নতুন শেয়ারের দাম বেশী করে দিলে ভাল লাভ হবে। ব্যবসার 'সুনাম' (Good-will) আর সম্ভাব্য একচেটিয়া মুনাফা পুঁজি' (capitalizing) হিসাবে দেখালে ব্যাংকার আর উকিলরা বেশী পয়সা পায়। যখন এন্ড্রু কার্নেগী তার প্রতিদ্বন্দ্বী মরগ্যানকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার পরিকল্পনা নষ্ট করে দেবে বলে ভয় দেখায়, মরগ্যান বাধ্য হয়ে কার্নেগী যে দাম চায়, তাই দিয়েই তার ব্যবসা কিনে নিলো। এই ভাবে জন্ম নিল যে ইউনাইটেড স্টেটস্ স্টীল কর্পোরেশন, তার শেয়ার আর বন্ড সাধারণের কাছে বিক্রি আর প্রমোটারদের কাছে বিতরণের জন্য যখন দেওয়া হয়, তাতে ঐ সম্পদের প্রকৃত মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য হাঁকা হয়। কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার জন্য চড়া দামটা অবশ্য পুষিয়ে যায়, কিন্তু এই মূল্য চূড়ান্ত পর্যায়ে জনসাধারণকেই ইস্পাতের চড়া দাম হিসেবে শোধ করতে হয়। কার্নেগী–মরগ্যান কেনাবেচা শেষ হবার পরেই একবার তাদের দুজনের দেখা হয় এক সমুদ্রগ্রামী জাহাজে। সেখানে কার্নেগী নাকি বলেন "আমি একটা ভূল করেছি পিয়ারপন্ট, যখন আমার কারবার তোমার কাছে বেচে দিলাম, আমার উচিত ছিল যা দাম পেয়েছি, তার চেয়ে আরো ১০০ মিলিয়ন ডলার বেশী দাবী করা"। তাতে না কি মরগ্যান উত্তর দিয়েছিল, "আমি তাও দিয়ে দিতাম"।

এই ধরনের বল্গাহীন ব্যক্তিতাবাদ এক অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। ১৮৭৭ সনে মন্দা এবং শিল্পে অসন্তোষের ফলে যুক্তরাষ্ট্র একবার বিপ্লবের কাছাকাছি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। রেলের কাজ বন্ধ (lay-off) এবং মজুরী হ্রাস ঘোষণা থেকে স্থানীয় ধর্মঘট ক্রমশঃ অন্যান্য লাইনে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। হিংসাত্মক কাজ আর মারামারি শুরু হলো, যা অনেক রেলরোডের সম্পদ নষ্ট করলো। এর মাত্র এক দশক পরেই শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারের সংঘর্ষ ঘটে। সুবিশাল 'ম্যাক্করমিক্ রিপার ওয়ার্কসে' ইউনিয়নের সভ্য হওয়া নিয়ে গোলমাল শুরু হয়, তা থেকে গোটা শহরে সাধারণ ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চাশ হাজারের বেশী শ্রমিক কাজ বন্ধ করে। কম দক্ষ নৈরাজ্যবাদীদের আন্দোলন বিশেষভাবে জোরদার হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের দ্বারা পুঁজিবাদ এবং সকল সরকারের উৎখাত। ম্যাককরমিক কারখানার সামনে এক সংঘর্ষের ফলে অনেক শ্রমিক আহত হলো একটা ক্ষুদে নৈরাজ্যবাদী সংবাদপত্র এই 'গণহত্যার' প্রতিশোধের আহবান জানালো। পরের দিন সন্ধ্যায় এক সভা ডাকা হয় এবং সেখানে খুব বড় আর শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হয়, কিন্তু পুলিশের আক্রমণে সমাবেশ অনেকাংশে ভেঙ্গে যায়। একটা বোমা নিক্ষেপ করায় সাত

www.pathagar.com

জন পুলিশ নিহত এবং ৬৮ জন আহত হলো। নৈরাজ্যবাদীদের আটজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং হত্যার দুষ্কর্মে সহযোগিতার জন্য তাদের বিচার হয়। ঘৃণা এবং ভয়ের এক চূড়ান্ত উত্তেজনাময় পরিবেশে অপরাধী প্রমাণ হওয়ায় চারজনের ফাঁসি হলো। একজন জেলেই আত্মহত্যা করে এবং তিন জনেরই দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। বোমাটা সত্যই কে ফেলেছিল, তা কিন্তু কখনো জানা যায়নি।

আবার ১৮৯০-এর দশকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্ম দেয়। ঐ দশকের কঠিন দিনগুলোকে "মহামন্দা" বলা হতো— অবশ্য ১৯৩০-এর আগে পর্যন্ত। তীব্র বেকার সমস্যা দেখা দেয় আর ইস্পাত, রেলরোড, এবং কৃষি যন্ত্রপাতির মতো মৌলিক শিল্পগুলো অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৯২ সনের গ্রীষ্মে পিটস্‌বার্গে অবস্থিত এন্ড্রু কার্নেগীর হোমস্টেড ইস্পাত কারখানায় সংঘর্ষ ঘটে। মজুরী হ্রাস, কোম্পানী কর্তৃক ইউনিয়নকে স্বীকার করতে অস্বীকার, তাদের লোকদের সাথে দর দাম করতে অস্বীকার, বাইরে থেকে ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য কয়েক শত গুণ্ডা (strike breakers) আমদানী, এতে করে শ্রমিক আর মালিক পক্ষের লোকদের মধ্যে হাতাহাতি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। বিশ জন লোক নিহত এবং সম্ভবতঃ পঞ্চাশ জন আহত হয়, এবং কারখানার ম্যানেজার হেনরী ফ্রিককে পরে একজন বিক্ষোভকারী গুলি করে এবং তার অফিসে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। ন্যাশনাল গার্ড শেষ পর্যন্ত শৃংখলা ফিরিয়ে আনে, কিন্তু ধর্মঘট ভেঙ্গে দেয়া হয়।

শিকাগোর কাছে, জর্জ পুল্‌ম্যান তার রেলের কামরা বানানোর কারখানার পাশেই পিতৃস্নেহে একটা 'মডেল টাউন' বানিয়েছিলেন। সেখানে কারখানার কাজ বন্ধ, শ্রমিক উচ্ছেদ ইত্যাদি নিয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, এবং শ্রমিকরা কর্ম ত্যাগ করে বেরিয়ে গেল। আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়ন ইউজিন ডেবস্-এর নেতৃত্বে দেশব্যাপী তাদের সহানুভূতিতে পুল্‌ম্যান কামরা বয়কটের এক আন্দোলন করে, ফলে শিকাগোতে এক মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটে। এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেল ইন্‌জাংশন আনে, যিনি ইতিপূর্বে রেল রোডেরই উকিল ছিলেন। এবং প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যান্ড জাতীয় বাহিনী তলব করেন, যদিও গভর্নর আল্টগেল্ড তাতে আপত্তি করে বলেছিলেন যে সৈন্য তলবের প্রয়োজন নাই। এই শক্তি সমাবেশের প্রেক্ষিতে ধর্মঘট সফল হতে পারেনি এবং ডেবস্-এর কারাদণ্ড হয়, যিনি একজন দৃঢ়প্রত্যয়ী সমাজতন্ত্রী হয়ে জেল থেকে বের হলেন।

www.pathagar.com

রক্ষণশীল ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ মনে হয় এসব থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করলো না, অবশ্য তারা কোন কথা ভুলেও গেল না। যখন ১৯০২ সনে অ্যান্থ্রেসাইট কয়লা খনিতে ধর্মঘটের ফলে বড় শহরের খরিদ্দারদের দীর্ঘ শীতে জমে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তখন মালিকদের সমিতি প্রধান, জর্জ এফ. বায়ার, ইউনিয়নের সালিসির প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। একজন অনুযোগকারী শেয়ার মালিককে তার চিঠির জবাবে লেখে ঃ

"প্রিয় মিঃ ক্লার্ক, আপনার ১৬ তারিখের চিঠি পেয়েছি। আপনাকে আমি চিনি না। মনে হচ্ছে আপনি একজন ধার্মিক মানুষ, কিন্তু দৃশ্যতঃ আপনি শ্রমিকদের দ্বারা ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, এই দাবীতে তাদের দিকে পক্ষপাতপূর্ণ, যদিও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী পাওয়া ছাড়া ব্যবসায়ে তাদের আর কোন স্বার্থ নাই। আমার অনুরোধ আপনি হতাশ হবেন না। শ্রমিকের আধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা করবে ঐ বিক্ষোভকারীরা নয়, বরং যেসব খ্রীষ্টান ভদ্রলোকদের ঈশ্বর এদেশের সম্পদের মালিকানা আর নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়েছেন, তারাই। একান্তভাবে প্রার্থনা করুন, যেন সত্যের জয় হয়, আর মনে রাখবেন ঈশ্বর এখনো সব কিছু শাসন করছেন আর তাঁর শাসন হচ্ছে আইন–শৃঙ্খলার, হিংসা আর অপরাধের নয়।"

পুঁজি মালিকানার ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকারের দাবীতে এই নির্লজ্জ বিবৃত্তি জনমতে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে যে ফেডারেল সরকার শেষে পুঁজি আর শ্রমিক এই মারমুখী দুই দলের মধ্যে নিজেদের অনুপ্রবেশ ঘটালো। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট ঘোষণা করলেন যে যদি মালিক পক্ষ বিরোধটার সালিসীতে সম্মত না হয় তবে খনি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই সর্বপ্রথম ফেডারেল সরকারের হস্তক্ষেপ আসলো মালিকের পক্ষে না হয়ে শ্রমিকের পক্ষে।

ব্যক্তিতাবাদের সীমাবদ্ধতা

রূঢ় ব্যক্তিতাবাদের দর্শন, আইন আর লোকাচার এবার শ্রমিকের সাথে সংঘর্ষের পথে পা দিলো। মন্দার সমস্যা, বেকারত্বের সমস্যা, একচেটিয়া ব্যবসা আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত হওয়া, আয় বন্টন আর সামাজিক ন্যায়বিচারের সমস্যা ঃ এগুলোর সমাধান করতে যখন ব্যক্তিতাবাদ অস্বীকার করলো, তখন আসলো এর বিরুদ্ধে সমালোচনা আর আক্রমণ। মার্কসবাদ পুঁজিবাদের যেসব প্রশ্ন তুলে ধরে, কিম্বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যেসব

www.pathagar.com

সামাজিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়, সেসব সমস্যা ওতে পর্যালোচনা করা হয় নি, যদিও সম্ভবতঃ তাত্ত্বিক দিক থেকে এটা ভালই ছিল। যখন সমস্যা আসে এবং তার সমাধানের অভাবে আন্দোলন আর প্রতিহিংসা দেখা দিল, তখন জনমতও অন্য দিকে যেতে শুরু করে। শুধু পুরাতন তত্ত্বের চর্বিত চর্বণ আর শ্লোগানে কোন লাভ হল না। অর্থনীতি, সামাজিক তত্ত্ব, এবং সরকারী কর্মনীতিকে বাস্তবতার সাথে এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংঘর্ষের বাস্তবতার সাথে বোঝাপড়া করতে হবে বলে দেখা গেল।

www.pathagar.com

৭
প্রাচীন অর্থনীতির পুনরভ্যুদয়

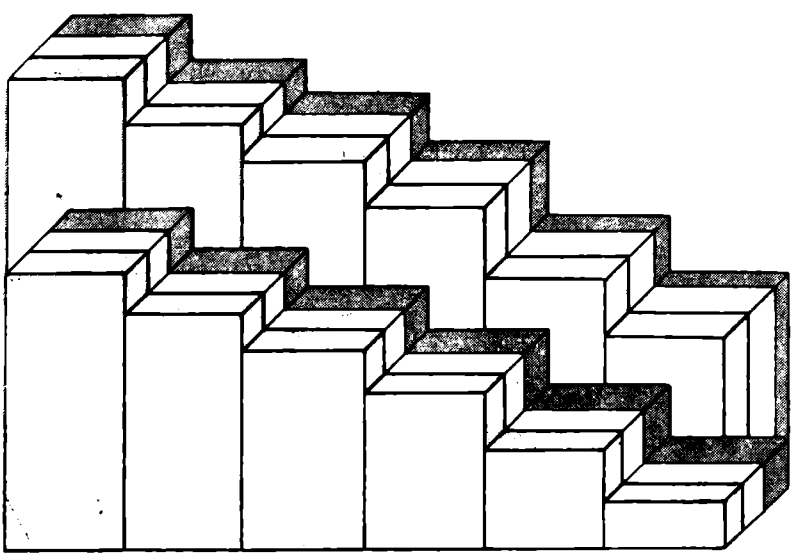

অর্থনীতিবিদরা মোটের উপর ব্যক্তিতাবাদ দর্শনের চরমপন্থী বক্তব্যটা কখনো মেনে নেয়নি। তারা সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে এবং বেন্থামীয় উপযোগবাদের প্রভাবের ফলে অর্থনৈতিক ব্যাপার যেখানে সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা সমাজের উপকার হতে পারে, এমন ক্ষেত্রে তারা সরকারী হস্তক্ষেপের সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিল। তবুও অর্থনীতিবিদের বেশীর ভাগই ব্যক্তিতাবাদ দর্শনের কাঠামোর মধ্যেই ছিল আর সরকারী হস্তক্ষেপকে শুধু

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ পরিমাণে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই সমর্থন করেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ না করার অর্থনীতিই প্রচলিত থাকে, আর অর্থনৈতিক তত্ত্বে ঐ মতটা প্রতিফলিতও হয়।

তাতে আরো কিছুর প্রতিফলিত ছিল। পুঁজিবাদের মার্কসীয় সমালোচনা। কিছুটা অজ্ঞানে আর কিছুটা সজ্ঞানে, ১৮৭০ থেকে ১৯০০ এই সময়ের অর্থনীতিবিদরা যেসব নতুন তাত্ত্বিক সূত্রের রূপদান করেন তা ছিল পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় যুক্তির খণ্ডন স্বরূপ।

প্রান্তিক উপযোগ এবং ব্যক্তির কল্যাণ

১৮৭০ দশকের গোড়ার দিকে তিনজন অর্থনীতিবিদ প্রত্যেকে অপরের অজান্তেই মূল্য সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন যা পুরাতন শ্রম তত্ত্বের স্থান গ্রহণ করে। একজন ইংরেজ, একজন ফরাসী আর একজন অষ্ট্রিয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখলেও তাঁদের বক্তব্য ছিল পরস্পরের খুব কাছাকাছি—বিজ্ঞানের বিকাশে যে ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জন কর্তৃক একটা নতুন নিয়মের বা সূত্রের একই সময়ে আবিষ্কার, এ ছিল তারই আর একটি উদাহরণ। দশ বৎসরের মধ্যেই এই নতুন চিন্তাধারা অর্থনৈতিক পেশার সর্বত্র সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং দুইএক জন একগুঁয়ে প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদ ছাড়া আর সকলেই এই নতুন চিন্তাধারাকে একটা বিরাট বাধা অতিক্রম হিসাবে স্বাগত জানালো। এরই সাথে আরো একটা যোগাযোগ হয়ে গেল—মার্কস্ মূল্যের শ্রম তত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁর শোষণতত্ত্ব বিষয়ক পুঁজিবাদের উপর আক্রমণমূলক রচনা প্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্বোক্ত আবিষ্কারটা ঘটে।

পরে অবশ্য বোঝা গেল যে নতুন ধারণাগুলো আদতে তেমন নতুন ছিল না। প্রান্তিক উপযোগের মৌলিক নীতিটা একজন ইটালীয় গণিতবেত্তা প্রায় দেড়শ বছর আগেই বলেছিলেন, এবং ইতিপূর্বের পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার, একজন ফরাসী জন–উপযোগমূলক কাজের বিশেষজ্ঞ এবং কয়েকজন অখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ কর্তৃক উল্লেখিত হয়। এমন কি এরিস্টটলও তাঁর নীতিশাস্ত্র বিষয়ক রচনায় এই ধারণার ব্যবহার করেছিলেন, আর এর সাথে সম্পর্কিত কিছু চিন্তাধারা ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্যাথলিক ধর্ম বিশারদরাও বর্ণনা করেছিলেন। মার্কস্ কর্তৃক ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

মালিকানা ব্যবস্থা আক্রমণের আগে পর্যন্ত এইসব লেখা উপক্ষো করা হয়েছে। আক্রমণ যখন ঘটেই গেল তখন মূল্যের শ্রম তত্ত্বটা বিসর্জন দিতে হলো এবং অর্থনীতিবিদদের আয় বন্টন আর ব্যবসা-চক্রের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হলো। অর্থনীতিতে এক নতুন পথের সৃষ্টি হলো।

নতুন নিয়মের বক্তব্যটা ছিল সহজঃ কোন দ্রব্য বা সেবার মূল্য ঐ দ্রব্যে বা সেবায় কতটা শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে নির্ধারিত হবে না বরং তা ঠিক হবে যা কেনা হয়েছে তার শেষ এককটি কি পরিমাণ প্রয়োজন মিটিয়েছে তাই দিয়ে। সংক্ষেপে এই ছিল বিখ্যাত প্রান্তিক উপযোগের নীতি (Principle of Marginal Utility)।

সব চেয়ে ভালভাবে এই মূল নীতিটা বুঝিয়েছেন এর সহ আবিষ্কারক অস্ট্রিয়ার কার্ল মেন্‌গার (১৮৪০-১৯২১)। তিনি দেখালেন যে, একজন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন (rational) ভোক্তার সামনে যখন তার আয় খরচ করবার জন্য বহুবিধ বিকল্প পথ থাকে, তখন তার জন্য সে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি পেতে চাইবে। তা অর্জিত হবে, যখন ভোক্তা তার অর্থ ব্যয়টা এমনভাবে ভাগ করবে যে কোন একটি জিনিসের ক্রয় করা শেষ (বা প্রান্তিক) একক-এর জন্য যে ডলারটা খরচ করা হলো, তা থেকে পাওয়া তৃপ্তি (satisfaction) বা উপযোগ অন্য যে কোন জিনিসের কেনা শেষ এককের তৃপ্তির চেয়ে কম বা বেশী হবে না। যদি একটি জিনিস কেনা থেকে এক ডলার সরিয়ে নিয়ে অন্য কোন জিনিসে তা ব্যয় করা যায়, আর তা থেকে মোট তৃপ্তি বাড়ানো সম্ভব হয়, তা হলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভোক্তা তা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সব কেনা জিনিসের 'প্রান্তের' এককের উপযোগ সমান না হয়। কোন একজন ভোক্তা বা খরিদ্দার যে কোন একটি জিনিস কতটা পরিমাণ চাইবে, তা ঠিক হয় এই ভাবেই। মেনগার তাঁর ভোক্তাকে এমনই এক ব্যক্তি হিসাবে এঁকেছিলেন যে, সব সময় তার সামনে খোলা বিভিন্ন বিকল্প পথগুলোর তুলনামূলক সুবিধাটা বিবেচনা করছে আর এইভাবে সে সর্বদাই এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা তাকে সবচেয়ে বেশী বাড়তি কল্যাণ এনে দেয়।

উইলিয়াম স্ট্যানলী জেভনস্ (১৮৩৫-১৮৮২) যিনি ছিলেন ঐ তত্ত্বের আর একজন সহ-আবিষ্কারক, যিনি উক্ত নীতির আর একটি দিকের ওপর জোর দেন; তিনি দেখান যে প্রান্তিক অবস্থানে উপযোগিতা হ্রাস পায়। কোন ব্যক্তি একটা জিনিস যত বেশী পাবে, ততই তার ঐ জিনিসের আরো একটি একক থেকে তৃপ্তির পরিমাণ কমে আসে আর ততই সে জিনিসটার জন্য কম দাম দিতে

www.pathagar.com

চাইবে। তার অর্থ এই যে জিনিসটি যদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে তা সস্তা হয়ে যাবে, কারণ তখন একটা বাড়তি একক আর ক্রেতার কাছে তত মূল্যবান থাকবে না, যদিও জিনিসটা পানি বা রুটির মত এমন হতে পারে যে জীবন ধারণের জন্য তা অত্যাবশ্যক। অপরপক্ষে দুষ্প্রাপ্য বস্তুর দাম বেশী হবে কারণ কারো কাছেই সে জিনিসটা বেশী নেই, এবং আরো একটি একক ক্রেতাকে অনেক তৃপ্তি দেবে, যেমন হীরক বা মিংক কোট।

লিও ওয়াল্‌রাস (১৮৩৭-১৯১০), যে ফরাসী ১৮৭০-এর দশকে একই নীতি সম্পর্কে লেখেন, তিনি আবার ভিন্ন একটি দিকের উপর জোর দেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, কেমন করে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই (যার মধ্যে মূলধন জাতীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এসবও আছে), ক্রেতার খরচ করবার সিদ্ধান্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গোটা অর্থনীতিটা হচ্ছে জিনিসের দাম আর ক্রয়ের পরিমাণ ঘটিত সম্পর্কের দ্বারা প্রস্তুত জটিল সেলাইহীন একটা জাল বিশেষ, যার মধ্যে ক্রেতার টাকা কোন কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে তার দ্বারা সূক্ষ্ম সব পরিবর্তন সর্বদা সকল জায়গায় উৎপাদন আর মূল্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে। বিশেষ করে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটা নিজে থেকেই উৎপাদন আর চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেয়।

ওয়ালরাস কর্তৃক রচিত সাধারণ ভারসাম্যের তত্ত্ব (Theory of General Equilibrium) হলো এক জটিল গাণিতিক ছাঁচ (Mathematical model), যা কতকগুলো সহজ অথচ গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতির ভিত্তিতে প্রস্তুত। মানুষ নিজের স্বার্থের ভিত্তিতে কাজ করে; সকল বাজারে প্রকৃত প্রতিযোগিতা বর্তমান; সকল অর্থনৈতিক সম্পর্কই একটি বাজার কেন্দ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলো ক্রয় এবং বিক্রয়ের পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। যদিও এই সব শর্তের জন্য এটাকে কিছুটা ভাবমূলক এবং অধিবিদ্যামূলক (abstract and metaphysical) বলে মনে হয়, তবুও ওয়ালরাসের এই সাধারণ ভারসাম্যের তত্ত্বই পরে অধিকাংশ অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল।

প্রান্তিক উপযোগ আর সাধারণ ভারসাম্যের এই নয়া অর্থনীতি অনুসারে অর্থনৈতিক মূল্যের (Econmic Values) গোড়াটা রয়েছে বাজারের চাহিদার অংশে এবং ক্রেতাদের পছন্দের মধ্যে। পুরাতন 'মূল্যের শ্রম-তত্ত্ব'-বাজারের সরবরাহের অংশের দিকেই প্রধানতঃ নজর দেয় আর জিনিসের মূল্য এবং দামকে (value and price) উৎপাদন ব্যায়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছিল, যেটা

www.pathagar.com

চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রমের সময়ের খরচে এসে দাঁড়ায়। এই দুই পথকে একত্রিত করেন আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২–১৯২৪) নামক একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ। তিনি বললেন যে বাজারের দাম (market price) অর্থাৎ অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারিত হয় সরবরাহ আর চাহিদা এই উভয়ের দ্বারা। এই দুটি পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করে, অনেকটা যে ভাবে এ্যাডাম স্মিথ তাঁর প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কার্য পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলেন, সেই ভাবেই। মার্শাল দেখিয়েছেন যে দীর্ঘ সময়ে (in the long run) প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জিনিসের দাম সেই পরিমাণের দিকে নেমে যাবে, যে পরিমাণ দামে সবগুলো ক্রেতার চাওয়া পরিমাণ জিনিসটুকু যে সর্বনিম্ন উৎপাদন ব্যয়ে প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু মার্শাল যদিও উৎপাদন ব্যয়ের বিষয়টা আবার সামনে নিয়ে এলেন, তবুও তিনি এবং অন্যান্য অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই মেনগার আর ওয়ালরাসের মোদ্দা রাস্তাটা মেনেই নিলেনঃ উৎপাদনের মৌলিক রূপ নির্ধারিত হবে লক্ষ লক্ষ ক্রেতা ব্যক্তির কোটি কোটি স্বাধীন সিদ্ধান্তের দ্বারা।

এই ধারার চিন্তা থেকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে তা হলো, মুক্ত বাজার অবস্থায় ব্যক্তির কল্যাণ সব চেয়ে বেশী হবার প্রবণতা। যেহেতু ধরে নেয়া হলো যে ক্রেতারা তাদের তৃপ্তির সর্বাধিক করতে চেষ্টা করবে, এবং যেহেতু উৎপাদনের ধরনটা ব্যক্তির পছন্দের অনুরূপই হবে, সুতরাং এর ফল হবে কল্যাণের সর্ববৃহৎ স্তরে পৌছানো। এ বিশ্লেষণ থেকে আরো বোঝা যায় যে প্রতিযোগিতার চাপে গড়ে উৎপাদন ব্যয়ও সম্ভাব্য সর্বনিম্নস্তরে নেমে যাবে। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, গোটা অর্থনীতিটাই হবে সর্বাধিক কামনাতৃপ্তির একটা যন্ত্র বিশেষ, যাতে ক্রেতার লাভ আর উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাবে, যদি অর্থনীতিকে বাধামুক্ত অবস্থায় কাজ করতে দেয়া যায়।

এই ধারণাগুলো অর্থনীতির পুরো কেন্দ্র বিন্দুটাই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণী বিভাগ আর তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চিন্তা থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিল, যার উপর ইতিপূর্বে রিকার্ডো এবং মার্কস্ জোর দিয়েছিলেন, আর অর্থনৈতিক তত্ত্ব কেন্দ্রীভূত হলো ব্যক্তিতে। আয় বন্টনের নীতি, যার উপর ভিত্তি করে রিকার্ডো তার শিল্পোন্নয়নের বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং যার উপর ভিত্তি করে মার্কস তাঁর পুঁজিবাদ ভেঙ্গে পড়ার তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন, সেগুলোর প্রতিস্থাপন করা হলো ক্রেতা ব্যক্তির দ্বারা যাকে বর্ণনা করা হলো অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আর অগ্রগতির প্রধান নির্ধারক (determinant) হিসেবে। মনে করা হলো যেন

www.pathagar.com

গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা ক্রেতা ব্যক্তিদের (individual consumer) আর তাদের চাহিদার চারপাশে ঘুরছে।

অর্থনীতিকে এমন এক বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা হলো যা হারবার্ট স্পেন্সার আর উইলিয়াম গ্রাহাম সুমনারের সমাজ দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর সে দর্শনটাতে অবশ্যই প্রতিফলিত হচ্ছিল অবাধ বিচরণকারী ব্যক্তিতাবাদ, যা তখনকার দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দিচ্ছিল। অর্থনীতিবিদ আর তাদের দুর্বোধ তত্ত্বগুলো এবার একই সামাজিক আর বুদ্ধিগত বিকাশের অংশ হয়ে পড়লো যা স্টিফেন ফিল্ডের আইন বিষয়ক তত্ত্ব আর স্বীয় চেষ্টায় উন্নীত ব্যক্তির লোকাচারের জন্ম দিয়েছিল।

অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার ঃ আয় বন্টন

অবশ্য এটা মনে করা ছিক হবে না যে অর্থনীতিবিদ যাঁরা প্রান্তিক বিশেষণ ব্যবহার করেন, তাঁরা আয় বন্টনের (income distribution) সমস্যাটা উপেক্ষা করেছেন। মার্কসীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মোকাবেলায় নয়। শিল্পবাদী সমাজের এই পুরোহিতের দল যে তত্ত্বটা দাঁড় করালেন, তাতে তাঁরা প্রমাণ করেন যে উৎপাদনের সব কয়টি উপকরণ, অর্থাৎ শ্রম, জমি বা পুঁজির প্রত্যেকটিই নিজের মজুরী অর্জন করে, আর তার নির্ধারিত পরিমাণ হয় উৎপাদিত মূল্যে তাদের নিজের নিজের অবদানের সমান। কেউ অপর কাউকে শোষণ করতে পারে না আর তাই পুঁজিমালিকদের দ্বারা গ্রাস হচ্ছে, এমন কোন অনুপার্জিত উদ্বৃত্তও (unearned surplus) থাকতে পারে না, এবং আয়ের বন্টনের ব্যাপারে পূর্ণ ন্যায় বিচার হয়ে যায়। শ্রমিক যা অর্জন করে, তাই সে পায়, বেশীও নয়, কমও নয়।

আয় বন্টনের এই নতুন বিশ্লেষণের নাম দেয়া হলো প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্ব (Theory of Marginal Productivity)। প্রান্তিক উপযোগের তত্ত্বের মতই এটাও শেষ বা প্রান্তিক এককের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয় এবং এর প্রধান সিদ্ধান্তটা ছিল খুবই সহজ। শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী হলো তারা কয়টি জিনিস উৎপাদন করেছে তার শেষ এককের মূল্যের সমান। উদাহরণ স্বরূপ, মনে করা যাক, মাত্র একটি শিল্প কারখানা আছে আর তাতে উৎপন্ন হয় মাত্র একটি দ্রব্য। এই কারখানার শ্রমিকদের মজুরী দিতে হবে সেই হারে যেটা প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে চালু রয়েছে। ম্যানেজার তার শ্রমিকদের দলে লোক নিতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদিত বাড়তি দ্রব্য

www.pathagar.com

শ্রমিককে দেয় মজুরীর চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করা যাবে– অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়তি অর্জন (additional revenue) বাড়তি খরচের চেয়ে বেশী হচ্ছে। ম্যানেজার শ্রমিক নিয়োগ আর বাড়াতে চাইবে না, যখন সে দেখবে যে অধিক উৎপাদিত দ্রব্যটুকু তার জন্য এত 'বাড়তি অর্জন' আনছে না, যা দিয়ে নিয়োগকৃত বাড়তি শ্রমিকের মজুরী শোধ করা যাবে। কারখানাতে শ্রমিকের চাহিদা স্থির হচ্ছে সেই পর্যায়ে, যেখানে মজুরীটা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হবে। যদি নিয়োগকারী তার শ্রমিককে এই মূল্যের চেয়ে কম মজুরী দিতে চায় তবে অবশ্যই সেখানে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত অপর কোন কারখানায় সে কাজ নিতে পারে। এটা ছিল এক চমৎকার তত্ত্ব। শ্রমিক সমাজে যতটুকু অবদান রাখছে, তার চেয়ে সে একটুও বেশী বা কম পেতে পারে না। যদি তার উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হয়, মজুরী বেশি হবে, যদি সে আলসে বা অযোগ্য হয়, তার উপার্জন কম

একই তত্ত্ব কারখানার মনিবের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। পুঁজির থেকে অর্জিত মুনাফা এবং জমি থেকে অর্জিত খাজনা (rent) সম্পর্কেও প্রযোজ্য। উৎপাদনের পদ্ধতিতে ব্যবহৃত এই প্রত্যেকটি উপাদান একই অর্থনৈতিক সূত্রের আওতায় পড়ে। কারো পক্ষেই কাউকে শোষণ করা সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেকেই পাচ্ছে তার যোগ্যতা অনুসারে। এমন কি অর্থনীতিবিদরা প্রায় একশ বছর আগের এক সুইস গণিতজ্ঞের আবিষ্কৃত এক উপপাদ্যও পুনরুদ্ধার করলেন, যা থেকে প্রমাণ করে দেয়া হলো যে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণকে তাদের পাওনা দিয়ে দেয়ার পর আর হিসাবের বাইরে কোন উদ্বৃত্ত মূল্য অবশিষ্ট থাকবে না। মার্কসের মৃত্যু হলো।

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটা কতটা অকাট্য, সেটা নির্ভর করবে 'পর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা' (perfect competition) নামক ঐ তাত্ত্বিক 'নির্বাণ'টা আদৌ বাস্তবে আছে কিনা, তার উপর। এজন্য আরো প্রয়োজন যে উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপরকরণই যেন একটির সাথে আর একটি পূর্ণমাত্রায় এবং অবাধে বদল করা যায়, এবং উৎপাদনের পরিমাণ (level) বাড়া বা কমা না ঘটে। কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদই এই অত্যন্ত সীমাবদ্ধকর শর্তগুলো নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালেন না, অচিরেই তাঁরা পূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন অর্থনীতির তাত্ত্বিক জৌলুসে আত্মহারা হয়ে গেলেন। *

* অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন অর্থনীতিবিদ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ত্বটা কখনো স্বীকার করে নেননি। এই ভিন্নমত দলের একজন ছিলেন আলফ্রেড মার্শাল।

www.pathagar.com

উন্নতি আর মন্দা ঃ ব্যবসায়ের চক্র

যেখানেই বড় ধরনের শিল্পোন্নয়ন এসেছে, সেখানেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে চক্রাকারে পালাক্রমে একবার করে উন্নতি (prosperity) আর একবার করে মন্দা (depression)। যে প্রক্রিয়ার মাঝে প্রায়ই লক্ষ্য করা গিয়েছে অর্থবিনিয়োগ আর ব্যবসায়ে আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে একবার করে 'সংকটের' (crisis) অবস্থা। যদিও এই ভেঙ্গে পড়ার অবস্থাতে তীব্রতা কখনো বেশী আর কখনো কম হয়েছিল, কিন্তু দৃশ্যতঃ ঘটনাটা যে কেন একটা নিয়ম মাফিক ঘটেছে, তার একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে আর্থিক সংকট এবং তার পর অর্থনৈতিক অবস্থায় মন্দা দেখা যায় যথাক্রমে ১৮১৫, ১৮২৫, ১৮৩৬, ১৮৪৭, ১৮৫৭, ১৮৬৬, ১৮৭৩, ১৮৮২, ১৮৯০ এবং ১৯০০ সনে। যুক্তরাষ্ট্রে সংকটগুলো কিছুটা কম ঘন ঘন ঘটেছে, সম্ভবতঃ বিরাট স্থল সীমান্ত থাকার ফলে, কিন্তু সেখানেও তা সংখ্যায় অনেকঃ ১৮১৯, ১৮৩৭, ১৮৫৪, ১৮৫৭, ১৮৭৩, ১৮৮৩ এবং ১৮৯৩ সনে। এছাড়া, গোটা পৃথিবীতেই তিনটি 'মহা-মন্দা' ঘটেছে, 'ক্ষুধার্ত চল্লিশের' দশকে, ১৮৭০ দশকে এবং ১৮৯০ দশকে।

প্রথম প্রথম সমস্যাটি উপেক্ষা করা হয়েছে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ (classical economists) এবং নয়া-প্রাচীন দল (neoclassical group) যাঁরা আসেন ১৮৭০-এর পর, এই উভয় দলই সে'র বাজার সম্পর্কিত সূত্রের সাধারণ প্রস্তাবগুলো মেনে নিয়েছিলেন, যে অনুসারে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার পুনরাবৃত্তি হবার কথা নয়, এবং তাতে বলা হয়েছিল যে ক্রমেই অধিক উৎপাদন এবং কর্মনিয়োগ সহ অর্থনীতি অবিরাম তার কাজ করতে থাকবে। অল্প কয়েকজন, যাঁরা ব্যবসা-চক্রের সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান করেন তাঁরাও এর কারণ খোঁজেন উৎপাদন আর বন্টন ব্যবস্থার বাহিরে, যেহেতু সে'র সূত্র বলেছিল যে চাহিদার সৃষ্টি হয় উৎপাদনের দ্বারাই এবং মোটের উপর ওই দুটো কখনো পরস্পর থেকে ধাপ ছাড়া হতে পারে না।

১৮৬০-এর দশকে শুরু করে দুজন ইংরেজ এবং ফরাসী (যাঁরা মূলতঃ সংখ্যাতাত্ত্বিক ছিলেন, অর্থনীতিবিদ নন) পণ্ডিত সর্বপ্রথম অর্থনীতির উঠা-নামার ব্যাপারটা যে কিছুদিন পর পর পুনরাবৃত্তিমূলক, এই সত্যটা যাচাই করলেন। তাঁরা প্রায় দশ বৎসর মেয়াদী কয়েকটি চক্র সনাক্ত করেন এবং এর কারণ সম্পর্কেও কিছু চিন্তা-ভাবনা করলেন। ইংল্যাণ্ডে স্ট্যানলী যেভনস্ ছিলেন

www.pathagar.com

সামান্য কয়জন অর্থনীতিবিদদের একজন, যাঁরা এই সমস্যার দিকে বিশেষ নজর দেন এবং তাঁর মতে 'ব্যাপক অনিয়মিত উঠা-নামার' কারণ ছিল কৃষির পরিবর্তনশীলতা, অতিরিক্ত বিনিয়োগ বা ফাটকাবাজারী, যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অশান্তি কিম্বা "অন্যান্য আকস্মিক ঘটনাবলী বা আমাদের হিসাবের বাইরে এবং যা বিবেচনা সম্ভব হয় না"। পরে যেভনস্ একটি তত্ত্ব (theory) দাঁড় করান, যা সে'র অনুসারীদের পক্ষেই যায় এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। সূর্যের কলঙ্ক (sun spot) এবং ব্যবসায়ের উঠা-নামার মধ্যে একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক (statistical correlation) পাওয়ার পর তিনি ১৮৮৪ সনে লেখেনঃ

"এটা সম্ভব মনে হচ্ছে যে ব্যবসায়ের সঙ্কটটা কিছুকাল পর পর পৃথিবীব্যাপী যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে, এবং সম্ভবতঃ দশ বৎসরের কিছু সময় পর পর সূর্য কিরণের উত্তাপে যে বৃদ্ধি ঘটে থাকে, সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত।"

কিন্তু ব্যবসায়ের চক্র সরকারের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করছিলো, এবং প্রশাসনে নিয়োজিত রাষ্ট্রনীতি প্রণয়নকারী ভাবপ্রবণতাহীন প্রশাসকদের প্রয়োজন হলো তথ্যের। সরকারের লোকেরাই তথ্যের বিশ্লেষণে বসে গেল। ১৮৮৬ সনে যুক্তরাষ্ট্রের কমিশনার অব লেবার ক্যারল রাইট তাঁর প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে ব্যবসার বিনিয়োগকে অর্থনীতির সর্বাধিক অস্থিরতা প্রবণ উপাদান বলে সনাক্ত করলেন। প্রাকৃতিক ঘটনা, যুদ্ধ আর ফাটকাবাজারী সংকটের কোন কারণ নয়ঃ অপরাধী পাওয়া গিয়েছে, আর সেটা হলো পুঁজি হিসেবে যন্ত্রপাতিতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ। দুঃসময় আসে, তখন বিনিয়োগের সুযোগ হ্রাস পায়। বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর এই জোর দেয়াটা কয়েক বৎসর পরে রাইটের ইংরেজ প্রতিরূপ, বোর্ড অব ট্রেডের কমিশনার অব লেবার স্যার হুবার্ট লিউইলিন স্মিথের কথাতেও প্রতিধ্বনিত হলো। স্মিথ ১৮৯৫ সনে পার্লামেন্টের নিকট তাঁর রিপোর্টে বল্লেন যে অর্থনৈতিক অস্থায়ীত্বটা কয়েকটি শিল্পে কেন্দ্রীভূত, যেমন যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ধাতু উৎপাদনকারী শিল্প, জাহাজ নির্মাণ এবং খনি শিল্প, যেগুলোর প্রত্যেকটিতেই বিনিয়োগে "বাড়া-কমার তীব্র দোলন" লক্ষ্য করা যায়। অর্থনীতির অন্যান্য খাত তুলনামূলকভাবে অধিক স্থিতিশীল আর সেখানে উঠা-নামাটা মাত্র ঐ অস্থিতিশীল শিল্পগুলোর বড় বড় পরিবর্তনেরই প্রতিফলন।

সরকারী কর্মচারীদের এইসব অনুসন্ধান অবশ্য অর্থনীতিবিদদের বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি, তাঁরা তখনো সে'র সূত্র থেকে পাওয়া পথটাই অনুসরণ

www.pathagar.com

করে চলেছেন। ঐ সূত্রের সর্বোত্তম এবং পরিপূর্ণ আলোচনা অনুসারে সুদের হারটাকেই অর্থনীতির একটি স্বয়ংক্রিয় সুস্থিতকারী (automatic stabilizer) হিসেবে ব্যবহার করা উচিত, কারণ সুদের হার এমন একটা উপকরণ যা সঞ্চয়কে বিনিয়োগের দিকেও পরিচালিত করে আর সেই সাথে খরচের সরল প্রবাহ ভাঙ্গার সম্ভাবনাও রোধ করে। কিন্তু যেহেতু স্পষ্টতই ভাঙ্গার ব্যাপারটা ঘটছেই, আর যেহেতু সুদের হার হচ্ছে অর্থবিষয়ক ব্যবস্থার (monetary system) একটি অংশ, অসুবিধার কারণগুলোর জন্য ঐ খাতের দিকে নজর দেয়াটাই স্বাভাবিকঃ উৎপাদন এবং বন্টন দুটোই সুস্থ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও অর্থবিষয়ক ব্যবস্থায় সমস্যা থাকা সম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দিকে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত হতে শুরু করলো যে টাকার সরবরাহে অনভিপ্রেত সম্প্রসারণের দ্বারাই ব্যবসায়ের চক্র ঘটে থাকে। সহজ ঋণ নীতি সুদের হার নামিয়ে ফেলবে, যার ফলে অতিরিক্ত বিনিয়োগ ফাটকাবাজারী উৎসাহিত করবে। অর্থনীতিতে যদি একবার মাত্রাতিরিক্ত সম্প্রসারণ ঘটে, তবে একটা সংকট অবধারিত, কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক তৎপরতায় অপ্রয়োজনীয় উৎপাদন-ক্ষমতা বা আশাবাদের ঝোঁকে সৃষ্টি করা বিপুল ঋণ কোনটাই কাজে লাগবে না। সংকটটা একবার শুরু হলে অর্থনীতিতে দাম আর বিবেচনাহীন সম্প্রসারণকে আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত ভোগান্তি পোহানো ছাড়া আর কোন পথ নাই।

এই সব দুভাগ্যজনক ঘটনাপ্রবাহ যাতে শুরু হতে না পারে সে জন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা হচ্ছে অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাটা ঠিকমত পরিচালন করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপযুক্ত কর্মপন্থার দ্বারা ঋণের সম্প্রসারণ শুধু ব্যবসার সত্যিকারের প্রয়োজন মিটানোতে সীমাবদ্ধ রাখলে ঘটনার শুরু হওয়া রোধ করা বা ঘটনা বন্ধ করাও সম্ভব ছিল, যাতে উদ্ভূত সমন্বয় সাধনের সময়টা কম করে ফেলা বা হাল্কা করে ফেলা যেতো। অর্থ বিষয়ক ব্যবস্থায় এবং ঋণ ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা গোটা অর্থনীতিতেই স্থিতিশীলতা আনতে পারে।

এই তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে লেখা হয় ১৮৭৩ সনে, ওয়ান্টার ব্যাগ্‌হট্ নামে একজন ইংরেজ কর্তৃক টাকার বাজার সম্পর্কিত এক বিখ্যাত গ্রন্থে, যার নাম "লোম্বার্ড স্ট্রিট"। শতাব্দীর শেষ নাগাদ অলিভার এম. ডব্লিউ স্প্রাগ্ এটা হার্ভার্ডে ক্লাসে পড়াতেন আর সেই ক্লাসের একজন ছাত্র ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন. ডি. রুজভেল্ট্ (যিনি পড়াটা ভালই বুঝেছিলেন, কিন্তু এর কার্যকারিতায় সন্দেহ থাকায় তিনি

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের কর্মনীতি হিসেবে তা বর্জন করেন)। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের পরিচালকদের কাছে ১৯১৪ সনে এটাই ছিল তাদের কাজের তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই তত্ত্ব মনে রেখেই ১৯২৯ সনে শেয়ার বাজার ভেঙ্গে পড়ার (stock market crash) পর প্রেসিডেন্ট হারবার্ট হুভার বলেন, দেশের সর্বপ্রধান কারবার—অর্থাৎ উৎপাদন এবং বন্টন—উত্তম অবস্থায়ই আছে। তিনি অর্থ এবং ঋণ ব্যবস্থার নাম উল্লেখ করলেন না, যেটা নিঃসন্দেহে উত্তম অবস্থায় ছিল না এবং যেটার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ব্যাংকগুলো আর রেল রোডকে (বড় বড় সব ব্যাংক বিপুল পরিমাণে যাদের বন্ড কিনেছিল) ঋণ দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হ্রাস করেন। কিন্তু সে'র বাজার সূত্র (Say's Law of Markets) এবং তা থেকেই পাওয়া ব্যবসাচক্রের তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিরোধটা হুভারের কর্মপন্থা কার্যকর করার ফলে একেবারে পরিষ্কার হয়ে উঠলো। ১৯২৯ সনে উৎপাদন আর বন্টনের স্বাস্থ্য উত্তম ছিল না, অথচ ঐ খাতগুলোতে রোগ বা তার প্রতিষেধক খুঁজে বের করার প্রয়োজনটাই তত্ত্বে অস্বীকার করা হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

এই নয়া-প্রাচীন বা নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির একটা উত্তম বৈশিষ্ট্য ছিল এর যুক্তিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Scientific Method) ব্যবহার, যেমনটি করা হয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য। একটা কঠোর নিয়মের মাধ্যমে বিশ্লেষণ বুদ্ধিজীবী মহলে অর্থনীতির জন্য এমন সন্মান এনে দিলো, যা সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে ইতিপূর্বে কোথাও সম্ভব হয়নি। এই নিয়মের কয়েকটি উপাদান ছিলঃ বিশ্লেষণের কঠোর নিয়ম, গাণিতিক যুক্তি এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা। এই সম্মিলন অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক আচার ব্যবহার সম্পর্কে এমন সব 'সূত্র' বিকাশে এবং সরকারের কর্মনীতি (Public Policy) বিষয়ে এমন সব ব্যবহারবিধি প্রস্তুতে সহায়তা দিল, যাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের একটা আভাস প্রকাশ পেল।

এ্যাডাম স্মিথের প্রাথমিক বর্ণনাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতামূলক বাজার তত্ত্বে বিশ্লেষণের কঠোর শৃঙ্খলা এনেছেন মেন্‌গার, ওয়ালরাস, এবং মার্শাল। শুরুতে মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে ধরে নেয়া হয় যে প্রত্যেকেই সর্বাধিক লাভ পেতে চায়। এক দল যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে সমাজে যদি প্রত্যেকেই নিজের জন্য সর্বাধিক অর্জন করতে পারে, তবে গোটা সমাজের জন্যও সর্বাধিক লাভ অর্জিত হলো। দ্বিতীয় এক দল যুক্তির দ্বারা প্রত্যেক বাজারে

www.pathagar.com

চাহিদা, সরবরাহ এবং দাম বিশ্লেষণ করে দেখাল, উৎপাদন কিভাবে খরিদ্দারের চাহিদা অনুসারে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এই প্রক্রিয়ায় বোঝানো হয় যে উৎপাদনকারীরা যতটা সম্ভব কম খরচে জিনিস উৎপাদন করতে চায়, তাই খরিদ্দার যে পরিমাণ জিনিস চায়, তার সাথে অবশ্য সমন্বয় সাধন করিয়েই সার্বক্ষণিক সরবরাহ বজায় রাখতে হবে। তৃতীয় আর এক দল যুক্তি দিয়ে দেখালো, কি ভাবে বাজারে বিভিন্ন অংশ এক সূত্রে, সেলাইহীন একটা (মাকড়সার) জালের মত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত, আর তাতে সৃষ্টি হয়েছে একদিকে সর্বোচ্চ লাভ এবং অপর দিকে সর্বনিম্ন ব্যয় এই দু'টির দ্বারা এক সাধারণ ভারসাম্য ব্যবস্থা।

এই মৌলিক ছাঁচটাতে (basic model) পরে যোগ করা হয় সর্বাপেক্ষা অনুকূল ফল লাভের (optimal results) জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, যে কাজের নেতৃত্ব দেন ভিল্‌ফ্রেডো প্যারেটো (১৮৪৮-১৯২৩) নামক একজন ইটালীয় অর্থনীতিবিদ, অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা আর একচেটিয়া কারবারের তত্ত্ব গড়ে উঠে যাঁদের হাতে, তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য জোয়ান রবিনসন (ইংরেজ, জন্ম ১৯০৩), এডোয়ার্ড, এইচ, চেম্বারলেইন (মার্কিন, ১৮৯৯-১৯২৩) এবং হাইন রাইখ্ ফন স্ট্যাকেলবার্গ (জার্মান, ১৯০৫-১৯৪৬)। এছাড়া শিল্পোদ্যোগ (entrepreneurship)-এর নতুনের প্রবর্তন (innovation) বিষয়ক ধারণা প্রণয়ন করেন জোসেফ. এ. শুম্‌পেটার (অস্ট্রিয়, ১৮৮৩-১৯৫০)। যাঁরা আরো অধিক জানতে চান, তাঁদের জন্য এই কয়টি প্রধান বিকাশধারার উল্লেখ করা হলো মাত্র। এই অর্থনীতিবিদদের দ্বারা যে একটা কেন্দ্রীয় মডেল বা ছাঁচ সামনে রেখে তা থেকে এত বিভিন্ন দিকে চিন্তাধারা প্রসার করা সম্ভব হয়, যে তাতে পরিষ্কারভাবে অর্থনীতি শাস্ত্রে একটা অভিনবত্বের আকর্ষণ সৃষ্টি হলো।

বিশ্লেষণে ব্যবহৃত এই মডেল যে নিয়মের কঠোরতা পেয়েছিল, সেটা আসে এর তাত্ত্বিক গঠনের সরলতা থেকে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সীমানা পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলো, একটা স্বয়ং-সমন্বয়কারী (self adjusting) বাজার-ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে। পরিবার, ধর্ম বা রাষ্ট্রের জটিল সামাজিক গঠনগুলোর কারণে এতে কোন জটিলতার সৃষ্টি করা হলো না এবং নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা এগুলির বড় একটা উল্লেখ করলেন না। মডেলের চালক শক্তিটাও ছিল খুব সহজঃ মানুষের সঞ্চয়শীল স্বভাব, যেটাকে একটা সার্বজনীন ধ্রুবক (constant) হিসেবে ধরে নেয়া হলো। এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলো একটা সার্বজনীন যুক্তিযুক্ততা আর প্রয়োগ সম্ভাবনারা অলৌকিক আভা লাভ করলো। নিউটনীয়

www.pathagar.com

পদার্থবিদ্যার মত, এন্ড হলো একটা সীমিত জগৎ, যেখানে অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলো গড়ে তুলেছে এক স্থিতিশীল ভারসাম্য।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোর মত অর্থনীতিও গবেষণাগারের অভ্যন্তরে পরীক্ষার কার্যপ্রণালী গ্রহণ করলো, কিন্তু তা শুধু তাত্ত্বিক অনুশীলনের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। প্রধান ধারণাটা এই যে একটা স্থির বা ভারসাম্য অবস্থা নিয়ে শুরু কর, একটি করে চলকে (variable) পরিবর্তন ঘটাও, অন্য সবগুলোকে অপরিবর্তিত রাখ, আর এ থেকে ফলাফলটা লক্ষ্য কর এবং বিশ্লেষণ কর। উদাহরণ স্বরূপ, রসায়ন শাস্ত্রে যেমন একটা স্থায়ী যৌগিক পদার্থে একটা এসিড ঢালা হয় বা একটা রাসায়নিক পদার্থ উত্তপ্ত করা হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেও এই পদ্ধতিতেই শুরু করতে হবে একটা স্থিতিশীল ভারসাম্য বাজার (Static Market Equilibrium) থেকে, তাতে একটা পরিবর্তন ঘটানো হলো, আর এর ফলে নানা ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত অনেক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে হবে, এবং শেষ পর্যন্ত আর একটা নতুন স্থিতিশীল ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্টি হবে বাজারে। ঘটিয়ে দেয়া পরিবর্তনটা কোন বস্তুর চাহিদা বৃদ্ধি, একটা কর বসানো বা সস্তায় উৎপাদনের একটা উপায় আবিষ্কারও হতে পারে। যে পরিবর্তনই ধরা হোক, অর্থনীতিবিদকে তার বিশ্লেষণকারী মডেল বা ছাঁচের মাধ্যমে কাজ করে সম্ভাব্য ফলাফল বা সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। এই প্রণালীটা ভারসাম্যের আংশিক বিশ্লেষণ (Partial Equilibrium Analysis) নামে পরিচিত হলো, (কারণ এ ক্ষেত্রে মাত্র একটি চলকেই পরিবর্তন হতে দেয়া হচ্ছে) অনেকে এটাকে তুলনামূলক স্থিতাবস্থাও (Comparative Statics) বললো (কারণ এখানে একটি 'স্থিতিশীল ভারসাম্য অবস্থা'র সাথে আর একটির তুলনা করা হচ্ছে)।

সাংকেতিক যুক্তি আর গাণিতিক প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অনেক সুবিধা হয়েছিল। দুই জন ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড যখন 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা'তে (১৯১০–১৯১৩) দেখালেন যে পূর্বাহ্নে ধরে নেয়া সংজ্ঞা থেকে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের দ্বারা কোন রকম বিভ্রান্তি বা দুর্বোধ্যতা ছাড়াই নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব, তখন মনে হলো যে প্রাচীন কালে এরিস্টটল যে গোড়ার ভূমিকা থেকে শুরু করে ক্রমে পূর্ণাংগ সিদ্ধান্তে পৌছানোর আদর্শের কথা বলেছিলেন, সেটা অবশেষে বাস্তবায়িত হতে পারলো। পরবর্তীকালের যুক্তিভিত্তিক সকল বিশ্লেষণেই তাত্ত্বিক মডেলগুলো অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হলো। ইতিপূর্বে প্রকাশিত আরভিং

www.pathagar.com

ফিশারের 'ম্যাথেম্যাটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন্‌স ইন্টু দি থিওরী অব ভ্যালু এন্ড প্রাইস' (১৮৯২) এবং ফ্রান্সিস ওআই. এজওয়ার্থের 'ম্যাথেম্যাটিক্যাল সাইকিক্‌স্' (১৮৮১)-এর নতুন বিশ্লেষণমূলক যুক্তিবিদ্যার ভিত্তিতে অর্থনীতির মূল উৎপাদনগুলোকে পূনর্বিন্যাসের জন্য আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগলো।

অবশ্য, যেমনটি যে কোন নতুন নিয়ম বিষয়ক বিজ্ঞানের (methodology) ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তেমনি কয়েকজন সমালোচক সঙ্গে সঙ্গে ভুল বের করতে লেগে গেল। নতুন নিয়ম বিষয়ক বিজ্ঞানটাকে আদতে নিউটনের পদার্থবিদ্যার মত স্থিতিয় (static) বলে সমালোচনা করা হলো এবং বলা হলো যে সেই কারণেই যে অর্থনীতিতে নিরন্তর পরিবর্তন আর অস্থিতিশীলতা চলছে, তার বিশ্লেষণে এ পদ্ধতি খুব একটা কাজে লাগবে না। এতে সার্বজনীনভাবে একটাই মানব প্রকৃতি আছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে-অর্জনেচ্ছু (acquisitive) হিসেবী মানব প্রকৃতি— যেটাকে বিকৃত বর্ণনা বলে আক্রমণ করা হলো। যেহেতু অর্থনীতির সাংগঠনিক কাঠামোর কোন রকম পরিবর্তন করার উপায় নেই, সুতরাং "অপর সব কিছুই যেমন ছিল, তেমনই থাকবে" (ceteris paribus) ধরে নিয়েই সিদ্ধান্ত করা হয়। আর তা ছাড়া একটি ভারসাম্যের অবস্থা থেকে আর একটি ভারসাম্যের অবস্থায় যেতে ঠিক কতটা পরিবর্তন ঘটেছে, তা স্থির করার কোন উপায় নেই। সংক্ষেপে, সমালোচকদের বক্তব্য ছিল যে বিশ্লেষণের ধারণাগুলো (analytical concepts) সীমাবদ্ধ, অবাস্তব আর সংখ্যায় ব্যক্ত করা নয়।

এই সমালোচনার ফলে নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির নিয়ম-কানুনে শেষ আর একটি উপাদান আসলো পরীক্ষামূলক অনুশীলন (empirical studies) দ্বারা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলাফলগুলোর সত্যতা যাচাই করে নেবার বা তা বাতিল করে দেবার ব্যবস্থা। তত্ত্ব থেকে একটা প্রকল্প (hypothesis) পাওয়া যাবে যেটা প্রমাণ সাপেক্ষে সত্য বলে ধরে নেয়া হবে এবং তারপর পরীক্ষামূলক অনুশীলন দ্বারা ঐ প্রকল্পের সত্যতা যাচাই করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মোটর গাড়ির দাম বাড়লে গ্যাসোলিনের বিক্রয় হ্রাস পাবে, এই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ অথবা বাতিল করার জন্য মোটর গাড়ির দাম আর গ্যাসোলিনের চাহিদার সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুশীলন (statistical studies) করা যায়। এ জন্য অবশ্য একটা প্রয়োজনীয় শর্ত এই যে তাত্ত্বিক ধারণাগুলো পরীক্ষিত হবার উপযোগী হতে হবে।

www.pathagar.com

নিয়মটা এবার সম্পূর্ণতা পেলো। গাণিতিক যুক্তির দ্বারা বিশোধনকৃত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পরীক্ষার উপযোগী কতকগুলো প্রস্তাবমূলক বিবৃতি (propositions) দেবে। তারপর সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুশীলন হয় ঐ প্রস্তাবগুলো যাচাই করে নেবে, নয়তো সেগুলো সংশোধন করে দেবে, যা থেকে পাওয়া যাবে বাস্তবের নিকটতর অধিক বিশুদ্ধ প্রস্তাবমূলক বিবৃতি। এইভাবে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোর মতই জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরো বেশী করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পুঁজিবাদের চিন্তাধারা

নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করলেও এর কিছু বলিষ্ঠ ভাববাদী (ideological) নিহিতার্থও ছিল। তাত্ত্বিক ছাঁচে ধরে নেয়া হয়েছিল যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এমন একটি কাঠামো রয়েছে, যাতে ব্যক্তিরা একটি স্বয়ং নিয়ন্ত্রণশীল বাজার ব্যবস্থায় নিজেদের কাজ করছে। এ হলো একটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রধান অর্থনীতির চিত্র, যাতে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে উৎপাদন হচ্ছে, সুতরাং কল্যাণ সর্বাধিক পর্যায়ে থাকছে, উৎপদিত সামগ্রী ন্যায়সংগতভাবে বন্টন হচ্ছে এবং অর্থনীতি সাধারণতঃ পূর্ণ–কর্মনিয়োগ (full-employment) পর্যায়ে কাজ করছে। সঞ্চয় আর পুঁজি সংগঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে উন্নতি উৎস। মডেলটা আদতে সেই অ্যাডাম স্মিথের আমলেরই, কিন্তু এ থেকে মূল্যের শ্রম তত্ত্বটা বাদ দিয়ে, ব্যক্তিতাবাদ দর্শনের সাথে একে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ক নতুন চিন্তা কিছু মিশিয়ে এর আধুনিকীকরণ করা হয়েছে মাত্র।

স্পেন্সার, সুমনার, ফিল্ড এবং কার্নেগীর 'সামাজিক ডারউইনবাদের' মত কিন্তু নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি সরকারী হস্তক্ষেপ বিরোধিতাটার বিষয়ে অতটা কড়াকড়ির পক্ষে ছিল না। ব্যতিক্রমের একটা প্রধান ক্ষেত্র ছিল অর্থ–বিষয়ক কর্মকাণ্ড, যাতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সরকার টাকার সরবরাহের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রেও কর্মপন্থার দায়িত্বটা বেশ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিলঃ অর্থ–বিষয়ক নীতিটা ছিল এই যে ঋণের সম্প্রসারণ শুধু ব্যবসায়ের প্রকৃত প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে অর্থাৎ উৎপাদন আর বন্টনের প্রয়োজনে যেটুকু দরকার তাই করা হবে মাত্র। অর্থনীতির এই দুটি দিক সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া কেবল বাজার ব্যবস্থার অবাধ ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, অর্থ বিষয়ে

www.pathagar.com

যেটুকু সামান্য হস্তক্ষেপ মেনে নেয়া হয়েছিল, তা নির্দেশিত হবে খোলা বাজারের দ্বারাই।

অধিকাংশ নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অন্যান্য শ্রেণীর সরকারী হস্তক্ষেপও সমর্থন করেছিলেন। এর একটি উদাহরণ হলো প্রতিযোগিতা রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা, যা এ দেশে (যুক্তরাষ্ট্রে) "অ্যান্টি ট্রাস্ট" আইন নামে পরিচিত। যেহেতু তাঁদের তত্ত্বগুলো ছিল 'সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা'র ভিত্তিতে রচিত, অর্থনীতিবিদরা যখন স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসা (natural monopolies) নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এবং ব্যবসার বাধা অপসারণের জন্য আইনের পক্ষে যুক্তি দেখান, তখন অন্ততঃপক্ষে তাঁদের যুক্তিগুলো সংগতিপূর্ণই বলতে হবে। অবশ্য প্রতিযোগিতার এবং একচেটিয়া বিরোধী আইনের সমর্থনে তাঁদের দায়িত্ববোধটা পরিপূর্ণ ছিল না। কোন কোন অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখান যে বেসরকারী একচেটিয়া ব্যবসা সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়াও এক সময় নিঃসন্দেহে তাদের ক্ষমতা হারাবে, কারণ অন্য ব্যবসায়ীরাও সব সময় ঐ অত্যধিক লাভের একটা ভাগ পাবার চেষ্টা করে যাবে। অন্যেরা এ ব্যাপারে আস্তে চলার পক্ষে ছিলেন এই আশঙ্কায় যে ট্রাস্ট বিরোধী কাজ হয়তো বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলোও হ্রাস করতে পারে। এই ধরনের কিছু কিছু মৃদু আপত্তি ছাড়া অবশ্য প্রতিযোগিতার সুবিধাগুলোর উপর তাঁরা বরাবরই সংগতিপূর্ণভাবে জোর দিয়ে এসেছেন এবং সেই জোর দেয়াটা আজও বজায় রাখা হয়েছে।

আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ মেনে নেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হেনরী সিজ্‌উইক নামে একজন প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ১৮৮৬ সনে বৃটিশ এসোসিয়েশন ফর দি এড্‌ভান্‌সমেন্ট অব সায়েন্স-এর অর্থনৈতিক শাখায় পঠিত এক প্রবন্ধে "সরকারী হস্তক্ষেপ না করার নীতির কয়েকটি অর্থনৈতিক ব্যতিক্রমের" এক তালিকা দেন। ঐ তালিকায় নৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে কতকগুলো কাজের উল্লেখ করা হয়, যেমন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ন্ত্রণবিধিসমূহ, চেতনানাশক (narcotics) এবং মাদক দ্রব্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ, জুয়াখেলার উপর বাধানিষেধ; শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা; যেসব ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য সমাজের পূর্ণ অংশ গ্রহণ প্রয়োজন, যেমন জনস্বাস্থ্য বিধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ; যেসব সেবার সুফল সকলেই পায় এবং যেগুলোর জন্য কোন ব্যক্তিকে মূল্য দিতে বলা যায় না, যেমন পর্বতময় উপকূলে লাইট হাউস নির্মাণ বা কোন কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আধুনিককালে মানুষের কাছে এই সব ব্যতিক্রম বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার

www.pathagar.com

বলে মনে হয় না, কারণ তারা বিগত এক শত বৎসরের ক্রমবর্ধমান সরকারী কার্যকলাপ দেখতেই অভ্যস্ত, কিন্তু তারা তবুও এটুকু বলে যে, নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির অনেক কিছুই বর্তমান প্রয়োজনের খাতিরে তাদের করতে হয়েছে এবং সমালোচকেরা যে কখনো কখনো এটাকে একেবারে ব্যক্তিতাবাদ বা "লেজে ফেরে"র (individualism or laissez faire) জয়-গান বলে বর্ণনা করে, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের অনেকেই তাঁদের শাস্ত্রটাকে সংস্কারের জন্য একটা বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিসঙ্গত পন্থা বলে মনে করতে পারতেন।

অবশ্য এই নয়া অর্থনীতির যথেষ্ট ভাববাদী তাৎপর্য ছিল। এ ছিল মার্কস্‌বাদের একটা পূর্ণাংগ উত্তর। যে ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মূল্যের শ্রমতত্ত্বটা ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিগত সম্পদের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য, মার্কস্ ঐ তত্ত্বটাই ব্যবহার করেছেন তাঁর শোষণতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে। মার্কস্ যখন পুজিঁবাদের উপর তাঁর বিধ্বস্তকারী আক্রমণটা লিখেই ফেললেন, তখন এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল যে চালু ব্যবস্থার জ্ঞান-তত্ত্ব থেকে ঐ "মূল্যের শ্রমতত্ত্বটা" একদম ফেলে দিতে হবে, আর তা করবার প্রয়োজনেই 'নতুন' মূল্যতত্ত্বের 'আবিষ্কার' আর দ্রুত বেগে তার স্বীকৃতিও আসলো।

এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, ১৮৭০-এর দশকে নয়া অর্থনীতির বিকাশের ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখার মত বিষয়। এ থেকে মনে হয় যে, কোন মত বা ধারণা 'ঠিক' বলেই তা গ্রহণ করা হয় না, আবার 'ভুল' বলেই তা বর্জনও করা হয় না, বরং ওটা গ্রহণ করা হয়, যখন তা কাজে লাগে, আর বর্জন করা হয় যখন তার দরকারটা ফুরিয়ে যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, মূল্যের শ্রম তত্ত্বটা অর্থনৈতিক চিন্তা জগতের স্বীকৃত কায়দা কানুনের অংশ হিসাবে থাকতে পেরেছিল, যতক্ষণ, এটাকে পুঁজিবাদের ভাবাদর্শ হিসেবে ব্যবহার করা চলছে। যখন মার্কস্ এর প্রয়োজনীয়তাটা ধ্বংস করে দিলেন, তখন ওই তত্ত্ব বাতিল করে সেই জায়গার প্রান্তিক উপযোগের তত্ত্ব প্রতিস্থাপন করা হলো, কারণ এটার দ্বারা মুক্ত বাজারের তত্ত্বের সমর্থন করা হয় এবং মার্কস্‌বাদীদের উত্তম-মধ্যম দেখা যায়।

নিঃসন্দেহে এই নতুন তত্ত্ব মার্কসের যুক্তি খণ্ডন অপ্রয়োজনীয় করে ফেললো, কারণ এর দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ভিত্তিক পুঁজিবাদের তত্ত্ব নতুন ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হলো। অস্ট্রিয় অর্থনীতিবিদ ইউজিন ব্যোম্ বাওয়ের্ক (১৮৫১-১৯১৪) ১৮৮৪ সনে যেভাবে দেখালেন, তাতে মার্কসের

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ বিশ্লেষণটাই অপ্রাসংগিক হয়ে গেল। কার্ল মেন্‌গারের এই শিষ্যটি প্রায় সারা জীবনই বিশদভাবে মার্ক্সের প্রতি আক্রমণেই ব্যয় করেন, কিন্তু বরাবরই তিনি মনে করতেন যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ যুক্তি এই যে মূল্যের শ্রমতত্ত্বটা একদম নিরেট ভুল। ইংল্যান্ডে ফিলিপ উইক স্টিড্ (১৮৪৪–১৯২৭) প্রায় একই সময়ে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌছান, তিনি লেখেন যে পুরো মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণটাই অচল, কারণ এটা রচিত হয়েছিল শ্রমের ভিত্তিতে, উপযোগের ভিত্তিতে নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সকল গোঁড়া অর্থনীতিবিদদের ঐক্যমত প্রতিধ্বনিত হয়েছে আর একজন অস্ট্রিয়, ফ্রেড্‌রিক ভন ওয়েইজারের (১৮৫১–১৯২৬) কথায়, যিনি মার্কসীয় উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বটা এই ভাবে বাতিল করে ছিলেন।

"এই যুক্তিটা চূড়ান্ত কিছু নয়, অন্য কোন কারণে না হলেও, অন্ত:ত শুধু এই কারণে যে, এটা খাড়া করা হয়েছে শ্রম তত্ত্বের উপর, যেটা জাতীয় অর্থনীতির উন্নত অবস্থায় আর সত্য বলে মেনে নেয়া চলে না।"

পুঁজিবাদের চিন্তাধারা তার প্রথম বিরাট সংকটটা কাটিয়ে উঠলো আর নতুন ভিত্তিতে তা পুনর্গঠন করা হলো।

www.pathagar.com

৮

মানব পরিবার

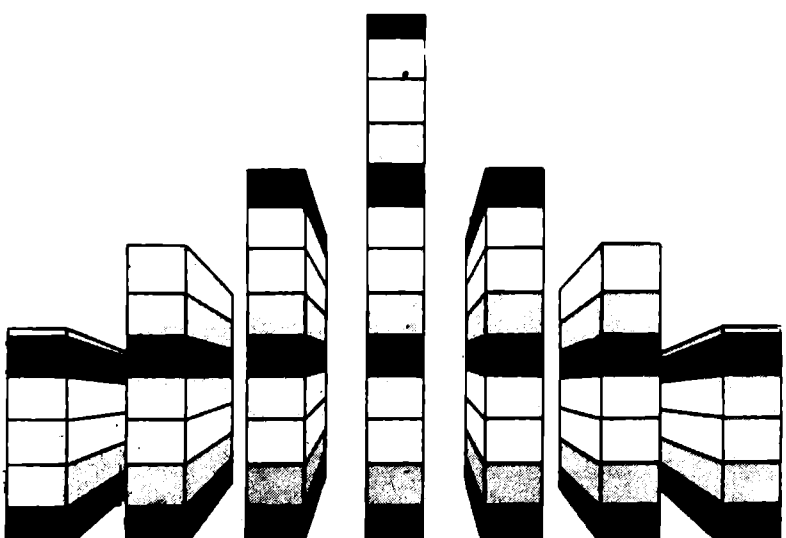

মার্কস্‌বাদের অভ্যুদয়ের পর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিতর্কের সব চেয়ে বড় বিষয় হয়ে উঠে সমাজতন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র। চরমপন্থী ডারউইনীয় ব্যক্তিতাবাদ এবং নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির আপোষকামিতা দুই বিরোধী

www.pathagar.com

পক্ষের দূরত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সামাজিক চিন্তাধারার ধরন কখনোই সহজ হয় না। মতাদর্শ নিয়ে যে কোন বিতর্কে দুই বা তিনটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে এবং অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে উপযুক্ত সংগঠন কি হওয়া উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতাদর্শ সৃষ্টি হলো, যাতে সমস্যাটির অন্যান্য দিকের কথাও উঠে পড়ে। প্রশ্নটা একদিকে জাতীয়কৃত সম্পদ আর পরিকল্পনা এবং অপরদিকে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পদ আর প্রতিযোগিতামূলক কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে মাত্র সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঐ দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্তী স্থলে সম্ভাব্য নানা রকমের আপোষের উপায় কল্পনা করা যেত। অন্যান্য পথ, প্রশ্নটির ভিন্নতর সমাধানও প্রস্তাবিত হলো।

মধ্যপথগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সমাধান ছিল মানব জাতি এবং সামাজিক একক হিসেবে এর প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে। মার্কসের দৃষ্টিতে সামাজিক ব্যবস্থায় কতকগুলো পরস্পর বিরোধী শ্রেণী নিয়েই সমাজ গঠিত আর তাতে সামাজিক সংঘাতই হলো পরিবর্তনের উৎস। অপরপক্ষে গোঁড়া অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে সমাজ হলো কতকগুলো ব্যক্তি এককের সমষ্টি, যারা বাজার শক্তির দ্বারা সৃষ্ট এক অস্থায়ী ভারসাম্যে (uneasy equilibrium) একত্রিত। তৃতীয় আর একদল অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ মনে করলেন যে মানুষ এবং সমাজ দুটো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয়েই গঠিত হয় একক প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ নিজের স্বার্থের দ্বারা, ভ্রাতৃত্বের অনুভূতির দ্বারা কৌতূহলের দ্বারা, নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা এবং তার সামাজিক আর অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। মানুষ এবং সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে এই জটিল দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটে বেশ কয়েকজন লেখকের দ্বারা নানাভাবে, তাঁরা বললেন যে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবেই মানুষের কল্যাণটা সচেতনভাবে চেতে হবে। এই চিন্তাশীলদের দলই ছিলেন জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র (welfare state) বিষয়ক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। এ বাস্তবধর্মী অথচ কল্পনাপ্রবণ, সতর্ক অথচ আশাবাদীর দলটি অনেকগুলো চিন্তাদর্শের উদ্ভব করলেন, যার ভিত্তিতেই গড়ে উঠে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মিশ্র অর্থনীতি শাস্ত্র। সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির উপর এঁদের প্রভাব ছিল তৎকালীন সমাজতন্ত্রী অথবা গোঁড়া নিও–ক্ল্যাসিক্যালদের চেয়ে ঢের বেশী।

www.pathagar.com

পোপের অর্থনীতি

পুঁজি আর শ্রম পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত এই দুই অংশের মধ্যে সামাজিক 'ন্যায়বিচারের নিগুঢ় নীতিমালা থেকে একটা মধ্যপথ বের করার চেষ্টা করেন ত্রয়োদশ পোপ্ লিও (১৮১০–১৯০৩) ১৮৯১ সনে এক বিখ্যাত (পোপীয়) বার্তায় তিনি সেই যুগের সামাজিক সমস্যাকে মূলতঃ অর্থনৈতিক নয় বরং নৈতিক বলে সংজ্ঞায়িত করেন, আর করুণার দ্বারা প্রাণবন্ত ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সে সমস্যা সমাধানের আহবান জানান। কোন বাজারের মাধ্যমে ব্যয় আর লাভের অংকে এই সমাধানের পরিমাপ করা যাবে না এবং তা 'বাস্তব' ভিত্তিকও নয়, কিন্তু এটাই হলো আসল কথাঃ নৈতিকতা আর ন্যায়বিচার কোন বাজার-ভিত্তিক ঘটনা নয় বরং তা লাভ আর লোকসান বা মজুরী আর খরচের মত জাগতিক বিবেচনার উর্ধ্বে। ত্রয়োদশ লিও অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলোকে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিবেচনার আহবান জানালেন। এই পোপের জন্মকালীন নাম ছিল জোবিকনো ভিন জেনো পেক্সী, তিনি সারা জীবন রোমান ক্যাথলিক গির্জার খেদমতে নিয়োগ করেন। একজন 'যেসুইট' হিসেবে তাঁর প্রশিক্ষণ হয় এবং ১৮৩৭ সনে তিনি ধর্মযাজক হন, পোপীয় প্রশাসনের বিভিন্ন পদে কাজ করেন এবং দ্রুত পদোন্নতির মাধ্যমে ১৮৪৬ সনে আর্চবিশপ আর ১৮৫৩ সনে কার্ডিনালের পদ লাভ করেন। ১৮৭৮ সনে তাঁকে পোপ নির্বাচিত করা হয়, এমন এক সময়ে, যখন ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ ইউরোপের সকল রাষ্ট্র আর গির্জার মধ্যে সম্পর্কে অবনতি ঘটিয়েছে এবং শিল্পায়নের ফলে এমন এক নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যার সাথে গির্জার সম্পর্কটা তখনো পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। ত্রয়োদশ লিও প্রায় পঁচিশ বৎসর পোপের পদ আসীন ছিলেন আর প্রধানতঃ তারই প্রচেষ্টায় সে কালের ক্যাথলিক চার্চ নয়া রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ধারার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল।

১৮৭৮ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সময়ে কতকগুলো পোপীয় বার্তার মাধ্যমে ত্রয়োদশ লিও আধুনিক সমাজের সমস্যাবলী আর তার সমাধান, রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং ব্যক্তি আর গির্জার সাথে তার সম্পর্ক, এবং সে যুগের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। একটি প্রারম্ভিক বার্তায় তিনি সমাজতন্ত্রের নিন্দা করেন আর সম্পদের ব্যক্তিগত অধিকারকে সমর্থন করেন, অর্থাৎ গির্জা আর রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যাবলী ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যান্ড

www.pathagar.com

এবং অস্ট্রিয়া-হাংগেরীতে যখন অনেকটা আপোষেই মীমাংসা হয়ে গেল, তখন সকলেরই নজর পড়লো পুঁজি আর শ্রমের, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিকের মধ্যে চালু সংগ্রামটার দিকে, যে সংগ্রাম ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলার উপক্রম করছিল। 'রিরাম নোভারাম' (Rerum Novarum) যেটাকে 'শ্রমিকদের অবস্থা পর্যালোচনা'ও বলা হয়, তাতে তিনি বললেন, "বিপুল সংখ্যক অতি দরিদ্ররা এ মুহূর্তে যে কঠিন দারিদ্র্য আর দুর্ভাগ্যের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে... এর একটা সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে।" তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ বিরোধী 'লেজে ফেরে" নীতির কঠোর সমালোচনা করে বললেনঃ

"খেটে-খাওয়া মানুষদের আমরা নিঃসঙ্গ আর নিরস্ত্র অবস্থায় দায়িত্বজ্ঞানহীন মালিকদের আর লাগামহীন প্রতিযোগিতা লালসার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আর লোভী স্বার্থপর মানুষদের ক্রমবর্ধমান সুদখোরী এই দুরবস্থাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তার সাথে যোগ হয়েছে চুক্তিতে কাজ করবার রেওয়াজ, এবং সব ব্যবসা বাণিজ্য মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির কুক্ষিগত হওয়া, যার ফলে মাত্র অল্প কয়েকজন অতি ধনী মানুষ দরিদ্র জনসাধারণের উপর এমনভাবে তাদের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে, যে সেটা প্রকারান্তরে দাসত্বই বলা চলে।" এই উদ্ধৃতিকে যদিও গোঁড়া সমাজতন্ত্রীদের লেখা থেকে বিশেষ পৃথক বলে মনে হয় না, কিন্তু ওটার পরে তিনি যা লিখেছিলেন তাতে ছিল সমাজতন্ত্রের নিন্দা এবং সম্পদের মালিকানায় ব্যক্তির প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকারের পক্ষে ওকালতি।

ত্রয়োদশ লিওর দৃষ্টিতে সমাজ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেখানে গোষ্ঠীগত স্বার্থটা থাকবে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির স্বার্থের উর্ধ্বে এবং যেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো শুধু লাভের এবং সঞ্চয়ের লালসার দ্বারা স্থির না হয়ে বরং অপর মানুষদের জন্য ভাবনা আর শুভেচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে। ত্রয়োদশ লিও মনে করতেন যে বাজারের চেয়ে বরং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তার এই মতের ভিত্তি ছিল ক্যাথলিক সামাজিক চিন্তাধারা, যা ত্রয়োদশ শতাব্দীর টমাস একুইনাস (Thomas Aquinas) এবং এরও আগে থেকে চলে এসেছে। তিনি বাজার অর্থনীতির নির্মম ব্যক্তিতাবাদের সমালোচনা করেন এবং মানবিক আর সামাজিক মূল্যবোধে ফিরে আসার জন্য আহবান জানান।

সমাজের স্বার্থকে বাজার ব্যবস্থার উর্ধ্বে স্থান দিয়ে ত্রয়োদশ লিও রাষ্ট্রকে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলেনঃ যখনই অর্থনৈতিক বিষয়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণ এবং স্থায়িত্ব বিপন্ন হবে, তখনই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিন্তু

www.pathagar.com

অবশ্যই সুবিচার এবং ন্যায়ের পথে। দৈনিক কাজের সময় নির্ধারিত করে দেয়া, ন্যূনতম মজুরী প্রতিষ্ঠিত করা, শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ এবং সমাজের মানুষদের রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক আইন চালু করা, এসব কাজ রাষ্ট্রের পক্ষে নিতান্তই যুক্তিযুক্ত। শ্রমিক ইউনিয়নও যুক্তিসংগত ব্যবস্থা, যদি না তারা সদস্য হওয়া সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং স্বার্থপর লক্ষ্যের অনুসরণ করে। বস্তুতঃ ত্রয়োদশ লিও একটি ক্যাথলিক শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থনেও যুক্তি দেখান, যাতে শ্রমিক আন্দোলন যে ন্যায়ভিত্তিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় রাখছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশের দৃষ্টিতে অবশ্য এইসব পোপীয় ঘোষণাকে নেহাৎ নরম ভাবাপন্ন বলেই মনে হবে, কিন্তু শতাব্দীর শুরুতে তা হতো না, বিশেষ করে যদি মনে রাখা যায় যে এসব এসেছিল এমনই এক ধর্ম-নেতার কাছ থেকে, যে ইতিপূর্বে সচরাচর রাজনীতি আর অর্থনীতিতে রক্ষণশীলতাই সমর্থন করে এসেছে।

ত্রয়োদশ লিওর প্রবর্তিত এই ঐতিহ্য পরবর্তী পোপ্‌গণের ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং গির্জার উদারপন্থী ধর্মযাজকদের মাধ্যমে চালু রাখা হয়েছিল। পোপ একাদশ পিয়ুস যখন ১৯৩১ সনে 'রেরাম নোভারাম'-এর চল্লিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি একটি ঘোষণা দেন যাতে তৎকালীন ব্যবসায়ের মন্দা এবং ইউরোপের উঠ্‌তি ফ্যাসিবাদ আর সাম্যবাদের বিষয়ে ঐ একই নীতি প্রয়োগ করেন। এতে চেষ্টা করা হয়েছিল যে সেই দুটো যুদ্ধলিপ্ত অংশ যারা ভাবনায় আর মানবিক কল্যাণের খাতিরে 'লেজে ফেরে' (laissez-faire) নীতি বর্জন করেছিল, তাদের জন্য যেন একটি মধ্যপথ পাওয়া যায়। ১৯৬১ সনে পোপ জন ত্রয়োবিংশতি 'মাতের এট্ ম্যাজিস্ট্রা' (খৃষ্ট ধর্ম এবং সামাজিক অগ্রগতি) শীর্ষক বাণীতে পুনর্বার এই মত ব্যক্ত করেন যে, ব্যক্তি আর গোষ্ঠী অভিন্ন, অতএব যে সমাজে গোষ্ঠীর স্বার্থ আর ন্যায়বিচারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়, সে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে তার কল্যাণের একটা সমন্বয় সাধন করতে হবে। যদিও পৃথিবীর কোথাও নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে (economic policies) বা সংস্কারে এই ধারণাগুলো বাস্তবায়িত হয়নি, এগুলো এমন এক জনমতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে যাতে অর্থনৈতিক জীবনে সমদর্শিতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের দার্শনিকগণ

ইংল্যান্ডে জন. এ. হবসন নামক একজন ফেবিয়ান সোসালিস্ট এবং রিচার্ড. এইচ. টাউনী শিল্পায়িত সমাজের সমস্যাবলীর প্রতিষেধক হিসেবে কল্পিত দৃষ্টবাদী উদারনীতির (positive liberalism) পক্ষে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। যেসব সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠান মানবিক লক্ষ্যের উপর জোর দেয়, সেগুলোকে উৎসাহিত করাই ছিল সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের সংজ্ঞা। রাষ্ট্রের রচিত উন্নত জীবনের পথে যেসব বাধা আসে, সেগুলো দূর করা এবং ব্যক্তির যেসব কাজ করা এবং যা কিছু উপভোগ করা উচিত সেসব কাজ এবং উপভোগ যাতে সম্ভব হয় তেমন পরিবেশের উন্নতি বর্ধন।

এসব চিন্তাধারার প্রভাবে প্রায় পঁচিশ বৎসরব্যাপী বেশ কয়েক রকমের সংস্কার সাধিত হয়, যেমন কারখানার নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়ন (১৮৯১–১৮৯৫), নারী শিশুদের জন্য কাজের সময় সীমিতকরণ (১৮৯৫), বস্তি পরিষ্কার অভিযান শুরু (১৮৯০), শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর জন্য অধিকতর ক্ষমতা (১৮৯০–১৯০০), কর্মরত অবস্থায় আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ, এবং শিশু–কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন (১৯০৬), বৃদ্ধ বয়সের জন্য পেন্‌সন (১৯০৯) এবং কর্মে অক্ষমতা আর অসুস্থতার বীমা (১৯১১)। আধুনিক জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের (welfare state) প্রধান উপাদানগুলো একত্রিত করা হচ্ছিল।

এই সব সামাজিক আইন প্রণয়নের পশ্চাতে যে ধারণাগুলো কাজ করে, সেগুলোর একজন প্রধান ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন জন. এ. হব্‌সন (১৮৫৮–১৯৪০)। তাঁর প্রগতিশীল মতামতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে চাকুরী দেয়া হলো না, কিন্তু তাঁর কলম থেকে অনর্গল যেসব লেখা আসতে থাকে, সেগুলোর পাণ্ডিত্য আর সমালোচনায় তাঁর গোঁড়া সমসাময়িকদের যথেষ্ট অপদস্থ হতে হয়েছিল। 'দি ফিজিওলজি অব ইন্ডাস্ট্রী' নামক তাঁর প্রথম আমলের একটি গ্রন্থ অর্থনৈতিক মন্দার বিশ্লেষণ করে দেখায় যে ক্রেতার অভাবই মন্দা ঘটার কারণ। 'দি ইভলিউশন অব মডার্ন ক্যাপিট্যালিজম' নামক গ্রন্থে শিল্প ব্যবস্থার ফলশ্রুতি একচেটিয়া মালিকানা, আয়ের বন্টন এবং মন্দার সমালোচনা করা হয়। 'ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম' নামক গ্রন্থ ইউরোপের জাতিসমূহের স্বার্থপরতামূলক সম্প্রসারণকে আক্রমণ করে লেখা হয়; এই যুক্তি পরে লেনিন তাঁর সাম্যবাদী মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। 'ইনসেন্টিভস ইন দি নিউ ইন্‌ডাস্ট্রিয়্যাল অর্ডার' গ্রন্থে ঘোষণা করা হলো যে, সমাজতন্ত্র সফল হবে তার কারণ এ ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের প্রেরণার বদলে বহু ধরনের মানুষের ব্যাপকভিত্তিক প্রেরণা কাজে লাগানো সম্ভব হবে। কিন্তু হব্‌সনের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ওয়ার্ক এন্ড ওয়েল্‌থ্'। এই গ্রন্থে তিনি যুক্তি দেখান যে উন্নত জীবনের জন্য সরকারকে কয়েকটি বিষয়ের দায়িত্ব নিতে হবে, যেমন আয়ের ন্যায়ভিত্তিক বন্টন, পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর আনন্দ বর্ধনের জন্য অধিক মজুরীর ব্যবস্থা। হব্‌সন বিশ্বাস করতেন যে, সরকারের হস্তক্ষেপের দ্বারা দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা এবং নিরাপত্তাহীনতা দূর করা সম্ভব এবং এর ফলে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে মানুষ সুখে থাকবে। এটাকে স্বপ্নরাষ্ট্রের কল্পনা (utopian) বলে অবাস্তব আখ্যায়িত করা অবশ্য চলে, কিন্তু ইংল্যান্ডের সামাজিক আইনগুলোর পশ্চাতে এই স্বপ্ন কাজ করেছিল। হব্‌সন এসব কথা যে সর্বপ্রথম বলেছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি ছিলেন এই চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।

হব্‌সনের মতাদর্শগুলো 'ফেবিয়ান সোসাইটি'রই অনুরূপ। ঐ সোসাইটি ইংল্যান্ডের একদল বুদ্ধিজীবী কর্তৃক ১৮৮৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল, "সমাজকে সর্বোচ্চ নৈতিক সম্ভাবনার প্রয়োজনে পুনর্গঠিত করা"- আর তা অর্জিত হবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে, যাতে করে "সবচেয়ে বেশী লোকের জন্য সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সুখ" অর্জন সম্ভব হয়। এটা ছিল একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী দল, এঁদের প্রথম যুগের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ', সিডনি ওয়েব্, গ্রাহাম ওয়ালাস্ এবং অ্যানি বেসান্ত, আর পরবর্তী সময়ে দলে আসেন ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েলস এবং বেট্রিস ওয়েব। শ' এর সম্পাদকীয় নেতৃত্বে ১৮৮৯ সনে 'ফেবিয়ান এসেজ' (Fabian Essays) নামে যে রচনা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, তাতে শ্রমিকের কাজের পরিবেশ উন্নত করা, একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিকানা এবং সমতা ভিত্তিক আয় বন্টনের উদ্দেশ্যে ক্রমে অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের সম্প্রসারণ করার পক্ষে সুপারিশ করা হয়।

রোমান জেনারেল ফেবিয়ান ম্যাক্সিমাস, যিনি "বিলম্বকারী" বলে পরিচিত ছিলেন এবং যিনি কার্থাজিনিয়ান সেনাপতি হ্যানিবলের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, সম্মুখ সমরের বদলে এমন এক প্রক্রিয়ায়, যাকে একালে গেরিলা যুদ্ধ বলা হয়; সমিতির নামকরণটা হয়েছিল এই সেনাপতির নাম অনুসারে। নামকরণ থেকেই সমিতির রাজনৈতিক দর্শন আর তাদের কার্য পদ্ধতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কস্‌বাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ফেবিয়ানদের মত ছিল এই যে রাষ্ট্র কোন

www.pathagar.com

শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার নয়, তাই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হিসেবেই সরকার দখল করতে হবে এবং সামাজিক কল্যাণের জন্য তার ব্যবহার করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি শ্রমিক দল গঠনের সুপারিশ করেন, যে দলের একটি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী থাকবে আর তাঁদের সহায়তায় সত্যই ১৯০৬ সনে সফলভাবে একটি শ্রমিক দলও গঠন করা হয়েছিল। ১৮৮০-এর দশকে আর ১৮৯০-এর দশকের প্রথম দিকে কয়েকটি আইন পাশ করে স্থানীয় সরকারের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করার পর তাঁরা স্থানীয় সরকারকেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। ফেবিয়ানদের কৌশল ছিল গণতান্ত্রিক, সংসদীয় সরকারে কাঠামোর মধ্যে থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া। তাঁদের সংস্কারমূলক কাজগুলো করার জন্য তাঁরা জনসাধারণকে তাঁদের মতামতের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বুঝাতেন এবং নিজেদের বক্তব্য অনেকগুলো গবেষণা রিপোর্ট আর জনপ্রিয় পুস্তিকার মাধ্যমে তুলে ধরতেন।

ফেবিয়ানদের এই দল যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। তাঁদের কাজের ফলেই ইংল্যান্ডে ১৯১৪-পূর্ব সময়ের জনকল্যাণমূলক আইনগুলো পাশ হয় এবং তাঁরা "লেবার পার্টি" গঠনেও সাহায্য করেন। যদিও সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবহারে তাঁরা বিফল হন এবং বৃহদাকার শিল্পগুলোকে (কয়লা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ শক্তি, অর্থলগ্নির ব্যবসা এবং রেলরোড) সরকারী মালিকানায় আনতে পারেন নি, তবুও তাঁদের চিন্তাধারা আর কৌশল উভয়ই টিকে থাকে 'লেবার পার্টি'র মাধ্যমে এবং ফলবতী হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, যখন ফেবিয়ান সোসাইটির কাজ আর প্রভাব পুনরুজ্জীবিত হয়। এ যুগের ইংল্যান্ডে যেসব জনকল্যাণমূলক আইন কার্যকর আছে এবং পরিবহণ, কয়লাখনি, আর অন্যান্য মৌলিক শিল্পগুলোর জাতীয়করণ, এসবের গোড়ায় রয়েছে ফেবিয়ানদের প্রভাব।

এক ভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আর.এইচ. টাউনী (১৮৮০-১৯৬৩), যিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ষোড়শ শতাব্দী বিষয়ক গবেষণায় পণ্ডিত, যদিও ঐ সময়টা বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত হৈ-হল্লা থেকে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু টাউনী ছিলেন উভয় যুগের মানুষ। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ 'দি এগ্রারিয়ান প্রব্লেম ইন দি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরী' (১৯১২) অর্থনৈতিক ইতিহাসের নতুন সংযোজন হিসেবে বিশ্লেষণ করে কেমন করে প্রাচীন কৃষি আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায়,

www.pathagar.com

আর তা থেকে আধুনিক বাজার অর্থনীতি আর সমাজের অভ্যুদয় হয়। আধুনিক সমাজের একজন আক্রোশপূর্ণ সংস্কারক হিসেবে এবং একজন বাস্তবধর্মী পণ্ডিত হিসেবে টাউনী তৎকালের সবচেয়ে বিখ্যাত তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রথমটির নাম, 'দি অ্যাকুইজিটিভ্ সোসাইটি' (১৯২০)। এই গ্রন্থে টাউনী মধ্যযুগের কার্য-ভিত্তিক সমাজ, যেখানে প্রত্যেক মানুষের একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থান, কর্তব্য আর পুরস্কার ছিল, তার সাথে তুলনা করেন আধুনিক শিল্প জগতের, যেখানে উৎপাদন প্রচেষ্টা অতি নগণ্য পুরস্কার পায়। আর পক্ষান্তরে, উদ্যোগ, ফাটকা-কারবারী এবং খাজনা-খোররা (rentier) অনর্জিত আয়ের দ্বারা বিপুল পয়সা বানায়। টাউনী বললেন, আধুনিক সমাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে, যাতে যারা কাজ করছে আর সমাজের চলবার জন্য এবং সকলের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করছে, তারা যেন তাদের প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কার পায়। টাউনীর উক্তি "যারা সম্পদের দ্বারা সমাজের কোন সেবাই করছে না, তাদেরকে ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার দেয়া বোকামী, কারণ সেবা যেখানে পাওয়া যাচ্ছে না, তার জন্য দাম দেয়াটা তো অপব্যয়। তাঁর মতে, সমাজের পুনর্গঠন হওয়া উচিত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়মে কাজের ভিত্তিতে।

এরপরই এলো টাউনীর সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী গ্রন্থ, "রিলিজিয়ান অ্যান্ড দি রাইজ অব ক্যাপটালিজম" (১৯২৬)। তাঁর পাণ্ডিত্যের এলাকা ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে, টাউনী এসে পৌঁছলেন সেই বিতর্কে, যেটা শুরু হয়েছিল ওয়ের্নার সোমবার্ট আর ম্যাকস ওয়েবার নামক দুই জার্মান পণ্ডিতের দ্বারা। এই বিতর্কের বিষয় ছিলঃ প্রটেস্টান্টদের সংস্কার আন্দোলনই (Protestant reformation) তার বুদ্ধিগত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আধুনিক ধনতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল কি না ? টাউনী স্বীকার করেন যে এ দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল বটে এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিতও করে, কিন্তু তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল এই যে আধুনিক জগতের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নীতি বিবর্জিত। অতঃপর কঠিন পরিশ্রম আর জাগতিক সাফল্য, এই দুটি প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিই তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্থাৎ উচ্চতর মূল্যবোধের থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেরাই লক্ষ্যে (end) পরিণত হবার ফলে এখন কোনরূপ নৈতিকতা ছাড়াই ব্যবসা চালানো হচ্ছে। মনে হয়, একালের নরনারী যেন সর্বদা ফাউস্টের উপকথার (Faust legend) পুনরাভিনয় করে যাচ্ছে তাদের জাগতিক সম্পদের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করে, আর নৈতিক মূল্যবোধটাকে দ্রুত ভুলে যাওয়ার প্রতি রবিবারের ঘন্টা দুই গির্জায় কাটানোর

www.pathagar.com

মধ্যে নির্বাসিত করছে। টাউনীর বর্ণনা অনুসারে, আধুনিক জগতটা ছিল এইরূপঃ "বস্তুগত পরিবেশের উপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে যে উন্নয়নের মধুর এক মরীচিকা দেখা দিয়েছে, তা আনতে এমন এক স্বার্থপর এবং বাহ্যিক প্রতিযোগিতা চলছে, যে এই বিজয় যে কি কাজে লাগবে, তা স্থির করবার ক্ষমতা আর এ ব্যবস্থার নেই।"

বস্তুগত সম্পদের উর্ধ্বে মূল্যবোধের পক্ষে এই আবেদনের পর লেখা হয় 'ইকুয়ালিটি' (১৯৩১), যেখানে এমন এক সমাজের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানানো হয়, যাতে সম্পদের বন্টনকে সমতাভিত্তিক করা হবে। "সভ্যতার যেসব সুযোগ এই ব্যবস্থা ছাড়া শুধু ধনীদেরই উপভোগ্য হয়ে থাকে, সেগুলো কর ধার্য করার মাধ্যমে সকল উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করে, সেই অর্থের ব্যয় দ্বারা আয়, পেশা আর সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা না করে সেসব সুযোগ সকলের কাছেই উপস্থিত করা যায়।" প্রতিদানে, এই মতবাদ (equalitarianism) আবার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোকেও সমর্থন এবং শক্তি যোগাবে, যা উক্ত সমতাবাদকে সম্ভব করেছে।

টাউনী ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের এক দুর্জ্ঞেয় বিষয় সম্পর্কে পণ্ডিত এই ব্যক্তিটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর বিশদ জ্ঞান ব্যবহার করেন তাঁর সমসাময়িক যুগের উপর নতুন আলোকপাত করার কাজে। তিনি এমন এক ব্যাপকভিত্তিক দর্শন গড়ে তোলেন, যা সে সময়ের অর্থনৈতিক জীবনধারার বিষয়ে মৌলিক সমালোচনা সৃষ্টি করে। যে সকল সমস্যা তিনি বর্ণনা করেন, সে সম্পর্কে টাউনীর দেয়া সমাধানটা ছিল সমাজতান্ত্রিক, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানবিক মূল্যসমূহ একমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ পেতে পারে।

ভেবলেন্ এবং কমনস্

গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের চিন্তা ইংল্যান্ডের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে অধিক বাস্তবধর্মী হয়ে গড়ে উঠে। যুক্তরাষ্ট্রে হব্‌সন বা টাউনীর মত কোন অর্থনৈতিক দার্শনিক ছিল না এবং ফেবিয়ানদের মত কোন বুদ্ধিবাদী কর্মীদলও ছিল না। মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গীটা গড়ে উঠে কয়েকজন অর্থনীতিবিদের কাজের মাধ্যমে, যাঁরা ব্যবসায়িক চক্র, শ্রমিক সম্পর্ক, একচেটিয়া আর বড় ব্যবসায়, এবং সমাজ-কল্যাণ, এই সব অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, এবং অগ্রগতির যুগ থেকে নিউ-ডিল পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক কর্মীদের মাধ্যমে। এই উভয়

www.pathagar.com

দলের প্রধান কথাটা ছিল এই যে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজের যে কঠিন সমস্যা তার সমাধান নিজে থেকেই হয়ে যাবে না এবং বাজারের ধ্বংসকারী শক্তির হাত থেকে সমাজদেহ এবং তার অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যক্তিকে রক্ষা করতে হলে সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে। ইংল্যান্ডে যে সমাজতন্ত্রী দর্শন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার তুলনায় মার্কিনীরা শুধু গতানুগতিক মার্কিন সমাজের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সমস্যার কার্যকর সমাধান খুঁজছিলেন।

আমেরিকায় এই ধারণার বিকাশের জন্য যদি কোন একজন প্রভাবশালী লেখকের নাম করতে হয়, তবে সে হলেন থরস্টেইন্ ভেব্‌লেন (১৮৫৭-১৯২৯)। মধ্য পশ্চিমের যে পল্লী সমাজ পপুলিস্ট আন্দোলন (Populist Movement) এবং উইলিয়াম জেনিংস ব্রিয়ানের জন্ম দেয়, সেখান থেকেই এসেছিলেন এই নরওয়ে থেকে আসা এক বহিরাগতের পুত্র, তিনি জনস্ হপকিনস্ এবং ইয়েলে দর্শন আর কর্নেলে অর্থনীতি পড়েন। অসাফল্য থেকেই তাঁর জীবন গড়ে উঠে। শিকাগো, স্ট্যানফোর্ড এবং মিসৌরীতে অধ্যাপনার পেশায় তিনি কখনো সহকারী অধ্যাপকের উপরে উঠতে পারেন নি। এমন কি কুড়ির দশকের প্রথম দিকে যখন তিনি নিউইয়র্ক শহরের নিউ স্কুল ফর সোস্যাল রিসার্চে পড়াতেন তখনও তাঁর বেতনটা আসতো আংশিকভাবে তাঁর পুরানো ছাত্রদের চাঁদা থেকেই। কিন্তু ভেব্‌লেনের লেখা বই তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে এবং তাঁর চিন্তাধারার জন্য সহকর্মী অর্থনীতিবিদরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ১৯২৪ সনে মার্কিন অর্থনৈতিক সমিতির সভাপতি পদে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়, কিন্তু তিনি সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, যে সময় এই সম্মান তাঁর পেশায় কিছু কাজে লাগতে পারতো, তখন তাঁকে তা দেয়া হয়নি।

ভেব্‌লেনের সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। তিনি ১৯০৬ সনে হঠাৎ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যান- ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে উঠে, কিছুটা তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তাধারার কারণে আর কিছুটা এই কারণে যে তিনি শিকাগোর এক সুপরিচিত রমণীকে সাথে নিয়ে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আটলান্টিক পাড়ি দেন। তিনি বিবাহিত হলেও স্ট্যানফোর্ড থাকাকালীন তিন বৎসরের মধ্যে মাঝেই মাঝেই বিবাহ-বহির্ভূত উচ্ছৃঙ্খল আচরণে জড়িয়ে পড়তেন। কথিত আছে যে তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের কেউ কেউ নাকি ঐ দুর্ভাবনা কেটে যাবার জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

ভেব্‌লেন পড়ানোর কাজটা পছন্দ করেন নি। যখন ১৯১১ সনে তিনি মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন, তখন অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর সুনাম হয়ে গেছে। ছাত্ররা

www.pathagar.com

দলে দলে তাঁর ক্লাসের জন্য নাম লেখালো, কিন্তু ক্লাসে এসে তারা দেখলো এক দাঁড়িওয়ালা অস্পষ্টভাষী লোক যে প্রথম দিনেই ব্লাকবোর্ড ভর্তি একগাদা বই-এর নাম দিলেন,যার উপর সপ্তাহ পরেই ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে হবে। ফলে তাঁর ক্লাসের ভীড় একদম কমে গেল, ছাত্র-সংখ্যা মাত্র এক ডজনে এসে টিকলো। তা ছাড়া ভেবলেন কখনো 'সি'র উপরে নম্বর দিতেন না, যাতে করে যেসব ছাত্র 'ফাই-বিটা-কাপ্পা'র জন্য নির্বাচিত হতে চায়, তারা নিরুৎসাহিত হয়।

ভেব্‌লেনের সুনাম তাঁর বইগুলোর জন্য। গত এক শতাব্দীকালের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী বইগুলোর একটি হলো তাঁর 'দি থিওরী অব দি লেইজার ক্লাস' (১৮৯৯), যেখানে ভেব্‌লেন অর্থকেন্দ্রিক কৃষ্টিকে সাফল্য অর্জনের বৈষয়িক মাপকাঠি মনে করার সমালোচনা করেন। যেহেতু ব্যক্তি আর পরিবারের বেঁচে থাকা নির্ভর করে তাদের আয়ের উপর, অর্থ আর সম্পদ হয়ে পড়েছে একমাত্র মাপকাঠি যা দিয়ে সব কাজেরই বিচার করা হয়। সম্পদশালীরা তাদের সাফল্য প্রমাণ করার জন্য দৃষ্টি আর্কষক পথে টাকা খরচ করেছে, আর যাদের কম টাকা আছে, তারাও ঐ ধনীদের অনুকরণের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে- বড় সাহেব যদি বারমুডায় তার সখের ইয়টে এক মাসের ছুটিতে যায়, তবে তার সেক্রেটারীও কঞ্জুসের হালে বছরের পর বছর নিদেন পক্ষে ক্যারিবিয়ানে এক সপ্তাহের ছুটি কাটানোর ধান্দায় থাকে। অবসর যাপনটা সাফল্যের সবচেয়ে বড় নির্দেশক হয়ে পড়েছে— যেহেতু যত বড় ধনী, তার তত কম কাজ, তত বেশী চাকর-নফর। তার স্ত্রী-পুত্রকে কোন কাজ করতে হয় না, শুধু ফূর্তির সন্ধানেই তাদের সময় কাটে।

"দৃষ্টি-আকর্ষক অবসর", "দৃষ্টি আকর্ষক ভোগ" আর "অর্থব্যয়ে অনুকরণপ্রিয়তা", এগুলো বাজার-কেন্দ্রিক অর্থনীতির সহজাত অংশ, যা সম্পদ, উৎপাদনশীল প্রচেষ্টা এবং সময়ের বিপুল অপচয় ঘটায়। এর বিকল্প মূল্য-ব্যবস্থাটা কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ভেব্‌লেন কিছু বলেন নি, কিন্তু এই অর্থ-কেন্দ্রিক কৃষ্টিটা পরিষ্কার বাতিল করে দিয়েছিলেন।

ভেব্‌লেনের পরবর্তী গ্রন্থ 'দি থিওরী অব বিজিনেস এন্টারপ্রাইজ' (১৯০৪) এই যুক্তি সম্প্রসারিত করে বাজারের উৎপাদনের দিকটা বিশ্লেষণ করে। তিনি ব্যবহারের জন্য উৎপাদন আর মুনাফার জন্য উৎপাদন, এই দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে বলেন যে ব্যবসায়ীরা প্রায়ই প্রথমটার প্রসার বন্ধ করে দ্বিতীয়টির পেছনে ছোটে। মুনাফার লোভ ব্যবসায়ীদের উৎপাদন হ্রাস করে একচেটিয়া ব্যবসার

www.pathagar.com

দিকে এগিয়ে দেয়। ব্যবসায়ীরা তাদের ইতিপূর্বে বিনিয়োগ করা পুঁজির স্বার্থে প্রকৌশলের অগ্রগতি রোধ করে। অতিরিক্ত ঋণের প্রসার আর সুবিধাজনক অর্থ-পরিচালনা (financial manipulation) ডেকে আনে মন্দা আর উৎপাদন হ্রাস। বিনিয়োগকৃত পুঁজি দিয়ে অধিক পরিমাণ সম্পদ নিয়ন্ত্রণের লোভ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা আর ব্যবস্থাপনাকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেয়। ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ফলে সেনাবাহিনীর ব্যয় আর যুদ্ধ-বিগ্রহ উৎসাহিত হয়। এক কথায় যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা মানুষের যে কল্যাণ হতে পারতো, মুনাফার একাগ্র সাধনা তাকে বাধাগ্রস্ত করে। অর্থ-কেন্দ্রিক সমাজে (pecuniary society) ক্রেতাদের মানসিকতা যেমন অপব্যয় ঘটায়, তেমনই ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের মৌলিক প্রবণতাটাও ঐ একই দিকে যায়।

এ দু'টি বই এবং ভেব্‌লেনের অন্যান্য লেখা যেমন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছে, তেমনই বর্ণনা করেছে অর্থ-কেন্দ্রিক কৃষ্টির। ভেবলেন-এর মতে, যদিও ব্যবসায়ী আর বিলাসী শ্রেণী বর্তমানে সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, তবুও একদিন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আসবেই। প্রকৌশলের আয়ুর একটা সীমা আছে এবং বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী প্রমুখ মুনাফার চিন্তা না করেও ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে, উৎপাদনের উন্নততর পদ্ধতি এবং অপেক্ষাকৃত দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। বিপরীত ক্রমে, ব্যবসায়ী আর ধনী শ্রেণী হচ্ছে 'কায়েমী স্বার্থবাদী', যারা পরিবর্তনে বাধা দেয়, কারণ এতে করে তাঁদের আরামপ্রদ অবস্থানে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রকৌশলের অগ্রগতি আর বর্তমান ব্যবস্থার রক্ষণশীলতা, এই দু'য়ের মধ্যে, অর্থাৎ সমগ্র সমাজের স্বার্থ আর ক্ষমতার অধিকারী সম্পদশালী শ্রেণী, এই দুইয়ের মধ্যে এক বিরাট সংঘর্ষ প্রায় জন্মগত বলা চলে। অনিবার্যভাবেই পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের প্রয়োজন আর মুষ্টিমেয় আরামকারী (leisure class elite) শ্রেণীর সমর্থিত চালু প্রতিষ্ঠানসমূহ, এ দু'টির মধ্যে এক কৃষ্টিগত পার্থক্যও অপ্রতিরোধ্য। ভেব্‌লেনের দৃষ্টিতে এই সংঘাতের এক মেরুতে থাকবে প্রয়োজনীয় উৎপাদন আর সমাজের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রকৌশল-প্রধান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আর অপর মেরুতে থাকবে বর্তমান ক্ষমতা আর সম্পদ কাঠামো রক্ষার উদ্দেশ্যে এক ধরনের সামরিক স্বৈরতন্ত্র। তিনি মনে করেন যে চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্বিতীয়টাই জয়ী হবে, কারণ শিল্পপতিরা নিজেদের স্বার্থ

www.pathagar.com

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় সমর্থন চাইবে যাতে সামরিকতন্ত্র এবং উপনিবেশবাদ তাদের সম্পদ সৃষ্টি আর রক্ষা করায় সহায়তা দেয়। সম্ভবতঃ ভেব্‌লেন সে সময়ের সমরবাদী জার্মানী, উপনিবেশবাদ, বড় নৌ-বহরের মানসিকতা, এবং ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্টের শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ধারণার উৎস যেখানেই হোক, সেই ১৯০৪ সনেই তিনি ফ্যাসিবাদের উত্থান এবং যৌথ সংস্থা গড়ে উঠার পূর্বাভাষ দিয়েছিলেনঃ যেসব সংগঠন বাস্তবিকই ১৯২০ আর ১৯৩০-এর দশকে জার্মানী, জাপান আর ইটালীতে গড়ে উঠেছিল।

ভেব্‌লেনের দৃষ্টিভঙ্গীটা উড়িয়ে দেয়ার মত ছিল নাঃ তাঁর যুক্তি ছিল পরিবর্তনের পক্ষে বড় বড় শক্তিগুলো কাজ করছে, আর সেজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহেও খাপ খাওয়ানোর জন্য পরিবর্তন প্রয়োজন, অথচ যারা সম্পদ আর সাফল্য অর্জন করেছে তারা নিঃসন্দেহে তাতে বাধা দেবে। হয়ত ভেব্‌লেন এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্রষ্টা নন, কিন্তু তিনি পরিবর্তন আর কায়েমী স্বার্থের মধ্যে সম্পর্কের ধারণাটাকে একটা মজবুত তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অর্থ-কেন্দ্রিক সমাজ আর ব্যবসায়িক সংগঠনের সমালোচনার সাথে এই ধারণাগুলো একত্রে মিলে অর্থনৈতিক আর সামাজিক সংস্কার আন্দোলনকে একটা লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল।

ভেব্‌লেনের বইগুলো ব্যাপকভাবে সাধারণ পাঠকদের দ্বারা পঠিত হয়। এই জনপ্রিয় গ্রন্থগুলো ছাড়া তিনি অর্থনীতিবিদদের জন্য পেশাভিত্তিক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ এবং পুস্তক সমালোচনার মাধ্যমে নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির বিধ্বস্তকারী সমালোচনা করেন। স্থির-ভারসাম্য (static equilibrium) নিয়ে অর্থনীতির আলোচনাটা তাঁর মতে ছিল সেকেলে। এতে অর্থনৈতিক মানুষের আনন্দবাদী মনোবৃত্তি (hedonistic psychology) সম্পর্কিত যে স্বীকৃতি (assumption) ছিল, তিনি সেটাকে মানব প্রকৃতির খুব সংকীর্ণ ব্যাখ্যা বলে মনে করতেন। অর্থনীতির বিশ্লেষণে তুলনামূলক স্থিতির (comparative statics) প্রণালী ব্যবহারের ফলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এবং প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের ধারাটা একদম এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাই এ থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তসমূহ সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত ব্যবস্থার একটা আদর্শগত যৌক্তিকতা প্রমাণের সাথে তা সম্পর্কিত হয়। বস্তুতঃ এই সমালোচনার কারণেই অর্থনীতিতে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আনুষঙ্গিক হিসেবে পরীক্ষামূলক অনুশীলনের বিকাশ ঘটে, যা ভেব্‌লেনের পরে অর্থনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

ভেব্‌লেনের ব্যাপক প্রভাব শুধু জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অর্থনীতি শাস্ত্রেও তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর। তিনি যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতেন, তাঁর শিষ্যরা তা নিয়ে প্রচুর অনুসন্ধান করেন। উইস্‌লী মিচেল ব্যবসায়িক-চক্র নিয়ে গবেষণা করেন এবং 'ন্যাশন্যাল ব্যুরো ফর ইকনমিক রিসার্চ' প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যাডল্‌ফ বের্‌লী এবং গার্ডনার মিন্‌স বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা থেকে নিয়ন্ত্রণ পৃথক করা নিয়ে লেখেন। মিন্‌স এবং ওয়াল্‌টন হ্যামিল্‌টন বড় ব্যবসায়ীদের মূল্য নির্ধারণ নীতি (pricing policies) বিশ্লেষণ করেন। ক্লারেন্স আইরিস পরীক্ষা করেন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রকৌশলিক পরিবর্তনের প্রভাব। রবার্ট এবং হেলেন লিন্ড তাঁদের 'মিডল্‌টাউন' এবং 'মিডল্‌টাউন ইন ট্রানজিশন' নামক গ্রন্থগুলোতে সামাজিক শক্তির গঠনপ্রণালী বিষয়ে আলোচনা করেন, এবং সি. রাইট মিলস্ ঐ একই বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে অনুশীলন করেন তাঁর 'দি পাওয়ার এলিট' গ্রন্থে। এমন কি সাহিত্যের সমালোচনাও প্রভাবিত হয়; উদাহরণ স্বরূপ, ভার্নন প্যারিংটন ভেব্‌লেনের চিন্তাধারার প্রয়োগ করেন তাঁর কীর্তিমান গ্রন্থ- 'মেইন কারেন্টস্ ইন আমেরিকান থট্" গ্রন্থে।

ভেব্‌লেনের কাজ এবং প্রভাবের দিক দিয়ে তাঁর সমসাময়িক তুল্য ছিলেন জন. আর. কমনস্ (১৮৬২-১৯৪৫)। ভেব্‌লেন যে ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের মৌলিক বক্তব্যকে রূপদান করেন সেক্ষেত্রে কমনস্ এবং তাঁর অনুগামীরা বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা এবং আইন পাশে নেতৃত্ব দেন। কমনস্‌ও ছিলেন একজন মধ্য পশ্চিমের অধিবাসী এবং তিনিও জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন ১৮৮০-এর দশকে, যখন এটা ছিল একটা শীর্ষস্থানীয় মার্কিন উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক হিসেবে প্রথমে তিনি আসেন ওয়েসলীয়ান, তারপর ওভারলীন, ইন্ডিয়ানা এবং সেরাকিউসে। সেরাকিউসে থাকার সময়ে প্রকাশিত একটি লেখায় তিনি বলেন যে রাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধির বিধান হলো ব্যক্তিগত সম্পদের বিধানেরই স্বরূপ, কারণ সম্পদ সঞ্চয়ের সাথে সম্পর্কিত যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সমাজ সেই ক্ষমতাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এই ধরনের মতামত, উপরন্তু শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কিছু পাঠ্য বিষয় শিক্ষার কোর্সে দেয়ার জন্য কমন্‌সের আগ্রহ, এসবের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তাঁর পদটিই তুলে দিতে বাধ্য হলেন। পরবর্তী চার বৎসর তিনি কাজ করেন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প কমিশনের ইউনিয়ন আর শ্রমিক মালিক সম্পর্ক নিয়ে এবং ন্যাশন্যাল সিভিক ফাউন্ডেশনে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বিরোধ নিবারণের বিষয়ে।

www.pathagar.com

১৯০৪ সনে কমনস্ শিক্ষার চত্বরে ফিরে এলেন এবং উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পদে যোগ দিলেন, তার জনস্ হপকিন্সে থাকার সময়কার প্রবীণ অধ্যাপক রিচার্ড টি. এলির নিমন্ত্রণে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যতটা সময় থাকতেন, প্রায় তার অনুরূপ সময়ই ছুটি নিয়ে সরকারী কমিশনগুলোতেও থাকতেন। তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল জন-উপযোগমূলক কাজের (public utility) নিয়ন্ত্রণ আর শ্রমিক সমস্যাবলী। তিনি উইস্কন্সিনে ১৯০৭ সনের জন-উপযোগমূলক আইনের খসড়া প্রস্তুতে সাহায্য করেন এবং শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় আহত হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণের পক্ষে, বেকার অবস্থার জন্য বীমা আর শান্তিপূর্ণ যৌথ দরকষাকষির (collective bargaining) বিষয়ে অনেক লেখেন। ১৯১১ সনে তিনি উইস্কন্সিন শিল্প কমিশন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন, যে কমিশনের কাজ ছিল শ্রমিক বিরোধের সালিশী এবং মিটমাট করে দেয়া। ১৯১৪ সনে তিনি একই ধরনের একটি জাতীয় কমিশনে কাজ করেন ওয়াশিংটনে এবং ১৯১৫ সনে তিনি এক বিবরণে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রম-বিরোধের মীমাংসার জন্য জাতীয় শ্রম-বোর্ড প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। এরপর তিনি বেকার-বীমার দিকে মনোযোগ দেন এবং এক আন্দোলন শুরু করেন যার ফলে ১৯৩২ সনে উইস্কন্সিনে এ বিষয়ে একটি আইন পাশ হয় এবং জাতীয় পর্যায়েও কয়েক বছর পরে তা করা হয়। কমনস্ যখন বুঝতে পারলেন যে বেকার-বীমা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া চলতে পারে না, তখন তিনি ঐ এলাকায় মনোনিবেশ করলেন এবং ১৯২০-এর দশকে ন্যাশনাল মনিটারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন, যার উদ্দেশ্য ছিল ঋণ আর মূল্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জনের কর্মসূচী প্রণয়ন।

এসব কর্মসূচী এবং নীতিই পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী অর্থনীতির প্রধান অংশে পরিণত হয়ঃ জনস্বার্থে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে জন-উপযোগ বিষয়ক নিয়ম-কানুন; স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিরোধের মীমাংসা; উৎপাদন এবং কর্মনিয়োগ উচ্চ পর্যায়ে রেখে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শিল্প ব্যবস্থার প্রধান ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের তীব্রতা হ্রাসের জন্য সামাজিক আইন প্রণয়ন (যেমন বেকার বীমা, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ এবং বার্ধক্য বীমা)। ১৯৩০-এর দশকে পাশ করা 'নিউ ডিল' আইনগুলোর অনেকটা কমন্সের প্রবর্তিত কাঠামোর মধ্যেই ছিল।

www.pathagar.com

কমন্‌সের চিন্তামতে অর্থনীতিকে একটা "চালু ব্যবসা" হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। অর্থাৎ অর্থনীতি হলো বিভিন্ন মানুষের পৃথক বিপরীতমুখী এবং পরস্পর বিরোধী স্বার্থের এবং সম্পর্কের সমন্বয়ে বোনা একটি জালবিশেষ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই ঐ বিরোধ এবং সংঘাত নিষ্পত্তি করার ইচ্ছা আছে, যাতে করে মোট ব্যবস্থাটা ঠিকভাবে কাজ করে। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের বিকাশের ফলে হয় তো একচেটিয়া ব্যবসায়িক-চক্র শ্রমিক-মালিক বিরোধ ইত্যাদি গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু কমন্‌সের যুক্তি ছিলঃ এ বিষয়ে একমত হতে পারি যে এই সব সমস্যার সমাধান করতে পারলে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থাটা ভাল হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে পথটা পাওয়া যায়, তা এই যে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত অর্থনৈতিক স্বার্থ, অর্থনৈতিক শক্তি এবং ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সরকার মধ্যস্থতা করতে পারে। কমনস্ এবং অপর উদারপন্থী সংস্কারকদের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা করেই ব্যবসায়ী এবং জন-সাধারণ, শ্রমিক এবং পরিচালকমণ্ডলী, মোটের উপর বাজার-শক্তির অবাধ কার্যক্রম এবং ব্যক্তির কল্যাণ, এগুলোর মধ্যে স্বার্থের যে সংঘাত, তার সমাধান করতে হবে। সংঘাত সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গীটা এ বিষয়ে অপর দু'টি প্রধান মতাদর্শের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক দিকে নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন যে বাজারে ব্যক্তির ভারসাম্য সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের ফলে সর্বক্ষেত্রেই সংঘাত নয়, সংগতিই বিরাজ করছে; অপর দিকে মার্কস্‌বাদীরা বলতেন যে শ্রেণী সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত সামাজিক ব্যবস্থাটাকেই ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কমন্‌স এই উভয় ধারণাই মেনে নেন এবং দু'টো থেকেই আরো অগ্রসর হন। তাঁর যুক্তি ছিলঃ বাজার শক্তি আধুনিক জগতের বিপরীতমুখী স্বার্থের কয়েকটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারবে, কিন্তু সবগুলোর বেলায় তা পারবে না এবং একালের জটিল শিল্পকেন্দ্রিক সমাজে ক্রমাগত নতুন নতুন সংঘাতের সৃষ্টি হবে, যার ন্যায়সংগত সমাধানের জন্য প্রয়োজন সরকারী কার্যক্রমের।

দি নিউ-ডিল

সংস্কারের বিষয়ে ভেব্‌লেনের সমাজ–কল্যাণ দর্শন এবং কমনস্ আর তাঁর সহযোগীদের প্রবর্তিত নীতিমালার ফল লাভ হলো ১৯৩০–এর দশকে ফ্রাঙ্কলিন

www.pathagar.com

ডি. রুজভেল্টের নিউ-ডিল বাস্তবায়নের সময় যখন জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ধারণা প্রাধান্য লাভ করে। এটা অবশ্য সত্য যে ত্রিশের দশকের আগেই পুরনো চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছিলঃ যেমন, নিউইয়র্ক এবং উইস্‌কন্‌সিনের জনকল্যাণ বিষয়ক আইন প্রণয়ন, প্রথম মহাযুদ্ধের আগের সংরক্ষণ আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার জন্য ধীরে ধীরে অর্থ বিষয়ক নীতি গ্রহণ। পোপ–বাদীদের সময় থেকেই সংস্কারক আর সমালোচক, সকলেই নিউ-ডিলের সমাজ-দর্শনটাকে আকার দিয়েছেন। কিন্তু ১৯২৯–১৯৩৩ এই কয়টি বছর ছিল মার্কিন সামাজিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক সন্ধিক্ষণ এবং ১৯৩৩ সনের পরবর্তী পাঁচ বছরে পাশ করা কতকগুলো আইন যে কাঠামো সৃষ্টি করে দেয়, তারি মধ্যে কাজ করেছে মার্কিন অর্থনীতি পরবর্তী পঞ্চাশ বছর।

নিউ-ডিল (The New Deal) দর্শনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটা হচ্ছে এই বিশ্বাস যে শিল্প এবং বাজার-কেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্মগত চূর্ণবিচূর্ণকারী শক্তিগুলোর থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হলে গোটা-সমাজকে সরকারের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে। যে দর্শনে মনে করা হতো যে স্বয়ং সমন্বয়কারী বাজার-ব্যবস্থাকে অবাধে কাজ করতে দিতে হবে এবং মানুষ, অর্থ আর সম্পদকে প্রধানতঃ পণ্য হিসেবেই গণ্য করতে হবে,– তার তুলনায় এটা ছিল এক বিরাট পালাবদল।

নিউ-ডিলের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অর্থনৈতিক ব্যাপারে চার ধরনের হস্তক্ষেপের উপর জোর দেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে প্রথম ছিল যতটা সম্ভব, পূর্ণ-কর্ম নিয়োগ পর্যায়ে প্রাচুর্য বজায় রাখা, যদিও মহামন্দার (Great Depression) বেকার সমস্যাটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সমাধান করা সম্ভব হয়নি। নিউ-ডিলের মধ্যে সবচেয়ে যে পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়, তা ছিল ফেডারেল সরকারের বাজেটের মাধ্যমে মোট অর্থব্যয় পর্যাপ্ত মাত্রায় রাখা, আর ত্রিশের দশকে অপর্যাপ্ত বেসরকারী অর্থ–ব্যয়ের সম্পূরক হিসেবে সরকারী বাজেটে ঘাটতি ঘটিয়ে সেই অর্থ দিয়ে সরকারী বিনিয়োগ বাড়ানো। এই ধারণা ১৯৪৬ সনের এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্টের অংগীভূত করা হয় আর সেটার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয় রাষ্ট্রপতির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় ধরনের হস্তক্ষেপ ছিল যৌথ দরকষাকষিকে শ্রমিক–মালিক বিরোধ মীমাংসার জন্য আইনগত স্বীকৃতি দান। ১৮৯০-এর দশক থেকেই মার্কিন শ্রমিক ফেডারেশন শ্রমিকদের জন্য সুবিধা চেয়ে এসেছেন মূলত: যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে, কোন মৌলিক রাজনৈতিক কার্যক্রম বা সমাজতন্ত্রের

www.pathagar.com

মাধ্যমে। সোস্যালিস্ট পার্টি এবং একটি আমূল-সংস্কারপন্থী ইউনিয়ন 'দি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্লড্' প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত শক্তিশালীই ছিল, কিন্তু সেগুলোকে মোটামুটি ফেডারেল আর রাজ্য সরকার এবং কোর্টের দমন-মূলক ব্যবস্থার দ্বারা যুদ্ধের মধ্যে এবং পরে খতম করে ফেলা হয়েছিল- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক-অধিকারের ইতিহাসে সে একটা অন্ধকার পরিচ্ছেদ— যার ফলে শ্রমিকদের জন্য খোলা রাখা হয়েছিল শুধু যৌথ দরকষাকষির পথটাই। যদিও ব্যবসায়ীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি দল কয়েকটি বড় কর্পোরেশনের মালিকদের নেতৃত্বে যৌথ দরকষাকষির মধ্যে অবিরাম শ্রেণী সংগ্রামের সমাধান দেখতে পান। শ্রমিক নেতা আর বড় ব্যবসায়ের নেতাদের মধ্যে এই মতৈক্য, মহামন্দার দ্বারা সৃষ্ট কঠিন অবস্থা এবং ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের নির্বাচন, এরই মিলিত ফল হলো 'ন্যাশনাল লেবার রিলেশন্স অ্যাক্ট' (১৯৩৫) যাতে যৌথ দরকষাকষিকে জাতীয় নীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলো। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই আইনের কিছু সংশোধন করা হয়েছে, তবুও এই নীতি আজও পর্যন্ত (মার্কিন) জাতির অর্থনৈতিক গঠনতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে রয়েছে।

তৃতীয়তঃ একটি অপেক্ষাকৃত কম সফল হস্তক্ষেপ ছিল 'ন্যাশন্যাল রিকভারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর সৃষ্টি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এবং ব্যবসা আর প্রত্যেকটি শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার এক বৃহৎ প্রচেষ্টা। এই পরীক্ষাটা অকৃতকার্য হয় যা নিউ-ডিল কর্মসূচীর অন্যতম সর্বাধিক সমালোচিত বিষয়। নিউ-ডিল কর্মসূচীর কর্তৃপক্ষ নিজেরাই এটা বাতিল করে দেয় আর ত্রিশের দশকের শেষে অস্থায়ী জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি গ্রহণের দ্বারা প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করা হয়। এ ব্যবস্থার গুণাগুণ যাই থাক, 'ন্যাশন্যাল রিকভারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' এর মূলনীতিটি দুটি প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্প ঃপেট্রোল আর কয়লায়, এবং সামরিক শিল্পগুলোতে টিকে গিয়েছিল, যদিও এর দর্শনটা এখন আর উদারপন্থী মতাদর্শের অংশ নয়। পেট্রোলিয়াম শিল্পে রাষ্ট্রের আইন, ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ, কোর্টের সিদ্ধান্ত এবং বড় বড় কোম্পানীগুলোর স্বার্থের মিল, বাজারে মূল্য এবং মুনাফায় স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছিল ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত; অতঃপর আরব প্রধান পেট্রোলিয়াম রপ্তানীকারী দেশগুলোর সংগঠন (ওপেক) মাঠে নামলো, আর উৎপাদন এবং মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর সকল দেশের কাছ থেকেই তারা অত্যধিক মুনাফা আদায় করে। অনেকদিন ধরেই কয়লা শিল্পের বিশেষত্ব ছিল শ্রমিক আর

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনার মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা, যার ফলে উৎপাদন এবং বড় উৎপাদনকারীদের মধ্যে বাজারের অংশ ভাগের বিষয়ে একটা স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। ১৯৩০-এর দশকে শিল্পে স্থিতিশীলতা আনবার সরকারী প্রচেষ্টার ভিত্তিতে ১৯৪০-এর দশকেই গড়ে উঠে এই ব্যবস্থা। আর অবশ্যই অস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে সরকার, বৃহদায়তন শিল্প আর বৃহদায়তন শ্রমিক (সংগঠন) এদের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থের মিতালী যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরে গড়ে উঠেছে। ওটা ছিল 'ন্যাশনাল রিকভারী অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের' দর্শনকে বাস্তবে প্রয়োগের একটি কুখ্যাত উদাহরণ।

অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের ধারণাগুলোর চতুর্থ উদাহরণ ছিল পানি সম্পদের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা। 'টেনিসী ভ্যালি অথরিটি' এই শ্রেণীর পরিকল্পনায় যা নিউ-ডিলের আগের কতকগুলো নীতির, যেমন পুনরুদ্ধার, জলপথ উন্নয়ন, বন সংরক্ষণ, শহর পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিষয়ক বিতর্কের পরবর্তী পরিণতি। আজকাল অবশ্য পানি সম্পদের সম্মিলিত উন্নয়ন এবং আনুষঙ্গিক ভূমি ব্যবহারের উপযোগিতাটা আমরা বিনা বাক্যেই মেনে নেই, আর একালের বিতর্কটা হয়ে থাকে মূলতঃ সম্পদ ব্যবহারের মত অধিকতর জটিল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

ত্রিশের দশকে অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারী দায়িত্বের ক্রমবৃদ্ধির সমর্থন এসেছিল সমাজে ব্যক্তির স্থান সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। আগের দিনের কথা ছিল যে কল্যাণ-সর্বোচ্চকারী ব্যক্তি (welfare maximizing individual) গোটা সমাজের জন্যই অবদান রাখছে, আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে যারা সাফল্য লাভ করতে পারলো না, তাদের বোঝা তারা নিজেরাই বহন করবে। কিন্তু এই মত আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে যখন মন্দার চাপে শুধু বেকাররাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না, বরং বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পূর্বের মতের বদলে এখন প্রতিষ্ঠিত হলো এই বিশ্বাস যে প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই সমাজের একটি দায়িত্ব রয়ে গেছে, তার কারণ আংশিকভাবে এই যে প্রত্যেক মানুষই কাজের মাধ্যমে, পরিবার প্রতিপালন করে এবং সাধারণভাবে সামাজিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অবদান রাখছে, যার আংশিকভাবে কারণ এই যে আজকের জটিল সমাজের সমস্যাবলী যে কোন ব্যক্তির একক চেষ্টায় সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। এটা অনুভব করা গেল যে, ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য আরও ভালভাবে কাজ করতে পারবে, যদি পরিবেশটা তার জন্য অধিক নিরাপদ

www.pathagar.com

থাকে। তাই নিউ-ডিল নীতির আর একটি লক্ষ্য হয়েছিল ব্যক্তির কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এমন কতকগুলো ব্যবস্থা নেয়া, যাতে যথেষ্ট অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে যার বর্তমান ব্যয়, লাভের তুলনায় কমই থাকবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো কতকগুলো "কল্যাণমূলক ব্যবস্থা" আইন হিসেবে চালু করা– বেকার–বীমা, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, এবং স্বাস্থ্য আর শিক্ষাখাতে ফেডারেল সরকারের অনুদান (grants-in-aid) যেগুলো এখন সার্বজনীন সমর্থন লাভ করেছে। এই সব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, যা বহুকাল ধরে চলে এসেছে, সেগুলো কেবল মানবতা বোধের কারণেই করা হচ্ছে না, বরং এর দ্বারা নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রেতার চাহিদায় স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠাও এর দ্বারা সম্ভব হচ্ছে।

নিউ-ডিলের সমাজদর্শনে আর একটি মতবাদ ছিল এই যে ব্যবসায়ীদের কেবল মুনাফা লাভ ছাড়াও সামাজিক একটি দায়িত্ব রয়েছে। নিউ-ডিল পূর্ব যুগে লাভ আর সাফল্য অর্জনের যৌক্তিকতা ছিল এগুলো নিজেরাই; সম্পদ শুধু কঠিন পরিশ্রম আর যোগ্যতারই প্রতিফলন নয় বরং সম্পদের অনুসন্ধানে ছোটা অপর সকলের প্রয়োজনও মেটায়, "যেন এক অদৃশ্য হাতের দ্বারা"। বিপরীত ক্রমে বরং নিউ–ডিলের বক্তব্য ছিল এই যে বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি প্রায়ই মানবিক আর সামাজিক মূল্যবোধকে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে, আর ব্যক্তির লাভ হলে যে তা থেকে সব সময় সমাজের কল্যাণও আসবে, সেটা সত্য নয়। সাফল্য আর মুনাফাই যথেষ্ট নয়, ব্যবসাকে অন্যভাবেও তার নিজের যৌক্তিকতার কারণ দর্শাতে হবে। এই শর্তটা কোথাও বিশদভাবে লেখা ছিল না বটে, কিন্তু নিউ-ডিল আইনগুলো পাশ করার সময় ধরে নেয়া হয়েছিল যে অর্থনীতি যুক্তি-সংগত পরিমাণে স্থিতিশীল, দ্রব্যমূল্য ন্যায়সঙ্গত এবং আর্থিক কার্যকলাপ পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত।

১৯৩০-এর দশকের পরিবর্তনগুলোর আরো দুটি দিক আমেরিকা এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য গুরুত্বপুর্ণ ছিল। প্রথমতঃ সংস্কার এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচী জাতির অর্থনৈতিক আর সামাজিক অবস্থা অনেক মজবুত করেছিল। শ্রমিক ইউনিয়ন এবং যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকরা জীবন ধারণের মান বাড়াতে সক্ষম হয় এবং এর ফলে তাদের নিজেদেরকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন এবং দরকারী মানুষ বলে মনে হয়। কৃষকদের অর্থনীতি যদিও অত্যন্ত অস্থিতিশীল, তবুও তাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের অনিরাপত্তার হাত থেকে রক্ষা করা হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে বাড়ীর মালিক হতে সাহায্য করা হয়, এবং তাদের

www.pathagar.com

সঞ্চয়কে সংরক্ষিত করা হয়। বড় ব্যবসায়ীদের কোন কোন আপত্তিকর কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, এবং আরও কোন কোন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী বিধিনিষেধ সম্প্রসারণ করা হয়। বার্ধক্যের আর বেকারত্বের ঝুঁকি হ্রাস করা হয় এবং দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য এক ধরনের কল্যাণমূলক অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজও শুরু করা হয়। কোন কোন শ্রেণী অবশ্য এ ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় নি, যেমন অধিকাংশ কালো চামড়া, বহিরাগত কর্মচারী, পল্লীর দরিদ্ররা, এবং স্বল্প মজুরীর কর্মচারীরা। তবুও বলা চলে, বহু সংখ্যক মার্কিনীদেরই অর্থনৈতিক সামর্থ বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি এদের সর্মথন অধিক মজবুত হয়েছিল। পরিবর্তনের আহবানে আমেরিকার সাড়া হিসেবে নিউ-ডিল ছিল মূলতঃ একটা সংস্কার, বিপ্লব নয়।

দ্বিতীয় আর একদিক থেকে নিউ–ডিলের উত্তরাধিকারটা ছিল অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল। এই কর্মসূচীর ফলে যৌথরাষ্ট্র (corporate state) ভিত্তিক কার্যকলাপের যে মার্কিন সংস্করণ চালু হয়েছিল, অধিকাংশ মার্কিনবাসী তা মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল। ফেডারেল সরকার যখন সংস্কারের প্রধান বাহন হয়ে উঠলো এবং সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ বাড়লো, তখন রাজ্যগুলো থেকে ক্ষমতা সরে আসলো ওয়াশিংটনে। ওয়াশিংটনের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক বিভাগগুলোতে আবার ক্ষমতা সরে আসলো কংগ্রেস থেকে, যার কারণ ছিল, কিছুটা রাষ্ট্রপতির নিজের উদ্যমেই অনেক আইন পাশ করানো এবং কিছুটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, যেটার ব্যবস্থাপনা করতে হতো প্রশাসন বিভাগকেই। এই সূক্ষ্ম ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটা সে কালেও অলক্ষ্যিত থাকেনি। নিউ-ডিলের সমালোচকদের এটা ছিল একটা মুখরোচক বক্তব্য। কিন্তু এর নিহিতার্থটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময়ের আগে পরিষ্কার হয় নি, কারণ ঐ সময়েই প্রশাসনিক বিভাগের সামরিক আর জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক কাজগুলো জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাধান্য লাভ করে। এটা ঘটলো, তার কারণ কিছুটা এই ছিল যে, সমর সম্পর্কিত বিষয়ে খরচ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায় আর কিছুটা ছিল, 'ঠাণ্ডা–যুদ্ধ' নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে ব্যস্ততা আর আনুষংঙ্গিক আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ। নিউ-ডিল সংস্কারগুলো তাদের সাথে সাথে জাতীয় সরকারের জন্য এবং তার প্রশাসক বিভাগগুলোর জন্য নিয়ে এলো অধিক ক্ষমতা, যার ফলে আবার সামরিক বাহিনীর হাতে আরো অধিক ক্ষমতা চলে গেল।

ক্ষমতার সঞ্চারপথের এই স্থান–পরিবর্তনটা সিদ্ধ করা হলো শাসনতান্ত্রিক আইনের মৌলিক পরিবর্তনের দ্বারা। ১৯৩৭–১৯৩৯ এই কয় বৎসরে প্রধান নিউ-

www.pathagar.com

ডিল আইনগুলোকে বৈধ ঘোষণার প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্টের কয়েকটি সিদ্ধান্তের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার অনেক সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। ১৯৩০ সনের আগে ফেডারেল সরকার শুধু সেই সব বিষয়েই কাজ করতে পারতো, যেগুলো শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে তাদের জন্য উল্লেখ করা ছিল। ১৯৪০ সনের মধ্যে তাদের ক্ষমতা দেওয়া হলো 'সাধারণ কল্যাণমূলক কাজের উন্নয়ন' সাধন করার। ফলে একটি শাসতান্ত্রিক সীমারেখা প্রতিস্থাপিত হলো জাতীয় সরকারকে কাজ করবার অবাধ শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতার দ্বারা।

যাই হোক, নিউ-ডিল যথেষ্ট পরিমাণে বেসরকারী মালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতির অপরিহার্য উপাদানগুলোকে শক্তিশালী করে তোলে। এতে ব্যক্তির ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় বা সঞ্চয়ের, কাজ পছন্দের এবং নিজের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রক্ষা করা হয়। যদিও নিউ–ডিল দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেকটাই পুনর্গঠন করেছিল, কিন্তু তাতে কখনো বিশদ পরিকল্পনা বা নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্তি ছিল না। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারেও কখনো হাত দেয়া হয়নি– মার্কিন ব্যক্তিতাবাদের যেটা ছিল একটি প্রধান মতাদর্শ। অধিকন্তু, এতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার মৌলিক কাঠামোতে কখনো হাত দেয়া হয়নি– আর সে অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান কর্পোরেশনগুলোর প্রাধান্য বজায় রয়েছে, তা ছাড়া নিউ–ডিল আয় আর সম্পদের বন্টনে পরিবর্তন আনার জন্যও তেমন কিছুই করেনি।

১৯৩০ –এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছে আর অর্থনৈতিক দর্শনেও এক মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। 'লেজে ফেরে'র (laissez-faire) সেকেলে আদর্শের স্থান দখল করেছে হস্তক্ষেপ প্রবণ জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক দর্শন। তা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতি এবং ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ের মৌলিক কাঠামো বজায় রাখাই হয়েছে, এই দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম অন্যান্য সকল শিল্পোন্নত দেশগুলোর অনুরূপ। ১৯৩০–এর দশকে সরকারী ভূমিকা সম্প্রসারণের সমর্থক এবং পুরনো চিন্তা এবং নীতির সমর্থদের মধ্যে কঠিন রাজনৈতিক এবং মতাদর্শের সংঘাত ঘটেছে। তবুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী দশক গুলোতে বেসকারী খাতের যৌথ অর্থনৈতিক শক্তি (corporate economic power) এবং জাতীয় সরকারের সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তির মধ্যে এক স্বার্থের মিতালী (symbiosis) গড়ে উঠেছে। এমন ধরনের পরিণতির আশংকাই ছিল শতাব্দীর শুরুতে ভেব্‌লেনের ভবিষ্যদ্বাণীতে অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্রী এবং সামরিক শিল্পোন্নত সমাজ। কে জানে, তাঁর কথা একদিন ঠিক হয়ে যেতেও পারে।

www.pathagar.com

৯
কেইন্‌সীয় বিপ্লব

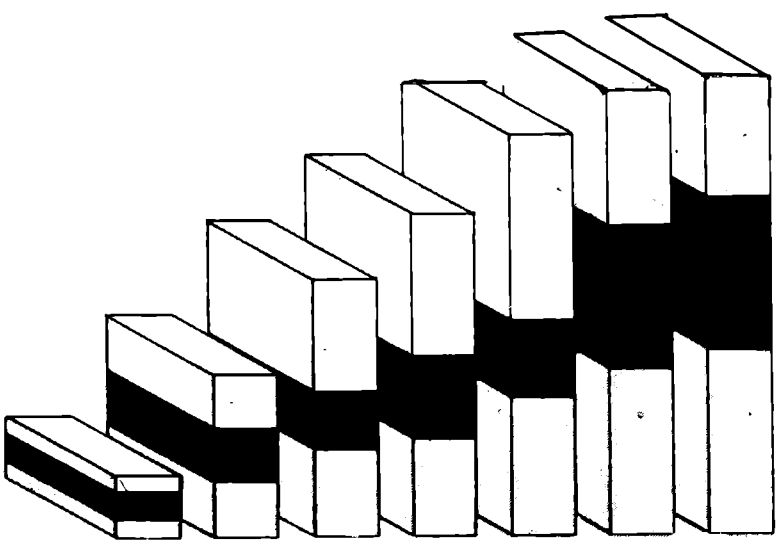

১৯৩৬ সনে মাত্র একটি গ্রন্থ প্রকাশের ফলে আধুনিক অর্থনীতির সম্পূর্ণ গতিপথ এবং বৈশিষ্ট্যের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। এর বেয়াড়া রকমের নামটা ছিল 'দি জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট, এ্যান্ড মানি' এবং এর লেখক ছিলেন তদানীন্তন সর্বাধিক বিতর্কিত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস্। এতে সমস্যামূলক কর্মসংস্থান এবং বেকারত্বের পর্যালোচনা করা হয় এমন একটি সময়ে, যখন বিশ্ব–অর্থনীতি এক ধ্বংসকারী আর সর্বাধিক ব্যাপক মন্দার কবলে পড়ে জর্জরিত হচ্ছিল। যদিও সে সময়ে অনেকেই বিশ্ব–অর্থনীতির

www.pathagar.com

পুনর্গঠন এবং সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছিল তখন এই গ্রন্থটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, রোগীর ব্যাধি কঠিন বলে নির্ণয় করলেও এতে মত দেয়া হয় যে আরোগ্যের সম্ভাবনা আছে এবং অর্থনীতির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কতকগুলো ঔষধের ব্যবস্থাপত্রও দেয়া হয়। তৎক্ষণাৎ কেইনস্ এবং তার কর্মনীতিমূলক উপদেশগুলো পেশাদার অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদদের বিতর্কের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। যদিও এগুলো বামপন্থী মৌলিক সংস্কারবাদী এবং ডানপন্থী রক্ষণশীল উভয়দলের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হলো, তবুও কেইনস্ সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এক নতুন গোঁড়া মতবাদ সৃষ্টি করে, 'ওয়েলথ্ অব নেশানস্' এবং 'ক্যাপিটালে'র সমতুল্য এই 'জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট' অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ হয়ে রয়েছে।

জন মেনার্ড কেইনস্

সামাজিক চিন্তায় সৃষ্ট এই বিপ্লবের নায়ক ব্যক্তিটি ছিলেন ইংল্যান্ডের নাগরিক জীবনে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। যে স্বল্প সংখ্যক সামাজিক এবং বুদ্ধিজীবী মহল ইংল্যান্ডের সরকারী কর্মকাণ্ডে প্রভাবশালী ছিলেন, তিনি সেই দলেরই একজন এবং প্রচলিত অর্থনৈতিক কর্মনীতি সম্পর্কে তাঁর খোলাখুলি সমালোচনা সে সময়ের এই শাস্ত্রের দিকপালদের যা কিছু বিশ্বাস ছিল তাতে কড়া আঘাত হানে। কেইনস্ ছিলেন সরকারের মধ্যেই সরকারের একজন সমালোচক।

১৮৮৩ সনে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে কেইনসের জন্ম হয়, তাঁর পিতা জন নেভিল কেইনস্ একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং নৈয়ায়িক ছিলেন। এটন্ এবং কেমব্রিজে তিনি শিক্ষা পান দর্শন আর অর্থনীতিতে। আলফ্রেড মার্শালের একজন প্রিয় এবং গুণী ছাত্র হিসেবে কেইনস্ নিও-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির অপরিহার্য বক্তব্যগুলো ভালভাবে বুঝে নেন এবং সর্বদাই এর উৎপাদন আর বন্টনের বিশ্লেষণ-অংশ সমর্থন করতেন। তাঁর পারদর্শিতার এলাকা ছিল অর্থ-বিষয়ক অর্থনীতি (monetary economics) এবং কেমব্রিজে বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও তিনি সরকারের ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থাপনা সমস্যার উপর এবং সরকারী ট্রেজারীতে কাজ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগের বছরগুলোতে তিনি 'ব্লুমস্‌বেরী শিল্পী ও লেখক সংঘের' একজন সদস্য ছিলেন, যে সংঘে লিটন স্ট্র্যাসী, ই. এম. ফর্স্টার,

www.pathagar.com

ভার্জিনিয়া উলফ্ এবং রজার ফ্রাই-এর মতো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দলটির মনোভাব ছিল স্ট্র্যাসীর 'এমিনেন্ট ভিক্টোরিয়ানস্'দের জীবনীর মাধ্যমে তাদের প্রতি লোকের ভ্রান্ত শ্রদ্ধা ভেঙ্গে দেয়ার উদাহরণেরই অনুরূপ-বুদ্ধিদীপ্ত,সমালোচনাপূর্ণ, কিন্তু মোটের উপর প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান সুরটা মেনে নেয়ার মানসিকতা। কেইন্‌সের নিজের মনোভাবটাও ছিল অনুরূপঃ এমন একটি আরামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শ্রেণীতে তিনি লালিত হয়েছিলেন, যার মানুষেরা মনে করতো যে বুদ্ধি, শিক্ষা আর ঐকান্তিকতার দ্বারা অপরদের শাসন করবার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে- তবুও তিনি নিজে সর্বদাই চেষ্টা করতেন, কি করে চালু কাঠামোর সেই প্রাচীন বিশ্বাসের মধ্যে বাস করেও সব-কিছুতে উন্নততর পদ্ধতি বের করা যায়। সবদিক বিবেচনা করলে কেইন্‌সকে বলতে হয় একজন বুদ্ধিদীপ্ত ছোট লোক (snob), তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয় আর মনটা ছিল এমনই বিশ্লেষণ-পটু যে সহজেই কোন সমস্যার বিষয়ে গভীর চিন্তা করে, তার প্রধান অংশগুলো ভাগ করে তার সাথে অন্যান্য ঘটনার সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারতেন। বুদ্ধিজীবীদের একটা বাছাই করা অংশ যদি বরদাস্ত করতেই হয়, তা হলে কেইন্‌সের মতো লোককে তার অংশ হিসেবে পাওয়াটা বরং একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

কেইনস্ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সরকারের অর্থ-দপ্তরে (treasury) কাজ করেন, অর্থ-বিষয়ে একজন পারদর্শী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন এবং ১৯১৯ সনে অর্থ-দপ্তরের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে ভার্সাইতে শান্তি সম্মেলনে যান। বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে একটা স্বজ্ঞাত ধারণা এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান থাকার ফলে তিনি বুঝেছিলেন যে স্থায়ী শান্তি নির্ভর করতো জার্মানীর জন্য একটা সদয় মিটমাটের ব্যবস্থা এবং বাস্তবধর্মী ক্ষতিপূরণ ধার্য করার উপর। কূটনীতিজ্ঞেরা যখন সীমানা, সীমান্ত আর জাতীয় মর্যাদা নিয়ে তর্ক করছিলেন, কেইনস্ তখনই বুঝেছিলেন যে ইউরোপের অর্থনৈতিক সমস্যা তার রাজনৈতিক সমস্যার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবী আর অর্থনৈতিক বাস্তবকে উপেক্ষা করে শান্তি চুক্তিটা যখন উল্টো পথে গড়াচ্ছিল, কেইনস্ তখন পদত্যাগ করে বাড়ী ফিরে এলেন- ঐ শান্তি চুক্তি আর তার প্রস্তুতকারীদের কঠোর সমালোচনা করে কিছু লিখবার জন্য। সে যুগের সবচেয়ে বেশি ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ 'দি ইকনমিক কন্‌সিকুয়েন্সেস্ অব পীস' নামক গ্রন্থে তিনি, ঐ চুক্তি ভেঙ্গে পড়বে আর অর্থনৈতিক দুর্যোগ নেমে আসবে বলে যে

www.pathagar.com

পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, তা সত্য হয়েছিল। বইটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এটা লেখার ফলে প্রায় এক দশক সরকারের সাথে তাঁর আর কোন যোগাযোগ ছিল না।

তিনি কেমব্রিজেই বক্তৃতা দিতে ফিরে গেলেন এবং দু'টি বীমা কোম্পানীর এবং কয়েকটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা, শেয়ার আর কমোডিটি একচেঞ্জ ফাট্‌কাবাজারি করলেন এবং নির্বাহিকের কাজ করলেন। এর ফলে তাঁর প্রচুর ধনার্জন হয়। তিনি লিবারেল পার্টির একজন কার্যকর সমর্থক হয়ে গেলেন, 'দি নেশন্' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রচুর লিখলেন, শিল্প, সঙ্গীত আর 'ব্যালে' নাচের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন এবং 'ডিয়াঘীলেভ্ ব্যালের' একজন প্রখ্যাতা নর্তকীকে বিয়ে করলেন। ১৯২৯-এর শেয়ার বাজার বিপর্যয়ে তিনি প্রচুর সম্পত্তি হারালেন এবং ঋণ করে আবার ফাট্‌কাবাজারী শুরু করে ১৯৩০-এর দশকে অনেক সম্পত্তি অর্জন করেন।

কেইনস্ ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক কর্মনীতির সমালোচনা করেন, বিশেষভাবে যখন তারা ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'স্বর্ণ–মানে' (gold standard) ফিরে গিয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন, আর এই বিতর্ক থেকেই সৃষ্টি হয় অর্থনীতিতে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কেইনস্ ঐ নীতির সমালোচনা করে বলেন যে ওটার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যটা ভুল, বরং দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক কল্যাণের বিকাশই ছিল অধিক প্রয়োজনীয়। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে পাউন্ডের বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার চেয়ে মূল্যমানের স্থিতিশীলতা এবং উচ্চহারে কর্মসংস্থান অধিক কাম্য বলে তিনি যুক্তি দেখান। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধের আগের বিনিময় হারে স্বর্ণ–মানে ফিরে গেলে ইংরেজদের রফতানি ভীষণভাবে হ্রাস পাবে এবং তার ফলে দেশের অভ্যন্তরে মজুরী, মূল্য, কর্ম–নিয়োগ এবং উৎপাদনও হ্রাস পাবে। যেমনটা ঘটেছিল ঐ ধরনের নীতির ফলে নেপলিয়নের যুদ্ধগুলোর শেষে ঠিক এক শতাব্দী আগে। কেইনস্ স্বনিয়ন্ত্রিত স্বর্ণ-মানের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থার (managed monetary system) সুপারিশ করেন। কিন্তু অর্থ দপ্তরের অন্ধবিশ্বাসীদের মত পরিবর্তন করানো গেল নাঃ ইংল্যান্ড স্বর্ণ-মানে ফিরে গেল, দুর্যোগ নেমে আসলো বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং জাতীয় পর্যায়ে এক সাধারণ ধর্মঘটসহ। বিশের দশকের বাকী সময়টায় ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে নিশ্চলতা বিরাজ করে। কেইন্‌সের ভবিষ্যদ্বাণী আর একবার সফল হলো।

www.pathagar.com

কেইন্‌সের কথাকে ১৯২৩–২৪ সনে কেউ তেমন আমল দেয়নি, তার একটা কারণ ছিল এই যে, সে সময়ে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কোন সার্থক তাত্ত্বিক যুক্তি দেখাতে পারেননি। সরকারের মুদ্রানীতিতে যে মুদ্রাসংকোচমূলক ফল হবে, সেটা প্রমাণ করার জন্য স্বর্ণমান আর দেশের অভ্যন্তরে কর্মনিয়োগের মাত্রার মধ্যকার সম্পর্কগুলোর বিশ্লেষণ করা তাঁর উচিত ছিল, আর প্রমাণ করা উচিত ছিল যে গোঁড়া অর্থনীতির বিশ্লেষণে ওই সম্পর্কগুলো যেভাবে দেখানো হয়েছে, যা সে'র বাজার সূত্র সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়; সেগুলো ভুল। ঠিক ঐ মূহূর্তে তিনি এটা করতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর কৌতূহলী মনের দৃষ্টিতে তিনি বুঝেছিলেন যে কর্ম-নিয়োগের তত্ত্বটার (Theory of Employment) পূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন আর এর সাথে অর্থের তত্ত্বের (Monetary Theory) একটা সম্পর্কও গড়ে তোলা দরকার। এই কাজেই কেইনস্ পরবর্তী বারোটা বৎসর ব্যয় করেন।

তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা, দু'খণ্ডে রচিত 'ট্রিটিজ অন মানি' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সনে শেয়ার বাজারের পতনের (stock market crash) ঠিক পরেই,কিন্তু এতে কাজ হলো না। নানা বিচারে এটাই ছিল কেইন্‌সের সবচেয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ এবং এতে তাঁর নতুন তত্ত্বের মূল কাঠোমোটা দেয়া হলেও যথেষ্ট তাত্ত্বিক প্রশ্ন অমীমাংসিতই রাখা হয়েছিল, ফলে পেশাদার মহলে এটা গ্রহণ করার বদলে সমালোচনাই বেশী হলো। তবুও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই বইয়ের প্রধান যুক্তি ছিল বিনিয়োগ আর সঞ্চয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং ঐ দু'টির লক্ষ্যে যে প্রেরণা কাজ করছে তার ভিন্নতা। সে'র সূত্রে বলা ছিল যে ও দু'টি এক সমান হতে হবে, কিন্তু কেইন্‌সের যুক্তি ছিল ওই দু'টি সমান নাও হতে পারে। যখন সঞ্চয় বিনিয়োগের চেয়ে বেশী হবে তখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে, যদি বিপরীতটা সত্য হয়, তা হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। প্রতিকারে কেইনস্ আগেও যা বলেছিলেন, এখনো তাই বললেন–নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা– যাতে করে সঞ্চয় আর বিনিয়োগকে পরস্পরের সমান পরিমাণে রাখা যায় আর এরই দ্বারা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যাবে, আর সম্পূরক হিসাবে সরকারী পূর্তকর্মে (public works) অর্থ ব্যয় করতে হবে, মন্দাভাব বা বেকারত্ব যা কিছু ঘটে থাকে, তার তীব্রতা হ্রাসের জন্য।

যখন 'ট্রিটিজ' প্রকাশিত হয়েছিল, সে সময় অর্থনীতিবিদগণ এবং সরকার উভয়ই মন্দাটা যে এমন তীব্র হবে, তা আন্দাজ করতে পারেনি। জনমত তখনো কোন গুরুতর প্রতিকার ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেনি এবং অধিকাংশ

www.pathagar.com

লোকই বাজারের সংকোচনটা স্বল্পস্থায়ী হবে বলে আশা করেছিল। কেইনস্ অবশ্য তাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং আবার লেখায় মনোনিবেশ করলেন, প্রচলিত অর্থনৈতিক ধারণাবলীর উপর দ্বিতীয় দফা সম্মুখ আক্রমণের জন্য।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের জনমত

কেইন্সের এই পর্যায়ের পরিশ্রমের ফল হলো 'দি জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এ্যান্ড মানি'। বইটি প্রকাশের সাথে সাথে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তার কারণ এই নয় যে 'ট্রিটিজের' পরে এতে কোন মৌলিকভাবে পৃথক তত্ত্বের প্রস্তাবনা ছিল। আসল কারণ এই যে ১৯৩৬ সনে যখন এটার প্রকাশনা হয় ততদিনে এই বই গ্রহণ করবার উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত হয়ে গেছে। প্রথমতঃ কেইনসের আগের বইটি অর্থনীতিবিদ এবং সরকারের নীতি প্রস্তুতকারীদের তাঁর বক্তব্যের সাথে সাধারণভাবে পরিচয় ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ ইতিপূর্বে অপর কোন কোন অর্থনীতিবিদও সে'র বাজার সূত্রের গোঁড়ামী আর তার সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো খণ্ডন করেন। এবং তৃতীয়তঃ মতামতের পরিবেশেও পরিবর্তন এসেছিল; মহামন্দার বছরগুলোতে এই মত সকলের কাছেই ক্রমশঃ অধিক গ্রহণীয় বলে মনে হলো যে উন্নতির পরিমাণটা সর্বমোট ব্যয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

কেইন্সের পরবর্তী বিশ্লেষণের একটি প্রধান উপাদানের বিকাশ ঘটে মাইকেল তুগান-বারানোস্কি (১৮৬৫-১৯১৯) নামক একজন মার্কস্ প্রভাবিত রাশিয়ান অর্থনীতিবিদের হাতে। তাঁর যুক্তি ছিল যে মোটামুটি নির্দিষ্ট আয় সম্পন্ন ক্রেতাদের কাছ থেকে পুঁজির বাজারে সঞ্চয়ের একটা নিয়মিত প্রবাহ আসতে থাকে, অপর পক্ষে বিনিয়োগের প্রক্রিয়াটা স্বভাবতঃই অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। এর ফলে সঞ্চয়ের প্রবাহ আর বিনিয়োগের প্রবাহের মধ্যে যে অসমতার সৃষ্টি হয়, সেটাই হচ্ছে ব্যবসায়িক চক্রের আসল কারণ। এই সব অসমতার প্রতিকার করা শুধু সুদের হার পরিবর্তন দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ যারা সঞ্চয় করে, তাদের অনেকেই সুদ থেকে অর্জিত লাভের হার ছাড়া আরো অন্যান্য প্রেরণার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ পথ সৃষ্টি হয় নুট উইক্সেল (১৮৫১-১৯২৬) নামক এক ব্যতিক্রমগ্রস্ত সুইডিশ অর্থনীতিবিদের দ্বারা, যিনি একবার সাধারণ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রচার করে প্রচলিত আইনের বরখেলাফ কাজের অভিযোগে কিছুকাল জেল খেটেছিলেন। যাই হোক, উইক্সেল ছিলেন একজন মেধাবী

www.pathagar.com

পণ্ডিত যাঁর কাজের ফলেই পরবর্তীকালের সুইডিশ অর্থনীতিবিদগণ এবং কেইনস্ কর্তৃক একালের জাতীয় আয় সম্পর্কিত তত্ত্বের বিকাশ সম্ভব পর হয়েছিল।

সে'র বাজার সূত্রের (Say's Law of Market) পূর্ণ-কর্ম নিয়োগের গোঁড়া তত্ত্ব অনুসারে টাকা সঞ্চয় করা হলেই তা টাকার বাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগের দিকে পথ করে নেবে। সঞ্চয় যদি বিনিয়োগের চেয়ে বেশি হবার কোন লক্ষণ দেখা দেয়ই, তাহলে সুদের হার কমে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করে দেবে; বিনিয়োগ যদি সঞ্চয়ের চেয়ে পরিমাণে অধিক হয়ে পড়ে, তবে সুদের হার বেড়ে গিয়ে আবার সমতা প্রতিষ্ঠা করে দেবে। সঞ্চয় আর বিনিয়োগের এই সমতা যদি তুলনামূলকভাবে চড়া দ্রব্যমূল্য আর উচ্চ মজুরীর মাত্রায় ঘটে থাকে, যাতে বাজারে কিছু কর্মহীন শ্রমিক রয়ে গিয়েছে, সে অবস্থায় মজুরীর হারটা পড়ে যাবে, তার সাথে দ্রব্যমূল্যও কমতে থাকবে, যতক্ষণ না সব কয়টি সম্পদই লাভজনকভাবে কাজে ব্যবহৃত হয়ে যায়।

কিন্তু উইক্‌সেল লক্ষ্য করেছিলেন যে বাস্তবে ঘটনা যা ঘটে থাকে, তাতে এই তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ হয় না। বিপরীতক্রমে, মন্দার সময় যখন ঋণ আর বিনিয়োগ দু'টোই নিম্ন পর্যায়ে থাকে আর লোকের হাতে নগদ টাকার জমা (hoarding of cash) বেড়ে যায়, সূদের হারটাও চড়া থাকে, আর ঋণ করাটাও প্রায় অসম্ভব থাকে। অপরপক্ষে বাজার যখন চূড়ান্ত রকমে সরগরম (peak of boom) থাকে, যখন বিনিয়োগ উচ্চ পর্যায়ে থাকে আর হাতে নগদ টাকার পরিমাণ (cash balances) কম থাকে, তখন সুদের হারও তুলনামূলকভাবে কমই থাকে। বস্তুতঃ এই অবস্থা তত্ত্বের বক্তব্যের একেবারেই বিপরীত, তাই উইক্‌সেল তত্ত্বটা পুনর্গঠনের চেষ্টা নেন। তিনি বললেন, পূর্ণ কর্মনিয়োগ আর সঞ্চয় বিনিয়োগ সমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা প্রাকৃতিক সুদের হার আছে কিন্তু সুদের বাজার দর এই প্রাকৃতিক হারের চেয়ে কয়েকটি কারণে ভিন্ন হয়ে যেতে পারে, আর তা যখন ঘটে, তখন অর্থনীতি সম্প্রসারিত অথবা সংকুচিত হতে পারে। আসল কথাটা এই যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য (natural equilibrium) আসে সুদের হার পরিবর্তনের দ্বারা নয়, তা আসে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রার (level of economic activity) পরিবর্তন দ্বারা-অর্থাৎ, উৎপাদনের এবং কর্ম-নিয়োগের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধির দ্বারা।

এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের রূপদান (formulation) থেকেই শেষ পর্যন্ত আসে কেইন্‌সীয় বিপ্লব। সুদের প্রাকৃতিক আর বাজার নির্ণীত হার সম্পর্কে উইকসেলের এই ধারণাটা কিছুদিনের মধ্যেই এমন কি সুইডিশ অর্থনীতিবিদদের

www.pathagar.com

মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রতিভাশালী অনুসারীরাও ভুলে গেলেন, যে দলে ছিলেন গুনার মিরডাল, বার্টিল্ ওহলিন, আর দাগ্ হ্যামারশোল্ড যিনি পরে জাতিসংঘের একজন মহান সেক্রেটারী জেনারেল হয়েছিলেন। কিন্তু উইক্সেলের ভারসাম্য সৃষ্টিকারী অধিযন্ত্র (equilibrating mechanism) হিসেবে অর্থনীতিতে মোট ব্যয়ের মাত্রা বিষয়ক ধারণাটা টিকে যায় এবং এখন আমরা জাতীয় আয় সম্পর্কিত যে অর্থনীতি পড়ি, তারই অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডি.এইচ. রবার্টসন ছিলেন উইক্সেলের চেয়ে কেইন্সের কাছাকাছি। তিনি ছিলেন কেমব্রিজে কেইন্সের একজন কনিষ্ঠ সহকর্মী। ১৯২৬ সনে রবার্টসন একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তকে ব্যবসায়িক চক্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সঞ্চয় আর মূলধনমূলক জিনিসের (capital goods) চাহিদার মধ্যেকার সম্পর্কের উপর জোর দেন। তিনি দেখান যে ব্যাংকের দায়িত্ব দ্বিবিধ, ব্যবসায়ের জন্য সঠিক পরিমাণে চলতি মূলধন যোগানো, আর সেই সঙ্গে জনসাধারণের হাতে এমন পরিমাণ নগদ টাকা দেয়া যেটা এ সময়ের মূল্যমানের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাঁর মতে ভারসাম্য রক্ষা করা একটা দৈবাধীন ব্যাপার আর অর্থনীতির পক্ষে তা অর্জনের চেষ্টা থেকে জন্ম নেয় ব্যবসায়িক-চক্রের উঠানামা। এই বিশ্লেষণেও এমন কতকগুলো চলকের উপর জোর দেয়া হলো, কেইনস্ যা নিয়ে কাজ করছিলেন, আর তার ফলেই অর্থনীতিবিদরা এ সম্পর্কিত ধারণাগুলোর সাথে আগেই কিছুটা পরিচিত হতে পারে।

এই সব তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সম্পূরক ছিল ১৯২০-এর দশকে জাতীয় আয়, ব্যয়, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে সম্পন্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণাসমূহ, যেগুলো কেইন্সীয় অর্থনীতির বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখে এবং তার বাস্তব ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। যুক্তরাষ্ট্রে এই অনুশীলনের অনেকটাই করা হয় 'ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকনমিক রিসার্চে' সাইমন কুজনেটের পরিচালনায়, ইংল্যান্ডে আর্থার বাউলীর দ্বারা এবং সুইডেনে স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর অধিকাংশ গবেষণার জন্য আর্থিক সমর্থন এসেছিল রকেফেলার পরিবারের সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন ফাউন্ডেশন থেকে।

একটি নয়া অর্থনীতির জন্য পথ প্রস্তুত হলো, মত তাত্ত্বিক এবং পরিসংখ্যান বিষয়ক পরিবর্তনের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০-এর দশকে উইলিয়াম টি. ফস্টার এবং ওয়াড্ডীল ক্যাচিংস তিনটি সমধিক পঠিত গ্রন্থে জোরেসোরে বলেন যে, যদি উৎপাদন উচ্চ পর্যায়ে বজায় রাখতে হয়, তবে ক্রেতার ব্যয়ও উচ্চ পর্যায়ে রাখতে হবে। তাঁরা ব্যয়ের একটি চক্রাকার

www.pathagar.com

প্রবাহের ধারণা গড়ে তোলেন, যেখানে যুক্তি দেয়া হয় যে সমৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে ক্রয় ক্ষমতাটা অবিরাম উৎপাদনকারীর থেকে ক্রেতার পকেটে যেতে হবে এবং ক্রেতার কাছ থেকে আবার তা উৎপাদনকারীর কাছে যেতে হবে। মুনাফা এবং সঞ্চয় সাথে সাথেই ব্যয় করে ফেলতে হবে, নচেৎ প্রবাহের চক্রটা বাধাপ্রাপ্ত হবে, উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং বেকারত্ব দেখা দেবে। ভোগটা যে উৎপাদনের সমপর্যায়ে রাখার জন্য উৎসাহিত করতে হবে, এই যুক্তি ছিল গোঁড়া তত্ত্বের সরাসরি উল্টো যুক্তি, কারণ সে তত্ত্বের কথাটাই ছিল এই যে উৎপাদন আপনা থেকেই তার নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে।

এই মতের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে তথাকথিত 'অর্থবিষয়ক বাতিকগ্রস্ত'দের লেখাগুলো। এই দলটি পূর্ণ সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য ব্যয়ের মাত্রা বজায় রাখার জন্য বহু ধরনের অর্থবিষয়ক পরিকল্পনার (monetary schemes) উদ্ভব করেন। এরা কয়েক ধরনের 'হাস্যকর টাকা' (কুৎসাকারীদের ভাষায়) প্রচলনের সুপারিশ করেন, যেমন সোনার পরিবর্তে সংরক্ষিত জিনিসের (reserve of commodities) ভিত্তিতে নোট ছাপানোর ব্যবস্থা যাতে উৎপাদনের মাত্রার ভিত্তিতে টাকা ছাড়া যায়; 'স্ট্যাম্প-দেয়া টাকা" যার উপরে একটা তারিখের ছাপ মারা থাকবে যাতে সময়ের সাথে সাথে টাকার মূল্যও কমে যেতে থাকবে যে কৌশলের দ্বারা লোককে দিয়ে তাড়াতাড়ি টাকা খরচ করানোর ব্যবস্থা থাকবে; অথবা ব্যাংকে তাদের আমানতের পূর্ণ পরিমাণ টাকা (একটি ক্ষুদ্র অংশের পরিবর্তে) সংরক্ষিত রাখতে বাধ্য করা, যাতে করে তারা ঋণ দানের মাধ্যমে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে অর্থনীতির অতিরিক্ত সম্প্রসারণ ঘটাতে না পারে। ১৯২০-এর দশকে এই রকম আরো সব প্রকল্পের প্রচার করেন নোবেল-বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক সড্ডি, একজন যুক্তি দিয়ে বুঝানোর ক্ষমতাসম্পন্ন ভূতপূর্ব ইংরেজ সেনাবাহিনীর অফিসার ক্লিফোর্ড ডগ্‌লাস্, জার্মান ব্যবসায়ী সিল্‌ভিও গেজেল এবং এমন কি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্যমান্য অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার পর্যন্ত অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এইসব ধারণা হেসে উড়িয়ে দেন, যদিও এসবের কারণ ছিল কিছুটা ঐ গোঁড়া অর্থনীতিতে টাকার সরবরাহ এবং চাহিদার উপর জোর দেয়াটা। কিন্তু বলতে হবে সে সময়ে ওরকম ধারণাগুলোর একটা জনপ্রিয়তাও ছিল। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে আরভিং ফিশারের ধারণাগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য 'স্টেবল্ মানি অ্যাসোসিয়েশন্' নামে একটা সমিতি গঠন করা হয়েছিল। এই সমিতির সদস্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যাংকাররা, রেল-রোড প্রেসিডেন্টরা

www.pathagar.com

এবং এমন কি ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের বোর্ড অব গদভর্নরদের একজন প্রাক্তন সদস্য পর্যন্ত।

এসব ধারণা থেকে বোঝা যায় তৎকালে অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিলো। প্রায় একশত বৎসরেরও বেশী সময় ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিল্পোন্নয়ন চলার পর অবশেষে অর্থনীতির ভারকেন্দ্রটা বিনিয়োগকারী থেকে সরে আসছিলো ক্রেতাতে। শিল্পায়ন যখন শুরু হচ্ছিল তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় উৎস ছিল সেই সব শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ, যেগুলোর অধিকাংশই অপর শিল্পগুলোকে সরবরাহ করতো–ইস্পাত, কয়লা, যন্ত্রপাতি বা রেলরোড। রিকার্ডো এবং তাঁর অনুসারীদের ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি অর্থনৈতিক চিত্রপটের সেই বাস্তবতারই প্রতিফলন ছিল এবং তাঁরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি তত্ত্ব খাড়া করেন, মূলতঃ বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার উপরেই এবং এই ধারণার উপরে যে 'সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য বিনিয়োগ,' কিন্তু শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে সাথে আয় যখন বৃদ্ধি পেতে থাকলো, তখন ক্রমশঃ ক্রেতাদের ব্যয় এবং সঞ্চয়ের ধরনটা অধিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। উচ্চতর আয় ক্রেতাদের অধিক পরিমাণে বাড়ী, আসবাবপত্র, গাড়ী এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মতো স্থায়ী ব্যবহারের জিনিসপত্র (durable goods) ক্রয়ের ক্ষমতা এনে দিলো। এই সব জিনিস কেনার জন্য ক্রমে ক্রমে মূল্য পরিশোধের (instalment financing) সুবিধা দেয়ার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো, সঞ্চয়টা এবার বীমা পলিসি আর বন্ধক–পরিশোধের ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করলো। ক্রেতা–ভিত্তিক শিল্পগুলো এবার সমৃদ্ধি আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির 'দলের চাঁই' হয়ে উঠলো, যে কারণে অর্থনীতির প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দিলো। এ পরিবর্তন ধীরে ধীরে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রে, এটা শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আর পশ্চিম ইউরোপে তা এসেছে, আরো পরে, কিন্তু এর ফলে পরিবর্তিত হয়েছে শিল্প, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর সব কর্মনীতি। অর্থনীতিতে এর ফলে সঞ্চয়ের বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর আরোপিত পূর্বের গুরুত্ব ক্রমশঃ অচল হয়ে এসেছে এবং সঞ্চয়ের আপনা থেকেই বিনিয়োগ হওয়ার ধারণাটা বাস্তব জগতে ক্রমশঃ কম প্রযোজ্য হয়ে যায়।

১৯৩০–এর দশকের মহামন্দা অনেক লোককেই এই পরিবর্তনটা অনুভব করতে এবং পুরনো ধারণাগুলোর অপ্রাসংগিকতা বুঝতে বাধ্য করে। শুধু দুর্যোগের বিশাল পরিমাণটাই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একটা পুনর্বিবেচনা করানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিলঃ প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রায় প্রতি চার জন শ্রমিকের একজন কর্মহীন হয়ে পড়ে, পৃথিবী ব্যাপী ব্যাংকগুলো অপ্রস্তুত হয়ে দরজা বন্ধ

www.pathagar.com

করে দেয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেউলিয়াত্ব পায়, কৃষকরা তাদের জমি হারায় এবং গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়লো, যখন আয় এবং সেই সাথে ব্যয় হ্রাস পেলো। এই বিপর্যয়ের যে ব্যাখ্যাটা সহজ বুদ্ধিতে আসে, তা এই যে, অর্থ ব্যয় বিপুলভাবে হ্রাস পেয়ে ছিল, আর সহজ বুদ্ধিতে এর প্রতিকারটাও ছিল–বিরাট আকারে ব্যয় বাড়ানো।

যুক্তরাষ্ট্রসহ অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে এই সহজ বুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই পূর্ত-কর্মে সরকারী ব্যয় বিপুলভাবে বাড়ানো হয়, ঋণের সাহায্যে এবং মন্দা আর বেকারত্বের কষ্ট তাতে কিছুটা লাঘবও হয়। কিন্তু এ নীতির যৌক্তিকতাটা ছিল মানবতাবোধ আর বাস্তব অবস্থার বিবেচনায়, এটা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে করা হয়নি। গোঁড়া অর্থনৈতিক তত্ত্ব তখনো তারস্বরে ঘোষণা করেই যাচ্ছিল যে 'ব্যবসায়ের বিশ্বাস' ফিরে না আসা পর্যন্ত কোমরের রশি আরো শক্ত করে বাঁধতে হবে এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে শুল্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মজুরী হ্রাসের দ্বারা মুনাফার পুনরুদ্ধার করতে হবে। পরিবর্তনের উপযুক্ত সময় তখন এসে গিয়েছিল।

দি জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট

কেইনস্ তাঁর বইয়ের জোরাল এক–প্যারার প্রথম পরিচ্ছেদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক তত্ত্বের এই বিপ্লব ঘোষণা করেনঃ

"এই বইটিকে আমি 'কর্মনিয়োগ, সুদ আর টাকা বিষয়ক সাধারণ তত্ত্ব' নাম দিয়েছি, এবং 'সাধারণ' কথাটার উপর জোর দিয়েছি। এই ধরনের শিরোনামার কারণঃ যাতে আমার যুক্তি আর সিদ্ধান্তের প্রকৃতির সাথে এই শাস্ত্রের 'ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের' পার্থক্যটা পরিষ্কার ধরা যায়, যে তত্ত্বের অনুশীলনে আমার নিজেরও শিক্ষা ছিল এবং যারা বাস্তব এবং তাত্ত্বিক উভয়বিধ অর্থনৈতিক চিন্তাজগতে এ যুগের প্রশাসন এবং প্রশিক্ষণে নিযুক্ত, উভয় শ্রেণীর মধ্যে, তথা বিগত এক শত বৎসর ধরেই প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। তা ছাড়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে যে বিশেষ অবস্থাটা ধরে নেয়া হয়েছে, সেটা আমরা এখন যে অর্থনৈতিক সমাজে বাস করছি, তার সম্পর্কে খাটে না, যার ফল এই যে, ঐ শিক্ষা আমাদের বিপথে চালিত করে এবং বাস্তব ঘটনাতে তার প্রয়োগ হয়ে পড়েছে সর্বনাশা।"

এই গ্রন্থটি বেকার সমস্যা কেন হয় তার বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক তাত্ত্বিকদের জন্য লেখা নেহায়েৎ পারদর্শীদের বুঝবার মতো বৈজ্ঞানিক ভাষায় নিবদ্ধ। অবশ্যই কেইনস্ এক নতুন ভাষার সৃষ্টি করলেন, যা দিয়ে বেকারত্ব ঘটে যেসব কারণে, সেগুলোর বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ভোগের আগ্রহ (propensity to consume), নগদ টাকা হাতে রাখার আগ্রহ (liquidity preference)

www.pathagar.com

গুণকারী (the multiplier) টাকার সরবরাহের সাথে মিলে, এই চলকগুলো স্থির করে দেয় উৎপাদন-আর কর্মনিয়োগের মাত্রা এবং এগুলো মূল্যমানের উপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। পারদর্শীদের জন্য লেখা তাঁর ঐ সব নাম তালিকার আবরণে অবশ্যই সেই সাধারণ নীতিগুলোই দেয়া হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছিল 'ট্রিটিজ অজন মানি'তে।

প্রথমেই কেইনস্ যে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন তা এই যে, সঞ্চয়কে যদি ব্যয়ের ধারায় পূনঃ প্রবাহিত না করা হয়, তবে মোট ব্যয় হ্রাস পাবে, তাতে বেকারত্ব আর অর্থনীতির নিশ্চলতা সৃষ্টি হবে। এর পর তিনি নতুন কিছু যোগ করলেন- পূর্ণ কর্মনিয়োগের চেয়ে কর্ম-কর্মনিয়োগ অবস্থায় (less than full employment) অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় থাকার ধারণা। অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগের দরুণ মোট ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে আয়ও কমে যাবে, যা পরবর্তী পর্যায়ে সঞ্চয় কমাতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সঞ্চয়ের ইচ্ছাটা বিনিয়োগের ইচ্ছার সাথে পরস্পরের সমান হয়ে যায়। এই অবস্থায় আয়ের প্রবাহ থেকে সঞ্চয় তুলে নিয়ে সেই ভাবে বিনিয়োগের ব্যয় কম হওয়ার দ্বারা ওই দু'টো সমান থাকবে, আর মোট ব্যয় হ্রাস হবার প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। এই 'ভারসাম্য' একটা মন্দার পর্যায়েও আসতে পারে। যদি প্রাসংগিক চলকগুলোতে পরিবর্তন না আসে, তবে অর্থনীতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিশ্চলতা (stagnation) চলতে থাকবে। অধিকন্তু অধোগতির পরিমাণ মোটামুটি নির্ভুলভাবে মাপা যায়, 'গুণকারী' ব্যবহারের দ্বারাঃ 'গুণকারী' হলো ভোগ বা বিনিয়োগের-পরিবর্তনের সাথে মোট ব্যয়ের সম্পর্ক।

এই প্রধান সম্পর্কগুলো অতঃপর আরো বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিশেষভাবে, বিনিয়োগের উৎসাহ নির্ধারিত হয় যেসব উপাদানের দ্বারা সেগুলোর ব্যাখ্যায়। কেইনস্ বলেন যে বিনিয়োগ ব্যয় কি পরিমাণে করা হবে, তা নির্ভর করে নতুন বিনিয়োগের লাভ কি হারে আশা করা যায় এবং সুদের হার কি তার উপর। প্রথমটা আশাকৃত লাভ আর দ্বিতীয়টা আশাকৃত ব্যয়। যদি কখনো সুদের হার কমানো যায়, আর ব্যবসায়ীর আশাকৃত মুনাফায় যদি কোন পরিবর্তন না হয় তবে নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে আর এর ফলে মোট ব্যয়ের উপরও 'গুণকারী' প্রভাব কাজ করবে। এই কারণেই কেইনস বেকারত্ব হ্রাসের একটি উপায় হিসবে ঋণের সহজ প্রাপ্তি এবং সুদের নিচু হার সুপারিশ করেন। অপর পক্ষে সুদের হার নির্ভর করে বাজারে কি পরিমাণ টাকা আছে আর টাকা নগদে (বা ব্যাংকের হিসাবে) রাখার আগ্রহের উপর। উদাহরণস্বরূপ, যদি নগদ টাকা রাখার আগ্রহের কোন পরিবর্তন না হয় আর টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়, আর তা হলে সুদের হার কমে যাবে, বিনিয়োগের ব্যয় বেড়ে যাবে, আর তার ফলে মোট ব্যয়ও 'গুণকারী'র প্রভাবে বেড়ে যাবে এবং উৎপাদন আর কর্ম-নিয়োগও বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রেও দেখা গেল, সহজ ঋণের নীতির দ্বারা বেকার সমস্যা হ্রাসে সাহায্য হবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কেইন্সের এই তত্ত্ব একটি নক্সার দ্বারা

www.pathagar.com

দেখানো হয়েছে। কর্মনিয়োগ নির্ভর করে মোট খরচের (total spending) উপর, যার একটি অংশ ভোগ্যপণ্যে ব্যয় (consumer spending), অপরটি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ (business investment)। বিনিয়োগ ব্যয়ের মাত্রা নির্ভর করে সুদের হারের উপর এবং নতুন বিনিয়োগের থেকে আশাকৃত লাভের (expected rate of return) হারের উপর।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরা আশা করে যে নতুন বিনিয়োগের দ্বারা তারা শতকরা দশ ভাগ হারে লাভ করবে এবং তারা শতকরা আট ভাগ হারে টাকা ঋণ করতে পারে, তাহলে বিনিয়োগ বাড়তে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আশাকৃত লাভ কমে যায়, অথবা সুদের হার বেড়ে যায়, অথবা দু'টো ঘটে গিয়ে দুই হার সমান হয়ে যায়। সুদের হার নির্ভর করে নগদ টাকা হাতে রাখার আগ্রহের উপর এবং বাজারের মোট টাকার উপর। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ টাকা নগদে ধরে রাখতে চায়, তা (বাজারের) টাকার পরিমাণের চেয়ে যখন ভিন্ন হবে তখন সুদের হার হয় বাড়বে, না হয় কমবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না দু'টোর পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়ে যাবে।

এসব সম্পর্কের উদাহরণ হিসেবে মনে করা যাক কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনস্থ ব্যাংকগুলোর মওজুদ বৃদ্ধি করলো, যার ফলে ব্যাঙ্কগুলো তাদের দেয়া ঋণের পরিমাণ বাড়ালো আর তাই টাকার সরবরাহও বেড়ে গেল। যদি নগদ টাকা ধরে রাখার আগ্রহে কোন বৃদ্ধি না ঘটে, তবে টাকার এই বর্ধিত সরবরাহ সুদের হার কমিয়ে আনবে। সুদের হার কম হওয়ায় বাড়তি বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে (যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন বিনিয়োগের উপর আশাকৃত লাভের হার পরিবর্তিত না হয়)। অধিক বিনিয়োগ তখন জাতীয় আয় বাড়াবে, একটা নির্দিষ্ট হিসেবের পরিমাণ মতো (by a calculated amount) কারণ প্রথমে যে পরিমাণে বৃদ্ধি হবে, সেটা ক্রমাগত চক্রাকারে অর্থনীতিতে বারে বারে খরচ হতে থাকবে।

কেইন্‌স্ শুধু আর্থিক-নীতির (monetary policy) উপর সবটুকু ভরসা রাখেননি। তিনি অনুভব করেন যে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝিতে যে চরম মন্দার অবস্থা ছিল, তাতে সরকারের ঋণ দ্বারা পূর্ত নির্মাণের বিরাট কর্মসূচী নেয়া দরকার ছিল। এ ধরনের কর্মসূচী সোজা কর্মনিয়োগ করে, আর সরকারী ব্যয়ের 'গণুকারী' ফলটাও আয় বৃদ্ধি করে আর কর্মসূচী সোজা কর্মনিয়োগ করে, আর কর্মনিয়োগ অধিক সম্প্রসারিত হয়। ঘাটতি ব্যয় (deficit spending) সম্পর্কে তাঁর জোরালো বক্তব্য 'জেনারেল থিওরী' প্রকাশের আগেই কয়েকটি পুস্তিকা আর চিঠিতে বিকাশ লাভ করে -এর মধ্যে ছিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা তাঁর একটি খোলা চিঠি, যা ১৯৩৩ সনে 'নিউইয়র্ক টাইম্‌সে' প্রকাশিত হয়- আর এটা হয়ে যায় মন্দা শেষ করার জন্য কেইন্‌সীয় ব্যবস্থাপত্রের একটা প্রধান উপাদান।

www.pathagar.com

কেইন্‌সের তত্ত্বের পরিকল্পনীয় নক্‌সা

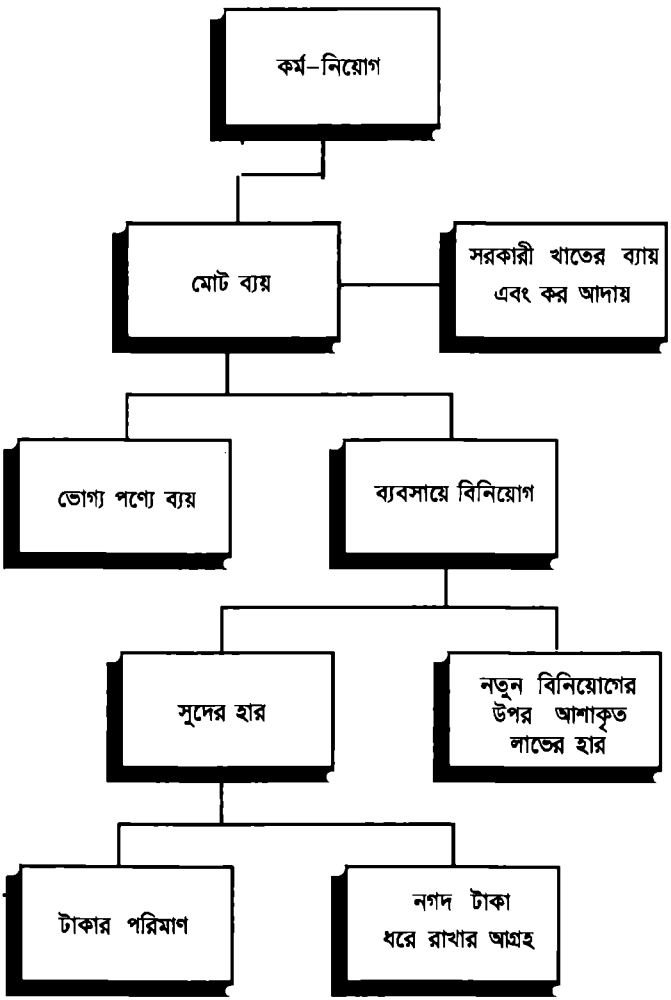

মৌলিক সম্পর্কসমূহ

১. বেসরকারী ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতিতে কর্ম–নিয়োগ নির্ভর করে ভোগ এবং বিনিয়োগে ব্যয়কৃত মোট টাকার উপর।

www.pathagar.com

২. ভোগের জন্য ব্যয়টা মূলতঃ সক্রিয় (passive)। এটার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় আয়ের বাড়া এবং কমার সাথে এবং স্বল্প মেয়াদে (in the short-run) তা নির্ভর করে কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যার উপর।

৩. ব্যবসায়ের বিনিয়োগ অবশ্য প্রচুর উঠানামা করতে পারে দু'টি কারণে, (ক) সুদের হার পরিবর্তনের দ্বারা, যেটা বিনিয়োগের ব্যয় নির্ধারণ করে; এবং (খ) নতুন বিনিয়োগের উপর আশাকৃত মুনাফার হারের দ্বারা।

৪. আবার সুদের হারটা নির্ভর করে দুই ধরনের অবস্থার উপর, (ক) টাকার পরিমাণ, যেটা অর্থ ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং (খ) জনসাধারণ আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক-সম্পদ নগদে রাখার আগ্রহের উপর।

৫. সরকারের কর্মনীতি টাকার পরিমাণকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে বটে, কিন্তু নগদে টাকা রাখার আগ্রহ এবং নতুন বিনিয়োগের উপর কি হারে লাভ আসবে, সে দুটিতে তা পারে না। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নীতিতে সরকারের পক্ষে প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় এবং সরকারের শুল্ক আদায় হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট-ব্যয়ের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে।

এই বিশ্লেষণের নিহিতার্থটা দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক নীতি নির্ধারণে এবং উপস্থিত মন্দার নিরসনে কাজে লাগে। যে অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগের জন্য বাৎসরিক সঞ্চয় হচ্ছে বিরাট আকারের, সেই ধরনের পরিণত অর্থনীতির জন্য ছিল কেইন্‌সের ভাবনা। সঞ্চয়ের অভ্যাসটা সব সময় একটি সদগুণ নয়, এবং একটা অগ্রগামী, উন্নত অর্থনীতির পক্ষে ব্যয় করাটা সঞ্চয় করার চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় হতে পারে। তাই কেইন্‌স চেয়েছিলেন আয় বন্টনে অধিক সমতা, অধিকন্ত দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অনর্জিত আয়ের উপরে একটা বাধা নিষেধ, কারণ দরিদ্রের তুলনায় ধনী চাইবে তার আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশী অংশ সঞ্চয় করতে।

পুরনো তত্ত্ব অনুসারে সুদের হারটাই সঞ্চয় আর বিনিয়োগের মধ্যে সমতা নির্ধারণ করে আর মজুরী কমানোর দ্বারা পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছানো যায়- 'জেনারেল থিওরী'তে যে প্রধান ধারণা প্রস্তাবিত হয়েছে, তা ছিল এ তত্ত্বের একেবারে উল্টো। ১৯৩০-এর দশকের ঘটনাবলী আর রাজনৈতিক মতাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন তত্ত্বটা পুরোনো তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশী বাস্তবধর্মী ছিল। ঠিক হোক আর ভুলই হোক, এখন অন্তত এটুকু ভরসা পাওয়া

www.pathagar.com

গেল যে অর্থনীতির রোগ সারানোর জন্য একটা উপযুক্ত নীতি আছে আর সেই নীতির সাধারণ ধারাটাও লিপিবদ্ধ করা হলো।

কেইন্‌সীয় অর্থনীতির অর্থ

'জেনারেল থিওরী'র অভ্যর্থনাটা হলো মিশ্র রকমের। পেশা ভিত্তিক পত্রিকার সমালোচনাসমূহ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, পুরনো যুগের অর্থনীতিবিদরা এর তাৎপর্যটা ধরতে পারলেন না, কিম্বা নিঃসন্দেহে এর তাত্ত্বিক জটিলতাগুলো তাঁরা বুঝতেই পারেননি। কিন্তু তরুণ অর্থনীতিবিদের দল এই সুযোগটা অতি আগ্রহের সাথে লুফে নিল, এর অসুবিধাগুলো বুঝতে চেষ্টা করলো আর সেই সাথে বাণীটা প্রচারেও লেগে গেল। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একদল তরুণ অর্থনীতিবিদ এই ধারণাগুলোর দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত পূর্ত কর্মসূচী, ঘাটতি ব্যয় আর সহজ ঋণ নীতির যুক্তিযুক্ততার প্রতিপাদন করলো। দুইজন অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের সাহায্য এঁরা পেলেন, প্রথম জন গারহার্ড কোলম্ নামক জার্মান আশ্রয়প্রার্থী যিনি তখন ব্যুরো অব বাজেটে কাজ করছিলেন; জার্মানীতে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োজনটা বুঝতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়জন ছিলেন অ্যালভিন্ হ্যানসেন্, হার্ভাডের অধ্যাপক, যিনি কেইন্‌সের দৃষ্টিভঙ্গীর একজন প্রধান মার্কিন সমর্থক হয়ে পড়েন। নতুন চিন্তাধারার প্রচারে হ্যান্‌সেন্ প্রচুর লেখেন, আর ওদিকে কোল্‌ম্ এবং অন্যান্যেরা চুপচাপ বিনা প্রচারে সরকারের মধ্যে থেকে কার্যকর কর্মনীতি প্রস্তুত করতে থাকেন। কিন্তু তরুণ অথবা প্রবীণ সব রক্ষণশীলেরই প্রতিক্রিয়া ছিল আতংকের, কারণ তাঁরা দেখলেন যে এই ধারণার ফলে কড়া ঋণ নীতি, সঞ্চয়, এবং শুল্কবিষয়ক বিধিনিষেধের সত্যগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের মহলে 'কেইন্‌সীয় অর্থনীতি' একটা অপমানের কথা হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলো।

ইতিমধ্যে কেইনস্ 'যুদ্ধে অকেজো' হয়ে পড়েন। 'জেনারেল থিওরী' প্রকাশের বছর খানেকের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হন এবং একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে অবসর নিতে বাধ্য হলেন। যখন তিনি আরোগ্য লাভ করলেন, ততদিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের সময় কেইনস্ ব্রিটিশ সরকারের অর্থ দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় কয়েকটি ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে আলোচনায় সাহায্য করেন। যুদ্ধের পরে, তিনি বিশের দশকের কয়েকটি ভুলভ্রান্তি এড়িয়ে বিশ্ব-অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা

www.pathagar.com

আনার জন্য একটি 'আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল' গড়ে তোলার জন্য ব্রিটন্ উড্‌স্ পরিকল্পনা প্রস্তুতে সাহায্য করেন। এসব প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'লর্ড' খেতাব দেয়ার পর ১৯৪৬ সনে বাষট্টি বৎসর বয়সে তাঁর যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছেন— সম্ভবতঃ সকল যুগের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথের পরেই তাঁর স্থান।

কেইনস্ প্রায় একক প্রচেষ্টার দ্বারাই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের জন্য পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার জাতিসমূহের জন্য মৌলিক অর্থনৈতিক নীতিমালার যুক্তিগুলোর বিকাশ ঘটান। কেইনসের অর্থনৈতিক নীতিমালায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর শুল্কনীতির (অর্থাৎ সরকারের ব্যয় এবং করনীতিসমূহ) মাধ্যমে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যাবে এবং অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ঘটবে বলে আশা করা হয়েছিল। তা ছাড়া অনেক অর্থনীতিবিদই ধরে নিয়েছিলেন যে বেকার-সমস্যার দুষ্টগ্রহটা যদি অর্থনীতি থেকে দূর করা সম্ভব হয়, তবে স্ব-নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার উপর উপযুক্তভাবে সম্পদ-বন্টনের বিষয়ে নির্ভর করা যেতে পারে। কল্যাণ সর্বোচ্চকারী (welfare maximizing) ক্রেতা আর মুনাফা সর্বোচ্চকারী (profit maximizing) উৎপাদনকারী, এই দুই শ্রেণী প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে এমন এক উৎপাদন ধারার প্রবর্তন করবে যা ক্রেতার চাহিদার সাথে মানানসই হবে। মোটের উপর তাদের যুক্তিটা ছিল নিম্নরূপঃ সম্পদের (বিভিন্ন উৎপাদনে) শ্রেষ্ঠ বন্টনের জন্য মুক্ত অর্থনীতির উপরই নির্ভর করা হবে, আর এই উদ্দেশ্যে আইনের সাহায্য নেয়া হবে, প্রতিযোগিতা রক্ষার জন্য আর ক্ষেত্র বিশেষের জটিলতা সমাধানের প্রয়োজনে। যদিও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মোট পরিমাণটা গোটা জাতির স্বার্থে সরকারের দ্বারাই পরিচালিত হবে, তবুও অর্থনীতিকে প্রত্যেকটি ক্রেতা আর উৎপাদনকারীর স্বাধীন সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া চলতে পারে। কেইন্‌সীয় অর্থনীতির প্রতিশ্রুতি ছিল এই যে সকলের জন্য সমৃদ্ধির একটি কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর সামাজিক শৃংখলা অর্জন পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অত:পর আমরা দেখতে পাবো যে এই প্রতিশ্রুতি ছিল বাস্তব থেকে অনেক দূরে।

www.pathagar.com

১০
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

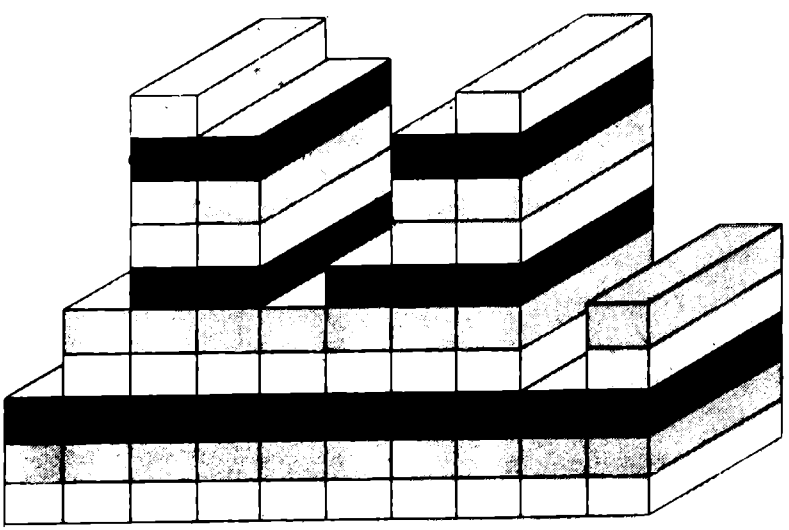

কেইনস্ যখন অর্থনীতিকে রক্ষা আর অধিক শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নয়া নীতিমালা প্রণয়নে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেই সময়েই দেখা দিল তার এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১৯২০ আর ১৯৩০-এর দশকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ বিপুল আকারের এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করলো, যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুত বৃদ্ধি পেল আর একটি পশ্চাৎপদ গ্রাম্য অর্থনীতি রূপান্তরিত হলো এক শিল্পপ্রধান দেশে। সেই কর্মসূচীর জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল বটে, কিন্তু এর প্রধান লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদদের অনেকেই প্রথমের দিকে দাবী করেন যে পরিকল্পিত অর্থনীতি বিফল হতে বাধ্য, কিন্তু কেউ কেউ পরিকল্পনার তত্ত্বটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল, এর অন্তর্নিহিত যুক্তি আর কার্যকারিতার কৌশলগুলো বুঝে নিলো এবং এই সিদ্ধান্তে আসলো যে এ ধরনের একটা ব্যবস্থা সার্থক হওয়া খুবই সম্ভব। কয়েকটি ভূতপূর্ব-উপনিবেশ এবং বর্তমানে অনুন্নত বলে পরিচিত দেশে বহু ধরনের সমাজতান্ত্রিক এবং দৃশ্যতঃ সমাজতান্ত্রিক, সম্পূর্ণ বা আধা-পরিকল্পিত অর্থনীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো, তাতেও যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া গেল। তত্ত্ব আর বাস্তব অভিজ্ঞতা, উভয় দিক থেকেই দেখা গেল যে অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা একত্রে বজায় রাখা সম্ভব কিনাঃ এমন একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্যকর ব্যবস্থা কি বের করা সম্ভব, যা শক্তির কেন্দ্রীকরণ আর স্বৈরাচারী সরকার ছাড়াও কার্যকর করা যাবে?

সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিকল্পনা

পরিকল্পিত অর্থনীতি যে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে, এই সিদ্ধান্তটা এখন যত পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, সব সময় এমন ছিল না। রুশ বিপ্লবের ঠিক পরেই ১৯১৭ থেকে ১৯২১ এই বছরগুলোতে রাশিয়ায় যে অবস্থা ছিল, তাতে মনে হয়েছিল যে নয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রের অর্থনীতিটা ক্রমশ অচল হয়ে পড়ছে। যে কটি শিল্প কারখানা পূর্ব ইউরোপের শান্তিচুক্তির পরও বিদেশীদের অধিকারে চলে যায়নি, সেগুলোও বিপ্লব আর যুদ্ধের ফলে প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। নতুন সরকার কারখানার ব্যবস্থাপনা করার জন্য যেমন প্রস্তুত ছিল না, তেমনই প্রাক্তন মালিকদের থেকেও এটা আশা করা চলতো না যে এমন ব্যবস্থায় তারা কাজ করবে যা তাদের খতম করবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। কৃষকরা বড় বড় খামারগুলো দখল করে নিয়েছিল আর তা থেকে যে ক্ষয়িষ্ণু পরিমাণ ফসল উঠতো, সেটা শহরে বিপণনের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করার বদলে নিজেরাই খেয়ে ফেলছিল। সরকার যখন শস্য কেড়ে আনার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠালো তখন এক কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিল। আর পুরনো আমলাতন্ত্র বাতিল হবার ফলে টাকা আদায় বন্ধ হয়ে গেল, অর্থ সরবরাহের জন্য সরকার ছাপাখানার আশ্রয় নিল। ফলে মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা আরো জটিল হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়লো। সরকার এক নয়া অর্থনৈতিক কার্যক্রমের (New Economic Policy) পন্থা নিল, যা ছিল শিল্প-বাণিজ্যের পূর্ণ জাতীয়করণ নীতি থেকে পশ্চাদপসরণ। হালকা শিল্প আর দোকানগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় ফেরত দেয়া হলো, কিন্তু অর্থনীতির উচ্চ পর্যায়ের (commanding heights) ব্যবস্থাগুলো যেমন ভারীশিল্প, শক্তি, পরিবহণ, ব্যাংকিং এবং অধিকাংশ পাইকারী বিপণন-ব্যবস্থা সরকারী মালিকানাতেই থেকে গেল। এতে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠলো। ১৯২৮ সনের মধ্যে অধিকাংশ শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যুদ্ধের আগের পর্যায়ে পৌছায়। পূনর্গঠন দ্রুত চললো, এবং জাতীয়কৃত শিল্পের পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকার মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রথম যাত্রায় এক মহা বিশৃঙ্খলার অবসান হলো।

কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিল। তখন পর্যন্ত রাশিয়া ছিল ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশ। আধুনিক মানের তুলনায় তাদের কৃষি-ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন, জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ নিরক্ষর এবং শিল্পোৎপাদানের একটি বৃহৎ অংশ আসতো কুটিরশিল্প থেকে। তবুও এখানেই গড়ে উঠলো একটি জাতি, যারা মার্কসবাদী মতাদর্শের অনুগত– যে মতাদর্শের বক্তব্য অনুসারে সমাজতন্ত্র স্বাভাবিক নিয়মে অত্যন্ত শিল্পোন্নত অর্থনীতিগুলোতেই আসবে, যেখানে জনসাধারণের অধিকাংশ হবে শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠলো, কারণ বিশ্বব্যাপী কোন বিপ্লব সংঘটিত হলো না, আর এই ভয়টা থেকেই গেল যে তাদের চারদিকের শত্রুভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলো যে কোন মুহূর্তে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করতে পারে।

এই সব সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হবে, তার মৌলিক রূপ নির্দেশ করে গিয়েছিলেন ভি.আই. লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)। তিনি বলশেভিক বিপ্লবকে সার্থক পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এর আগে তিনি তাঁর অনুগামীদের বুঝিয়ে দেন যে রাশিয়া ধনতান্ত্রিক শিল্পোন্নত অবস্থায় পৌছানোর আগেই, অর্থাৎ তা এড়িয়েই সোজাসুজি কৃষির এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে চলে যেতে পারবে। এই পরিবর্তনের হাতিয়ার হবে দ্রুত বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়ন, আর সেই প্রক্রিয়াতেই সৃষ্টি হবে শ্রমিক-শ্রেণীর সমাজ, যেখানে সমাজতন্ত্র বিকাশ লাভ করবে। নগরকেন্দ্রিক ঐ শিল্প-সমাজে রূপান্তরের জন্য যে সামাজিক ভিত্তির প্রয়োজন তা আসবে শ্রমিকদের একনায়কত্বের অধীনে শ্রমিক আর কৃষকের (কিন্তু অবস্থাপন্ন কৃষক 'কুলাক' নয়) পরস্পর মৈত্রী-বন্ধনের মাধ্যমে। লেনিনের এই কৌশলটা পরিষ্কার

www.pathagar.com

কর্মনীতিতে রূপান্তরিত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং ১৯২০-এর দশকের শেষের দিকে সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পরিকল্পনার আর প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে বড় ধরনের সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। শেষে ১৯৩০ সনে স্ট্যালিনীয় স্বৈর-সিদ্ধান্তের দ্বারাই এই বিতর্কের শেষ হয় এবং তার সাথেই আসে প্রথম বিশোধনমূলক বিচার-ব্যবস্থা (Purge Trials); এই বিতর্ক থেকে এমন কতকগুলো তথ্যমূলক আলোচনা পাওয়া গেল যা ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম পথটা (স্ট্যালিনের মতে যেটা ছিল ডান-ঘেষা) সুপারিশ করে নরমপন্থীরা, যাদের নেতা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সেরা মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নিকোলাই বুখারিন্ (১৮৮৮-১৯৩৮)। ১৯২০ সনে তিনি যুগ্ম লেখক হিসেবে অর্থনীতির বিখ্যাত গ্রন্থে ঘোষণা করেন যে নয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিধানগুলো আর প্রযোজ্য নয়, তাই সেখানে পরিকল্পনা এবং অন্যান্য কর্মনীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপুল স্বাধীনতা রয়েছে। বিশের দশকের শেষের দিকে অবশ্য তাঁর মতের কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং তিনি বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ভর করে কৃষিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্তের উপর, যে উদ্বৃত্ত ব্যয় হবে শহরে আর রফতানীতে, যার ফলে গড়ে উঠবে যন্ত্র-শিল্প; কিন্তু এই উদ্বৃত্ত বিনিময়ের উদ্দেশ্য হলো দুটি– কৃষির জন্য যন্ত্র উৎপাদন আর কৃষকদের তাদের উৎপন্ন শস্য বিনিময়ে উৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন। বুখারিনের ভাবনা ছিল সরকারের প্রতি কৃষকদের আনুগত্য বজায় রাখা আর তাই তিনি মনে করতেন যে কৃষিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যতটা উৎপাদন বৃদ্ধি আসতে পারে, শিল্পের উন্নয়ন অনুপাতে সেই নির্ধারিত পরিমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এই নীতির মূলে যে বিশ্বাসটা কাজ করেছে, তা এই যে কৃষি এবং শিল্প, অথবা ভারী শিল্প এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের মধ্যে যে একটা মৌলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান সেটার দ্বারাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাব্য হার নির্ধারিত হয়ে থাকে, আর পরিকল্পনাকারীদের পক্ষে এই পারস্পরিক সম্পর্কটা এড়িয়ে গিয়ে কোন দিকে এক তরফাভাবে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিপদজনক। তা ছাড়া বুখারিন্ তাঁর নীতিমালা বৈদেশিক বিষয়ের সাথেও সংযুক্ত করেন। তাঁর যুক্তিতে বিশ্বব্যাপী বিপ্লব আপাততঃ স্থগিত রাখতে হচ্ছে, কারণ প্রথম প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু, বর্তমান কর্তৃপক্ষকে স্বদেশেও একটা দৃঢ় সমর্থন গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে শত্রুভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে দূরে রাখা যায়, আর তা

www.pathagar.com

করতে হলে কৃষকের আনুগত্য লাভের জন্য দেখা উচিত যে তাদের যেন অধিক কষ্টে ফেলা না হয়।

দ্বিতীয় পথ ছিল নরমপন্থীদের উল্টো এবং কমিউনিস্ট পার্টির 'বাম-পন্থী' অংশের এই বক্তব্যের নেতৃত্ব দেন বিপ্লবকালে লেনিনের দক্ষিণ-বাহু স্বরূপ ছিলেন যিনি, সেই লিও ট্রট্স্কি (১৮৭৯–১৯৪০)। এই দলের প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন ইভাজেনী প্রোব্রাঝ্নেস্কি, যিনি ১৯২০ সনের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থটির রচনায় বুখারিনের সহযোগী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর বিপরীত পক্ষে গেলেন। এই দলের ব্যক্ত উন্নয়ন কৌশল অনুসারে অর্থনীতিকে তার ক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে যাতে করে যে কোন মূল্যে শিল্পোন্নয়নের হার সর্বোচ্চ হতে পারে এবং শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহের জন্য জীবন ধারণের মান হ্রাস করতে হবে, আর কৃষি থেকে খাদ্য, কাঁচামাল আর রফতানির জন্য সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত আদায় করে নিতে হবে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার করে। যন্ত্রায়নের দ্বারা কৃষির পরিবর্তন আনতে হবে, আর তা করতে হবে বড় বড় যৌথ খামার (collective farms) গঠনের মাধ্যমে। বামপন্থীদের মতে, সুসমঞ্জস পরিকল্পনা (balanced planning) একটা ঘৃণার বস্তু এবং অর্থনীতিতে বিশৃংঙ্খলা দেখা দিলেও দ্রুত শিল্পায়ন করাই দরকার। বুখারিনের মতো বামপন্থীরাও তাদের দেখা নীতিকে আন্তর্জাতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করলো। তাদের যুক্তি ছিল যে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো বিশ্ব-বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়া। এবং বিপ্লব ঘটানোর শ্রেষ্ঠ উপায় সমাজতন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা যে উন্নততর, সেটা উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সকলকে দেখিয়ে দেয়া। আর তা যদি সম্ভব হয়, তবে অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীও রাশিয়ার সমর্থনে এসে যাবে এবং তাতে পুঁজিবাদীদের তরফ থেকে আক্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হবে।

শিল্পায়ন সম্পর্কে এই বিশাল বিতর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোই আলোচিত হলো এবং কৌশলী জোসেফ্ স্ট্যালিন্ (১৮৭৯-১৯৫৩) এটাকে পূর্ণ ক্ষমতা দখল করার জন্য একটা সিঁড়ি হিসেবে কাজে লাগালেন। প্রথমে তিনি ঐ দুই পথের মাঝামাঝি অবস্থান নিলেন, তিনি বামপন্থীদের দ্রুত শিল্পায়ন আর 'কড়া' পরিকল্পনাকে সমর্থন জানালেন, কিন্তু কৃষিতে যৌথ খামার গঠনের বিরোধিতার মাধ্যমে আবার ডানপন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়েন, যাতে কৃষক সমাজ হাতে থাকে। বিশ্ব বিপ্লবের প্রশ্নে তিনি ডানপন্থী বুখারিনের সাথেই একমত হলেন আর এই মৈত্রীর ভিত্তিতেই তিনি ক্ষমতার

www.pathagar.com

দ্বন্দ্বে ট্রটস্কিকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং তাকে নির্বাসনে পাঠালেন। অতঃপর এক নাটকীয় রাজনৈতিক মত পরিবর্তনের দ্বারা তিনি হঠাৎ বামপন্থীদের কৃষি বিষয়ক নীতির প্রতি সমর্থন দিলেন, পুঁজি সঞ্চয় এমনভাবে বাড়ালেন যা ঐ দলের পক্ষেও ছিল অকল্পনীয়, আর এতে তিনি যে সমর্থন পেলেন, সেটা ব্যবহার করে বুখারিন আর তাঁর অনুগামীদের বের করে (purge) দিলেন। এই ভাবেই এক উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন লক্ষ্য এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে সেই বিতর্কের শেষ হয়েছিল, আর গোটা ব্যবস্থাটা কার্যকর করার জন্য স্ট্যালিন ব্যবহার করলেন তাঁর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব।

১৯২৮ সনে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে ঘোষণা দিলেন স্ট্যালিন্। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল "আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়", "প্রতিরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত শিল্প-ভিত্তি" এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে "ধনতান্ত্রিক দেশগুলোকে পরাজিত করা এবং তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া"। এই লক্ষ্যগুলোর প্রকৃতি আদতে রাজনৈতিক আর আদর্শভিত্তিক, যদিও অর্থনৈতিক উপায়ের দ্বারা তা অর্জন করা হবে। স্ট্যালিন্ বললেন, "শিল্পে সর্বোচ্চ পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ" দ্বারা উচ্চ হারে শিল্পোন্নয়ন অর্জিত হবে আর এজন্য প্রয়োজন "আমাদের পরিকল্পনাগুলোতে একটা কঠিন চাপের অবস্থা বিদ্যমান রাখা"।

পরিকল্পনার কৌশলটা মোটামুটি এমন কিছু জটিল ছিল না, তবে এজন্য প্রশাসনিক খুঁটিনাটি গড়ে তুলতে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। অর্থনীতিতে কি পরিমাণ সম্প্রসারণ হবে, সেটা ঠিক করতো উচ্চ পর্যায়ের সরকারী নেতৃবৃন্দ, যারা এমন লক্ষ্য স্থির করে দিত, যা অর্জন করতে অর্থনীতিকে শেষ সীমা পর্যন্ত চাপে রাখা হতো। কয়লা, শক্তি, ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতির মত কয়েকটি মৌলিক শিল্পকে 'প্রধান সংযোগ' হিসেবে বেছে নিয়ে সেগুলোকে উন্নয়নে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দেয়া হলো। অর্থনীতির অবশিষ্ট অংশকে ঐ লক্ষ্যস্থির করা শিল্পগুলোর সাথে একটি 'খাপখাওয়ানো হিসাবে'র (balanced estimates) দ্বারা সম্পর্কিত করা হয়, যা থেকে স্থির করা হয়, প্রধান শিল্পগুলোতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কত জিনিস সরবরাহ করা হবে (inputs) আর ঐসব শিল্পের উৎপাদন (outputs) আর কত হবে, আর একইভাবে সম্পূর্ণ অর্থনীতিরই প্রয়োজন আর উৎপাদনও নির্ণয় করা সম্ভব ছিল। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিকল্পনা ঐ সামগ্রিক শিল্প-ভিত্তিক ভারসাম্যের বিচারে হিসাব করা হলো আর সাথে সাথে সেগুলোর অর্থ এবং শ্রমিক সরবরাহেরও হিসাব করা হয়।

www.pathagar.com

উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য এবং কড়া পরিকল্পনা যাতে রাশিয়ার মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টার দ্বারা সফল হতে পারে সে জন্য জোর উৎসাহ দানের প্রয়োজন ছিল। এ দিক দিয়ে সোভিয়েট প্রবৃদ্ধি কৌশল কিছুটা মুস্কিলে পড়ে, কারণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ফলে জীবন ধারণের মান-বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থই ছিল শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য সম্পদের বিনিয়োগ হ্রাস করা; যদি এক টন ইস্পাত রেফ্রিজারেটর্ বানানোতে বরাদ্দ করা হয় তবে বিদ্যুৎ প্রস্তুতের জেনারেটর নির্মাণে এক টন ইস্পাতের সরবরাহ হ্রাস পাবে, বাসগৃহ নির্মাণে একঘন্টা বাড়তি শ্রম নিয়োগের অর্থ হলো বিদ্যুৎ-বাঁধ নির্মাণ কাজে এক ঘন্টার শ্রম নিয়োগ হ্রাস করা। প্রথম দিকে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করে, মহিলাদের শ্রম-শক্তির অন্তর্ভুক্ত করে এবং কৃষি থেকে শিল্পে শ্রমিক আমদানি করে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। মাসে মাসে মজুরী আর বেতন বৃদ্ধি করেও কাজে উৎসাহ দেয়া হয়, কিন্তু ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কম রাখার ফলে মজুরী বৃদ্ধি শুধু মূল্য-বৃদ্ধিই ডেকে আনে। বিভিন্ন ধরনের কাজের দক্ষতা অনুসারে মজুরীর পরিমাণে পার্থক্য বৃদ্ধিও কিছুটা কাজে লাগে, কিন্তু সেই নীতিটা বেশী দূর এগিয়ে নেয়া যায়নি, কারণ সমাজতন্ত্রের সাম্যনীতির সাথে এটা ছিল পরস্পর বিরোধী, তাছাড়া এর ফলে স্বল্প আয়ের লোকদের জীবন ধারণের মান আরো নিচে চলে যেতো, যাদের ভাগে ভোগ্যপণ্যের পরিমাণটা হতো বড়ই সামান্য। 'সমাজতান্ত্রিক উৎসাহ দানের বিষয়েও কিছুটা প্রচেষ্টা চলেঃ যারা স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশী উৎপাদন করতে পারে, তাদের খেতাব, মেডেল, সুনাম এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছায় হলেও কর্তৃপক্ষকে নিরূপায় হয়ে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। লক্ষ্যটা যখন রাজনৈতিক, উৎসাহের ব্যাপারটাও রাজনৈতিক না হয়ে উপায় ছিল না।

কথাটা কৃষির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত খামার যখন যৌথ খামারে রূপান্তরিত হলো, তখন কৃষকরা এতে প্রবল আপত্তি জানায় এবং ১৯৩৩ সনের ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের এটাই ছিল প্রধান কারণ। অবশ্য যৌথ-খামার কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার সহজ করে দিল আর তাতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। যৌথ খামারের মাধ্যমেই সরকার কৃষিতে পরিকল্পনা প্রয়োগ করতে পারে এবং সম্পূর্ণ বাড়তি ফসলটা কৃষকদের বদলে সরকারের হাতে চলে আসে। কৃষির উৎপাদন যাতে স্বল্প মূল্যে বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করা যায়, তার ব্যবস্থা করা হয় এবং কৃষকদের ব্যক্তিগত জমির খণ্ডগুলোর

www.pathagar.com

ব্যবহার সম্পর্কেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো। কিন্তু এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কৃষকদের ব্যক্তিগতভাবে কৃষির পদ্ধতি উন্নত করার আর কোন উৎসাহ রইলো না এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু ফসল বাড়লেও পরে উৎপাদনে একটা নিশ্চলতা দেখা দিয়ে ছিল।

এছাড়া শিল্প শ্রমিকদের জন্যও বাধ্যতামূলক বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। ১৯৩০ দশকের শেষের দিকে শ্রমিকদের স্থান-পরিবর্তন হ্রাসের জন্য বিধি-নিষেধ জারি করা হয়, আর সেগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে আরো সম্প্রসারণ করে কোন শ্রমিকের পক্ষে কারখানা ম্যানেজারের বিনা অনুমতিতে কর্মত্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়; কাজে ধীরগতি, অননুমোদিত অনুপস্থিতি, ক্রমাগত স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম কাজ করা এবং অমন অন্যান্য অর্থনৈতিক 'অপরাধ' আইনতঃ শাস্তির যোগ্য করা হলো। সম্ভবতঃ যুদ্ধকালে এই সব নেতিবাচক উৎসাহ-বিধান যুক্তিযুক্তই ছিল, তবে এগুলো ১৯৫০ দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বজায় রাখা হয়।

পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক উৎসাহের বদলে বরং রাষ্ট্রের ক্ষমতাই ব্যবহার করা হয়। সোভিয়েট অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলে, শিল্পায়নে আর 'কড়া' পরিকল্পনায় স্ট্যালিনীয় ধাঁচের ক্ষমতা প্রয়োগ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। ঐ সময়েই পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বন্দী শিবির (Concentration Camp) 'গুলাগ আর্কিপেলাগো' (অর্থাৎ দেশের মধ্যে আর এক দেশ)-এসবও ইতিমধ্যে সোভিয়েট ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। অবশ্য এ ধরনের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক যতটা না, তার চেয়ে বরং বেশী ছিল রাজনৈতিক আর তাই যে দৃশ্যটা আদতেই ছিল ধূসর, এর ফলে তা আরো কালো হয়ে গিয়েছিল।

এই ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে পারে না। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা অধিক জনসমর্থন পাবার জন্য এই দমনমূলক বিধি-বিধান অনেকটা তুলে নেন আর জীবন ধারনের মান উন্নত করার জন্য ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। বলাবাহুল্য, স্ট্যালিনের কড়া ক্ষমতা ব্যবহারের ধরন যখন নরম হয়ে আসলো, তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারও কমে যায়। কৃষিতে নিশ্চলতা আর পশ্চাৎপদ অবস্থা বিরাজ করে ঃ ১৯৫৩-৫৮ এই সময়ের মধ্যে এশিয়ার এক বিশাল অঞ্চলে কৃষকদের কিছু উৎসাহ দানের মাধ্যমে নতুন জমি চাষে আনা হলে প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু তারপর আর বৃদ্ধি না পেয়ে বরং নিশ্চল হয়ে থাকে। অধিকন্ত ১৯৭২-৭৩ আর ১৯৭৫ সনে দুটি বড়

www.pathagar.com

ধরনের অজন্মা হবার ফলে বিদেশ থেকে শস্য আমদানি করতে হয়। শিল্পের ক্ষেত্রের প্রশাসনিক পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের অধিক স্বাধীনতা, উন্নত উৎসাহদান ব্যবস্থা ইত্যাদি সত্ত্বেও সম্প্রসারণের গতি মন্থর হয়ে আসে। সম্পদ বরাদ্দকরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অদক্ষতা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তবুও একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রধান উপাদানগুলো সব সেখানে বজায় রয়েছে।

পরিকল্পনার তত্ত্ব

সোভিয়েট রাশিয়া যখন প্রধানতঃ রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতে পরিকল্পনার একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলছিল, সেই সময়ে অন্যান্য দেশের অর্থনীতিবিদরাও চিন্তাভাবনা করতে থাকে, শুধু একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবেই পরিকল্পনাটা কজে লাগতে পারে কি না? সরকারী মালিকানা সম্পর্কে তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না, পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল খুবই কম, এমন কি প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক লেখাগুলোতেও ঐ বিষয়ের উপর তেমন কিছুই বলা হয়নি। তা ছাড়া গোঁড়া অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশই স্বয়ংক্রিয় বেসরকারী-মালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক সৌন্দর্যে এমনই মোহিত হয়েছিল যে তারা স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পিত অর্থনীতির ব্যাপারটা নিরেট অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলেন, আর সোভিয়েট অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ের অসুবিধাগুলো তাদের এই ধারণা সমর্থন করলো।

পরিকল্পনার বিরোধীদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন অষ্ট্রিয়ার নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ লুড্উইগ ফন মিজেজ্ (১৮৮১-১৯৭৩), যাঁর মতে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমাজতন্ত্র আর পরিকল্পনা কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি হতে পারে না। ১৯২০ সনে সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনীতি যখন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, সেই সময়ে তিনি দাবী করেন যে উৎপাদন-উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকলে পুঁজির বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আর ঐ রকম একটা বাজার না থাকলে পুঁজির কোন মূল্য নির্দেশ করাও সম্ভব নয়, কোন সুদের হার থাকবে না, যা দিয়ে তুলনামূলক দুষ্প্রাপ্যতার পরিমাপ করা সম্ভব, তাই কতটা পুঁজি সঞ্চয় করা দরকার আর কোন্ কোন্ খাতে তা ব্যবহার করা উচিত, তা স্থির করবারও কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকবে না। তাঁর মতে পরিকল্পনাবিদরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কিন্তু তাতে যে জাতির

www.pathagar.com

সম্পদসমূহ দক্ষভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে কোন যুক্তির ভিত্তি থাকা সম্ভব নয়।

একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে ফন্ মিজেজের যুক্তিটা কয়েক বছর পরে খণ্ডন করেন একজন ইটালিয়ান অর্থনীতিবিদ, যাঁর নাম এনরিকো ব্যারোন্ (১৮৫৯-১৯২৪), যিনি দেখালেন যে পরিকল্পনাবিদদের পক্ষে অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে হলেও, হিসাব করে এমন একটা মূল্য (Accounting Prices) নির্ধারণ করা সম্ভব, যেটা প্রতিযোগিতামূলক বাজার-ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা চলে। অবশ্য ফন্ মিজেজের শিষ্যরা হাল ছাড়েনি, তারা ব্যারোনের যুক্তিটা বাতিল করে দিলো এই বলে যে ঐ তাত্ত্বিক সমাধানটা ব্যবহারিক অর্থে অবাস্তব, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে এতে যে বিপুল পরিমাণ তথ্যের ভিত্তিতে খরিদ্দারের পছন্দের বিষয়ে লক্ষ লক্ষ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হবে, অত তথ্য কোন পরিকল্পনা সংস্থার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হতো, তাহলেও ঐ সমাধানগুলো অঙ্ক কষে বের করতে যে সময় লাগবে, ততদিনে তা অকেজো হয়ে পড়বে। ১৯২০-এর দশকে অবশ্য বৈদ্যুতিক কম্পুটার কারো জানা ছিল না।

এই যুক্তিরও উত্তর দেন দু'জন অর্থনীতিবিদ, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল শুরুতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। একজন রক্ষণশীল মার্কিন নিওক্লাসিক মতের অনুসারী, নাম ফ্রেড.এম. টেলর (১৮৫৫-১৯৩২), যিনি মার্কিন অর্থনৈতিক সমিতিতে ১৯২৮ সনে তাঁর সভাপতির ভাষণে দেখিয়ে দেন যে ব্যারোনের সমাধানগুলো পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে (trial and error process) পাওয়া সম্ভব। খরিদ্দারদের তাদের আয় ইচ্ছা মাফিক খরচ করতে দিয়ে, পরিকল্পনাবিদরা শুধু এমন মূল্য স্থির করে দেবে, যাতে সবটা জিনিস বিক্রি হয়ে যাবে, অর্থাৎ এর ফলে বাজারে জিনিসের অভাব বা উদ্বৃত্ত কোনটাই থাকবে না, আর সেই মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান থাকবে। টেলরের এই মত অনুসারে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে সেই পরিমাণে, যা ঐ মূল্যে বিক্রীত হয়ে যাবে। এই পদ্ধতিতে একবার সমতা অর্জিত হলে, পরিকল্পনাবিদরা মোটামুটি এ বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারবে যে সম্পদগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবেই বরাদ্দ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উত্তরটা দিলেন ১৮৩৬-৩৭ সনে, অস্কার লাঙ্গে (১৯০৪-১৯৬৫) নামে একজন পোলিশ সমাজতন্ত্রিক অর্থনীতিবিদ ; তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পোল্যান্ডের পরিকল্পিত অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। টেলরের চেয়ে অনেক বিশদ

www.pathagar.com

বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখান যে পরিকল্পনা সংস্থার বাজার-ব্যবস্থার মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভান-প্রক্রিয়া (simulate) আর সেই সাথে কারখানা ব্যবস্থাপকের সর্বোত্তম মুনাফা (profit-maximizing) অর্জন নীতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা এক ধরনের সমাধানে আসতে পারা যায়। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ধাঁচেই ক্রেতার পক্ষে সর্বোত্তম কল্যাণে পৌছানো সম্ভব। অধিকন্তু, এই প্রক্রিয়ায় একচেটিয়া ব্যবসায়ের বাধাগুলো দূর করা, আর পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থাতে বিনিয়োগের পরিমাণ পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করা সম্ভব। লাঙ্গে এবং টেলর দেখালেন যে বাজার-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রটা (market socialism) একটা সম্ভবপর ব্যাপার। এর সাথে যোগ হলো ইংরেজ অর্থনীতিবিদ আর্থার পিগুর বক্তব্য, যিনি বললেন যে বেসরকারী অর্থনীতিও সব সময় ঠিক মতো কাজ করে না, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিধান আর সেই বিধানের বাস্তব কার্যকারিতার দৃশ্যমান পার্থক্যে।

টেলর আর লাঙ্গের যুক্তিটা সকলের মন জয় করে নিল। খুব কম অর্থনীতিবিদই বলবে যে পরিকল্পনাটা আদতেই বিফল হতে বাধ্য বা এই প্রক্রিয়াটা নীতিগতভাবেই অদক্ষ হবে, যদিও অনেকেই বলবে যে অত্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খুব একটা কার্যকর হবে না। স্পষ্টত:ই পরিকল্পনায় অনেক অসুবিধা আছে আর কোন দেশে এর বাস্তব কার্যকারিতার সমালোচনাও করা যায় বটে, কিন্তু যারা পরিকল্পিত অর্থনীতির পক্ষ সমর্থন করে, তারা তাত্ত্বিক যুক্তিতে যে জয়ী হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই।

এদিকে সমালোচকরাও নতুন যুক্তি দেখালো। ১৯৩০-এর দশকের সোভিয়েট ইউনিয়ন আর ইউরোপের একনায়কত্বের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তারা বললো যে নির্জলা অর্থনৈতিক স্বার্থে পরিকল্পনা ব্যবস্থাটা কার্যকর করা যেতে পারে বটে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন সম্ভব শুধু ব্যক্তিগত আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েই। এই প্রসংগের শ্রেষ্ঠ বিবৃতি পাওয়া যায় ফ্রেডরিক ফন্ হায়েক্ (জন্ম ১৮৯৯) নামক আর একজন অস্ট্রিয় অর্থনীতিবিদের 'দি রোড টু সার্ফডাম' (১৯৪৪) নামক বইয়ে। এই ছোট্ট বইটিতে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে খোলা বাজারে একবার সরকারী হস্তক্ষেপ শুরু হলে তার পরিণতি সমাজতন্ত্র, আর সমাজতান্ত্রিক পরিণতিতে স্বাধীনতা খতম হবে। অত্যাচারের এই পথে কোন বিরতির স্থান নাই।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে এই যুক্তিটা যতই বাস্তবধর্মী বলে মনে হোক না কেন, সাম্প্রতিক কালের পরিকল্পনা বিষয়ক অভিজ্ঞতা হায়েকের ঐ মতটা সমর্থন করে না। খোদ সোভিয়েট ইউনিয়নের স্ট্যালিনের আমলের স্বৈরতন্ত্র অনেকটা হ্রাস করা হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের ক্ষমতা হ্রাস করতে সচেষ্ট হয়েছে, শ্রমিকদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে, এবং মূল্য নির্ধারণ আর উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাজারের কার্যকারিতার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে প্রয়াস পেয়েছে। পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোতে, যেমন হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় এখন পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ, বাজার-ব্যবস্থার এবং এর উৎসাহগুলোর উপর নির্ভরতা, অর্থাৎ বাজার সমাজতন্ত্রের (market socialism) মূখ্য উপাদানগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখন একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সে এমন এক ধরনের 'নির্দেশক' বা 'লক্ষ্য' ভিত্তিক পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে, যাতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়কৃত শিল্পসমূহে আর্থিক উৎসাহের (financial incentives) দ্বারাই মূলতঃ উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর এসব বিষয়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তাতে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাতে তেমন একটা হস্তক্ষেপ করা হয়নি। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সরকার যদিও স্পষ্টত:ই স্বৈরতন্ত্রী (authoritarian) তবুও সেখানে পরিকল্পনা ব্যবস্থাটা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আর স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের এক উদ্ভাবনী-দক্ষতাপূর্ণ মিশ্রণ। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত জাতিগুলো এখন বহু ধরনের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই প্রবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা ব্যবহার করছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থায়, বেশী বা অল্প পরিমাণে যা পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তাতে এটুকু পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে পরিকল্পনার সাথে কর্তৃত্ব ব্যবহারের কোন সহজ সম্পর্ক পাওয়া যায় না, অর্থাৎ বলা যায় যে পরিকল্পিত অর্থনীতি যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বা ১৯৪০-এর দশকের স্বৈরতন্ত্রের ছাঁচেই গড়তে হবে, এটা বলা ঠিক নয়। লাঙ্গে আর টেলরের বিশ্লেষণ অনুসরণে বাজার সমাজতন্ত্রে যে ধরনের পরিকল্পনা করা যায়, তাতে খরিদ্দারের প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় রাখা যখন সম্ভবপর, তখন মনে হয় ঐ ব্যবস্থাটা স্বৈরাচারী সমাজতন্ত্র আর একচেটিয়া পুঁজিবাদ, এই দুটিরই সম্ভাব্য বিকল্প হয়ে দেখা দিতেও পারে।

www.pathagar.com

স্বল্পোন্নত জাতিসমূহের পরিকল্পনা

স্বল্পোন্নত জাতিসমূহ নানা ধরনের পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে। এরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হয় স্বাধীনতা লাভ করেছে নয়তো স্বাধীন হবার কাছাকাছি পৌঁছেছে, কিন্তু এসব দেশ জীবন ধারনের মান আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন উভয় বিষয়েই এখনো পিছিয়ে আছে। ১৯২০-এর দশকের সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো এরাও চাচ্ছে গতানুগতিকতার শিকল ভাংতে আর তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি দ্রুততর করতে।

এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার এই সব স্বল্পোন্নত দেশ এক দুষ্ট-চক্রের (vicious circle) শিকার হয়েছিল। নিচু উৎপাদন ক্ষমতা আর নিচু আয়ের অর্থ ছিল এই যে, উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, সে তুলনায় এদের সঞ্চয় হয়েছে অল্প। স্বল্প আয়ের আর একটি অর্থ হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের স্বল্প চাহিদা, যার ফলে বিনিয়োগের জন্য এসব দেশ অন্যদেশ থেকেও মূলধন আকর্ষণ করতে পারেনি; তার ফলে বিনিয়োগের সামান্যতা, নিচু উৎপাদন ক্ষমতা আর নিচু আয়, একত্রে পশ্চাৎপদতার চক্রকে পূর্ণরূপ দিয়েছে। তাছাড়া আয় কম হওয়ার অর্থই খারাপ বাসস্থান, নোংরা পরিবেশ আর স্বাস্থ্যহীনতা, যা কর্মক্ষমতা আর আয় দুটোই কমিয়ে দেয়, ফলে ঐসব দেশে জনসংখ্যার অধিকাংশই তরুণ যার একটা মোটা অংশই অনুৎপাদনশীল পরনির্ভর। অধিকন্তু স্বল্প আয়ের ফল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ পরীক্ষা চালাতে গেলে তাতে বিফলতার ঝুঁকিও নিতে হবে, আর যেসব কৃষক পরিবার পেটে-ভাতে কাজ করে, তারা কোন নতুন পদ্ধতি বা যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না; তাদের রক্ষণশীল হতেই হয়, নচেৎ একটা ফসল নষ্ট হলে সকলকে না খেয়ে মরতে হবে। রক্ষণশীল মনোভাবের আর একটি কারণ অনেক অনুন্নত অঞ্চলেই সেই অর্থনৈতিক বিত্তশালী অংশটা (economic elite), যারা অনেক জমির মালিক , যাদের আয় বেশী আর যাদের সঞ্চয় সাধারণতঃ জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ না করে বরং তারা তা ব্যয় করে অধিক জমি সংগ্রহে, কৃষকদের চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে অথবা অপেক্ষাকৃত ধনী দেশে তা বিনিয়োগ করে। ইতিমধ্যে কৃষকের মধ্যে উচ্চ জন্মহারের ফলে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বল্পোন্নত জাতিগুলোর মধ্যে জন্মহারটা সব সময়ই বেশী ছিল, কিন্তু আগেরকার দিনে সেটার ভারসাম্য রক্ষা হতো উচ্চ মৃত্যুহার দিয়ে; একালের স্বাস্থ্য বিধান আর জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে জনসংখ্যা দ্রুততর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

অর্থনীতিবিদদের অনেকে আবার কোন কোন অঞ্চলে অর্থনৈতিক দ্বৈততাকে (economic dualism) আর একটি সমস্যা বলে নির্দেশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ ওলন্দাজ অর্থনীতিবিদ জে. এইচ. বেকে দেখিয়েছেন যে, ওলন্দাজ শাসনে ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির কোন কোন অংশে ইউরোপীয় বা মার্কিন পুঁজির কল্যাণে একটি বাজার অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, যেটা আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, এটা জনসংখ্যার মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশের ব্যাপার। অধিকাংশ মানুষ ছিল এ থেকে বহুদূরে এমন এক অর্থনীতিতে যা পল্লীতে পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সংগঠিত আর সেখানে শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকা যায়। অর্থনীতির এই দুই অংশ কদাচ একে অপরের সংস্পর্শে এসেছে আর পাশ্চাত্য অংশটা স্থানীয় অংশের প্রবৃদ্ধিতে কোনই উৎসাহ সঞ্চার করেনি।

অর্থনীতিবিদরা অনেকে আশা করে যে সমস্যার সমাধান করা যাবে এবং দরিদ্র জাতিগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি স্বয়ং-সমর্থ (self sustaining) প্রক্রিয়া চালু করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন অর্থনীতিবিদ ওয়াল্ট ডব্লিউ. রোস্টো যুক্তি দেখিয়েছেন যে, একটি জাতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রাচীন সমাজ (traditional society) থেকে আধুনিক গণ-উপভোগ অর্থনীতিতে (mass-consumption economy) পৌঁছায়। এই প্রক্রিয়া চালু হবার জন্য কতকগুলো পূর্ব-সর্ত প্রতিষ্ঠা করতে হয়ঃ একটি স্থিতিশীল সরকার, উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থা, সঞ্চয় কাজে লাগানোর জন্য একদল 'নতুনের প্রবর্তনকারী' (innovators) এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী আর সম্প্রসারিত বাণিজ্য। অতঃপর আসবে স্থায়ী প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু (take-off), যে পর্যায়ে অর্থনীতি তার জিঞ্জিরগুলো ভাঙ্গতে থাকে আর অর্থনৈতিক অগ্রগতির চোখে পড়ে। রোস্টোর মতে এই পরিবর্তনের জন্য অত্যাবশ্যক যা, সেটা হলো সঞ্চয় আর বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া, যার পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা দশ ভাগ বা তার বেশী হতে হবে। অতঃপর চূড়ান্ত পর্যায়ে শিল্পের উন্নয়ন আর জীবন ধারণের মান বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতি পরিপক্বতা লাভ করে আর গণ-উপভোগ শুরু হয়।

রোস্টোর বিশ্লেষণে যে নীতি বিষয়ক সুপারিশের ইঙ্গিত রয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট সমাদৃত হলো। প্রথমতঃ স্বল্পোন্নত জাতিগুলোকে যদি উত্তর আমেরিকার মতো উন্নত করতে হয়, তবে সামাজিক সংস্কার দরকার হবে "আমরা যেভাবে করেছি, তোমরাও তেমনভাবেই কর", মোটামুটি এটাই

www.pathagar.com

রোস্টোর বাণী। দ্বিতীয়তঃ 'যাত্রাশুরু'র চিন্তামতে অন্তর্নিহিত রয়েছে এই ধারণা যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সাহায্য দান ক্রমিক পর্যায়ে করা যেতে পারে, যদিও 'যাত্রাশুরু' করার জন্য গোড়াতে সেটার পরিমাণ বড় হতে হবে; রোস্টোর চিন্তাধারার এই দিকটা স্পষ্টতই হিসেবী লোকদের জন্য ছিল পছন্দসই। তৃতীয়তঃ উন্নয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে রোস্টোর বর্ণনাতে এটা উহ্য যে, একবার এই প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেলে তা আর কোন পরিকল্পনা বা সরকারী ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল থাকবে না– প্রক্রিয়টা স্বয়ং–সমর্থ। সম্ভবতঃ এই যুক্তিতেই তিনি তাঁর বই-এর নাম দিয়েছিলেনঃ 'স্টেজেজ অব ইকনমিক গ্রোথ্– এ নন্ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (১৯৬০)।

অপরাপর অর্থনীতিবিদরা কিন্তু স্বাভাবিক বা স্বয়ং–সমর্থ প্রক্রিয়ায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের এই সম্ভাবনা সম্পর্কে কম আশাবাদী। গুনার মিরডাল নামক একজন সুইডিশ্ অর্থনীতিবিদ, যিনি কেইন্সের সমকালেই জাতীয় আয় সম্পর্কিত তত্ত্বের একটি সুইডিস বর্ণনা প্রস্তুতে সাহায্য করেন এবং মার্কিন জাতি–বর্ণ সমস্যা সম্পর্কে 'অ্যান আমেরিকান ডাইলেমা' নামের বিখ্যাত সমাজ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেন; তিনি জোরালো যুক্তি তুলে দাবি করেছেন যে উন্নত আর স্বল্পোন্নত জাতিগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ইকনমি' (১৯৫৬) নামক গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে ইতিমধ্যে যেসব দেশ শিল্পোন্নত হয়ে গিয়েছে, তাদের উচ্চ আয় থেকে বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় গড়ে উঠছে, কিন্তু এই সঞ্চয় স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে না, কারণ স্বদেশেই চড়া হারে মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলো পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য পৌঁছেছে, যেখানে খনি এবং ঔপনিবেশিক চাষ (plantation) থেকে পাওয়া উৎপন্ন রফতানি করা যায়, কিন্তু এই সব ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ দ্বীপতুল্য (enclave) অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো গোটা দেশের অর্থনীতি থেকে সঞ্চয় আর প্রতিভাসম্পন্ন লোকদের তুলে আনে, ফলে দেশগুলোতে স্থানীয় পর্যায়ের অর্থনীতিতে আগে যাও বা প্রবৃদ্ধি ঘটতে পারতো, সম্পদের অভাবে পরে তাও আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই, মিরডালের মতে স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত জাতির ছাঁচে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে না, তাদের বরং সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিজেদের মতো করে অর্থনীতিতে আমদানী-রফতানি গড়ে তুলতে হবে, উৎপাদন বহুমুখী করতে হবে আর অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী আর একটি গ্রন্থ, 'এশিয়ান ড্রামা'তে (১৯৬৮) তিনি বলেন যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব, যদি একমাত্র সেই সব দেশে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির সমস্যাটি আংশিকভাবে ঐসব দেশের সাথে অধিক শিল্পায়িত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। রাউল্ প্রেবিশ নামে একজন আর্জেনটিনীয় অর্থনীতিবিদ (যিনি জাতিসংঘে কাজ করছেন) মনে করেন যে 'বাণিজ্য শর্তের' (terms of trade) দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রবণতা রয়েছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থের বিপক্ষে যাওয়ার দিকে। এই সব অঞ্চল খাদ্য, খনিজ এবং অন্যান্য ভূমি ভিত্তিক প্রাথমিক উৎপন্ন দ্রব্য রফতানি করে থাকে, যেসব জিনিসের বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং যেগুলো প্রায়ই অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে যায়। তার ফলে দাম কমে যায়, উৎপাদনকারীদের আয় কম থাকে আর বাজারটাও সর্বদা উঠা-নামা করতে থাকে। অপর পক্ষে, উন্নত দেশগুলো রফতানি করে শিল্পজাত দ্রব্য, যার দাম প্রেবিশের মতে ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, কারণ সেখানে রয়েছে উৎপাদনকারীদের কড়া একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, তার সাথে রয়েছে সুসংগঠিত শ্রমিক দলের চড়া মজুরীর দাবী। এটা অবশ্য ততটা খারাপ হতো না, যদি উন্নত দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান আয়ের ফলে দরিদ্র দেশগুলোর উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য সেখানে চাহিদাও বেড়ে যেতো, কিন্তু আসলে তা ঘটছে না। প্রেবিশ দেখিয়েছেন যে, শিল্পায়িত এলাকায় যে পরিমাণে আয় বাড়ে, সেটা তাদের আমদানি বৃদ্ধির প্রায় দুই গুণ।

তাই প্রেবিশ সমর্থন করেছেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দলগতভাবে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একত্রীকরণ (economic integration), সাধারণ বাজার, শুল্ক-ইউনিয়ন, অবাধ বাণিজ্য এলাকা ইত্যাদি, যাতে ক'রে ঐসব দেশের স্থানীয় বাজার সম্প্রসারিত হয় আর সেই সাথে উন্নত দেশগুলো থেকে সেই বাজারে আমদানি বন্ধ করা হয়, সংরক্ষণ মূলক আমদানি শুল্ক ব্যবস্থার দ্বারা। অবাধ বাণিজ্য এলাকার অভ্যন্তরে জাতিগুলো তাদের শিল্প-প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনা নিতে পারে, যার মাধ্যমে একদিকে তারা যেমন বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে পারবে, অপরদিকে তেমনি নিজেদের উৎপন্ন কাঁচামাল স্বদেশেই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও বিশ্ব-বাজারে প্রাথমিক দ্রব্যের (primary products) মূল্যে স্থিতিশীলতা আনার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচেষ্টার পক্ষে জোরালো সমর্থন

www.pathagar.com

জানিয়েছেন, যার অর্থ হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদনের উপর কোন না কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা পরিকল্পনা করা।

অবশ্য, ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং বৈদেশিক মূলধন অনেক স্বল্পোন্নত দেশকেই উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছে। অনেক দেশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাদের ঔপনিবেশিক অবস্থা আর উন্নয়নের বাধা থেকে মুক্ত করেছে। আধুনিক স্বাস্থ্য বিধান আর পরিচ্ছন্নতার সুযোগ এবং উন্নত পুষ্টি তাদের দেশে উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে, যদিও ঐ সবের ফলেই আবার যে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হয়েছে, তা কোন কোন এলাকায় ধরতে গেলে লাভের সবটুকুই খেয়েও ফেলেছে। শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা অপসারণের উপর জোর দেয়াটাও কাজে লেগেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী অর্থনৈতিক লাভ এসেছে সেখানেই, যেসব ক্ষেত্রে পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার কর আদায়, বৈদেশিক সরকারের আর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের এবং আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আর ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে সংগৃহীত মূলধন খাটিয়ে শিল্পায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছে সেই সব উন্নয়নশীল দেশ, (যেমন তাইওয়ান, ব্রাজিল কিম্বা মেক্সিকো) যারা তাদের পরিকল্পনায় বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সুবিধা দিয়েছে এবং ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে বেসরকারী মূলধন অথবা বিদেশী সরকারী সাহায্য আকর্ষণ করতে পেরেছে; কিম্বা যুগোস্লাভিয়া এবং হাঙ্গেরীর মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, যারা কর বসিয়ে বিনিয়োগের জন্য পুঁজির সংস্থান করেছে। এই সব দেশের সাফল্যের ব্যবস্থা-পত্র ছিল পরিকল্পনা আর সেই সাথে পুঁজির সঞ্চয়।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সকল ক্ষেত্রে সাফল্যজনক ফল লাভ হয়নি এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন কোন দিক সুবিধাজনকও হয়নি। স্বল্পোন্নত জগতের অনেকটা অংশই উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে এবং তারা মাথা-প্রতি আয়ও তেমন একটা বাড়াতে পারেনি। কোন কোন দেশে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে অত্যন্ত সমতাহীনভাবে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে সম্ভবতঃ ৫ কোটি লোক একটা আধুনিক উন্নয়নশীল অর্থনীতির অংশ হতে পেরেছে, কিন্তু প্রায় ৪০ কোটি অন্যান্যরা একটা নিশ্চল, পশ্চাৎপদ, দারিদ্র্য জর্জরিত অর্থনীতির অংশ হয়ে রয়েছে, যেসব মানুষের কোন রকম উন্নতিই হয়নি বলা চলে। অন্যান্য দেশে, বিশেষভাবে আফ্রিকার কোথাও কোথাও দুর্নীতি, অপব্যয় আর খারাপ পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর থেকে সম্ভাব্য লাভের প্রায় সবটুকুই

www.pathagar.com

খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। এমনকি কোন কোন দেশ, যারা পরিকল্পনা আর ভারী বিনিয়োগ কর্মসূচীর সাথে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে সাফল্যের চমৎকার নিদর্শন সৃষ্টি করেছে (যেমন ব্রাজিল আর মেক্সিকো), সেই সব দেশেও সম্পদ আর আয়ের বন্টন অত্যন্ত অসমই রয়ে গিয়েছে; রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক সামর্থ্য সেখানে অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ; ওসব দেশে গণ–বেকারত্বের সমস্যা ১৯৭০-এর দশকে তীব্রতর হচ্ছে আর এ দিকে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মন্দা দেখা দিয়েছে ; ফলে এই ধরনের অনেক দেশ যাদের প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা আগে ভালই ছিল, তারা এখন ক্রমশঃ স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যুগে যে সম্পদ আর ক্ষমতার নতুন প্যাটার্নটা সৃষ্টি হয়েছিল তা অক্ষত রাখতে।

চীন দেশের অর্থনীতি

স্বল্পোন্নত জাতিগুলোর মধ্যে অর্থনীতিতে যাদের 'সাফল্যের কাহিনী' সবচেয়ে বেশী সকলের চোখে পড়েছে, সে হলো চীন দেশ। যদিও চীনের উন্নয়ন সম্পর্কে উপাত্ত খুব কমই পাওয়া যায় এবং তার মূল্যায়নও বেশ কঠিন, তবুও ১৯৪৯ সনে সেখানে কমিউনিস্ট সরকারের জয় লাভের পর থেকে তাদের তথ্যে দেখা যায় গড়ে সেখানে প্রতি বৎসর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬ ভাগ হারে। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগের অধিক বলে হিসাব করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাৎসরিক শতকরা ২ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে, আর কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বাৎসরিক শতকরা ৩ ভাগ হারে। মাথা–প্রতি ভোগও বৃদ্ধি পেয়েছে বাৎসরিক শতকরা ৩ ভাগ হারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই হারটা এশিয়ার অপর কোন কোন দেশ, যেমন তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ভাল নয়, কিন্তু তা গোটা তৃতীয় বিশ্বের তুলনায় যথেষ্ট ভাল। চীন দেশের বিরাট আয়তন আর তার দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করলে কোন কোন দিকে এটা এক ব্যতিক্রম সাফল্য। এই সাফল্যটা বুঝতে হলে একটু ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ১৯৪৯ সনে কমিউনিস্টদের বিজয়ের আগে চীনের অর্থনীতিতে যাদের প্রাধান্য ছিল, তারা হলো প্রাক–ধনতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের আমলের মুষ্টিমেয় ধনীঃ পল্লী অঞ্চলের জমিদার, যোদ্ধা–প্রভুর দল এবং ঋণদাতা মহাজন-শ্রেণী আর শহরের ব্যবসায়ী, বণিক আর টাকা লগ্নী ব্যবসায়ীরা। সরকার ছিল স্বৈরাচারী আর দুর্নীতি পরায়ণ। অর্থনীতি প্রায় দুই দশকের গৃহযুদ্ধ এবং জাপানের সাথে যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত ; যেসব এলাকা

www.pathagar.com

জাপানী সৈন্যের দখলে ছিল অর্থাৎ গোটা দেশের অর্ধেকের বেশী এবং জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই বৈদেশিক শাসনের অধীন ছিল।

ঐ সময়টাতেই মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি তার বিশেষ চরিত্রটা গড়ে তোলে। দক্ষিণ চীনে প্রথম আমলের শক্তির অবস্থান থেকে যখন তাদের বিতাড়িত করা হয়, তখন তাদের সৈন্য বাহিনী এবং নেতৃত্ব এক 'লং-মার্চে'র মাধ্যমে ১৯৩৪-৩৫ সনে উত্তর-পশ্চিম চীনের শেন্‌সী প্রদেশে চলে যায়। এখানেই চীনের উন্নয়নের নতুন ছাঁচটা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা ছিল পল্লীভিত্তিক, শহরভিত্তিক নয়, গণ-ভিত্তিক, মুষ্টিমেয় সংখ্যক সুবিধাভোগী-শ্রেণীভিত্তিক নয়, সেখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল যৌথ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর এবং কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উপর, ব্যক্তিগত সম্পদ আর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার উপরে নয়, আর তাদের নতুন আচার-অনুষ্ঠানের ধরন এবং প্রেরণা গড়ে তোলা হয়েছিল সমকক্ষতার আর যৌথ আদর্শের ভিত্তিতে। যখন ১৯৪৯ সনে পুরনো সরকারের পতন হলো, তখন ঐ নীতিমালাই প্রয়োগ করা হলো গোটা দেশ জুড়ে।

মাও-এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের অংশ ছিল দেশের মোট শ্রম শক্তির পূর্ণ ব্যবহার। সরকারী কর্তৃপক্ষই এই দায়িত্ব নিয়েছিল যে প্রত্যেককে কোন না কোন কাজ দেওয়া হবে, হয় ক্ষুদ্রশিল্পে এবং শ্রম-প্রধান শিল্পে, যেগুলোর উন্নতি বর্ধন করে থাকে স্থানীয় সরকার, অথবা মূলধন-প্রধান শিল্পে কাজ দেয়া হবে, যেগুলোর দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। স্থানীয় পর্যায়ে নতুন যৌথ প্রতিষ্ঠান (collectives) গড়ে তোলা হয়, কৃষি আর ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য, আর এই সব প্রতিষ্ঠানে ক্রমশঃ চালু করা হলো যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম, ব্যক্তিকে উৎসাহ দানের (incentives) বদলে দল হিসেবে উৎসাহ দান। পড়তে লিখতে জানা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, জনসাধারণের স্বাস্থ্য আর কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হলো। প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম বস্তুগত নিরাপত্তা আর কল্যাণ, অর্থাৎ কাজ, খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্যের যত্ন এবং ঐ ধরনের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু বা সেবার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। এই ন্যূনতম পরিমাণটা ছিল সামান্য, কিন্তু বেঁচে থাকা আর নিরাপত্তার গ্যারান্টি ঠিকই দেয়া হয়েছিল। ঐ কৌশলের পরিসমাপ্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাকারীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং গ্রাম আর সহরের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটা সমতা আনার চেষ্টা করেছে।

www.pathagar.com

এই 'গণমুখী' কৌশল পুঁজির বিকল্পে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছে শ্রম শক্তিকে। যে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যক্তি-মালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতিতে পুঁজি সঞ্চয়ের উপায় হিসেবে নির্ভর করা হয় মুনাফার সাথে কর আর সঞ্চয়ের উপর, এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্যবহার করে কর আদায়ের সাথে মুনাফা আর সঞ্চয়কে, সে ক্ষেত্রে মাওবাদী কৌশল ছিল জন-সাধারণের শ্রম-শক্তিকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করা। উৎপাদনের যৌথ প্রতিষ্ঠান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যারা কাজে অংশ নিচ্ছে তাদের সহযোগিতা, দল-ভিত্তিক উৎসাহ, সমতাপূর্ণ আয় বন্টন আর উন্নয়নে সকল অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার পদ্ধতি, এই সবই একটি সম্পূর্ণ কৌশলের অংশ হিসেবে কাজ করেছে, যাতে করে এই ধরনের পুঁজির সঞ্চয় সম্ভবপর হয়।

এই কৌশলটা অবশ্য কখনো নিরেটভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। আর বিপ্লবোত্তর চীনের উন্নয়নও স্বচ্ছন্দ আর অব্যাহত গতিতে সম্পন্ন হয়নি। ১৯৪৯ সনের ঠিক পরেই কয়েক বৎসর ধরে চলে পূনর্গঠন আর ভূমি সংস্কার। তারপর আসে সোভিয়েট ইউনিয়নের ধাঁচে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন, পুঁজি-প্রধান প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৩-৫৭), যেটা মাওবাদী পদ্ধতির সাথে 'কলম' (grafted) করে দেয়া হয়। ১৯৫৮-৫৯ সনের 'বিরাট অগ্রগতি' (Great Leap Forward) প্রচেষ্টার যুগে সোভিয়েট আদর্শের নক্সাটা পরিত্যাগ করা হয়, আর ঐ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত এক অর্থনৈতিক দুর্যোগে পর্যবসিত হয়। তবুও, যে মৌলিক কৌশলটা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই প্রথম দশটা বছরেই গড়ে তোলা হয়েছিল। অবস্থার অবনতি দ্বিতীয়বার আসে 'বিত্তহীনদের কৃষ্টিমূলক মহান বিপ্লবের' (Great Proletarian Cultural Revolution) সময়ে, ১৯৬৬-৬৯ সনে, যেটা ছিল সরকার এবং জাতিকে বুর্জোয়া (bourgeois) মূল্যবোধ আর মানসিকতা থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় শেষ সংগ্রাম। অতঃপর তুলনামূলকভাবে অধিক সুস্থিত আর সুষম উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে এবং এখনও তাই হচ্ছে।

১৯৭৬ সনে মাও সেতুং-এর মৃত্যুর পর কয়েক বছর বেশ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় কাটে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন বিশৃংখলা হয়নি। নয়া-নেতৃত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, শিল্প, জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং বিজ্ঞান আর প্রকৌশলের কর্মসূচী চালু রেখেছে। যদিও মাও-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মূল প্যাটার্নটাই বজায় রাখা হয়েছে, তবুও মনে হয় এখন কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

পরিকল্পনার ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস করা, মজুরী আর বোনাসে কিছু পার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যমে কাজে ব্যক্তিগত উৎসাহ বৃদ্ধি করা আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপর বেশী জোর দেয়া হচ্ছে। এই সব পরিবর্তন কতদূর পর্যন্ত গড়াবে, সেটা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে।

ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিকল্পনা

যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ শিল্পায়িত দেশও ১৯৩০-এর দশকের বিপর্যয়ের পর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এতে জোর দেয়া হয়েছিল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রার উপর, যাতে করে সমৃদ্ধি বজায় রাখা যায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়া যায়। অবশ্য, ঐ লক্ষ্যের জন্য পরিকল্পনা করলেও ক্রমশ তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করেঃ শ্রমিক আর মালিকের সংঘর্ষের সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা, সরকারগুলো যে দিকে প্রয়োজন মনে করেছে অর্থনীতির সেই সব খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্পর্কে স্থিতিশীলতা গড়ে তোলা। এ কাজের দর্শনটা ছিল এই যে ঃ সামগ্রিক চাহিদা যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা হলেই বেসরকারী খাত নিজে থেকেই তাদের ভোগ আর উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। কিন্তু কাজের বেলায় এই দর্শন সংশোধিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার হাতিয়ারগুলো যুক্তরাষ্ট্রসহ সর্বত্র একই ছিল। প্রতি বৎসর একটা করে 'অর্থনৈতিক বাজেট" প্রস্তুত করা হয়। এতে দেখানো হয় ভোক্তা, ব্যবসা আর সরকারে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় আশা করা হচ্ছে। এই পরিমাণটার সাথে তুলনা করা হয় ঐ পরিমাণ ব্যয়ের যা দেশে পূর্ণ-কর্মনিয়োগ অবস্থা বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উদ্দিষ্ট হার অর্জনের জন্য প্রয়োজন হতে পারে। আশাকৃত ব্যয় (expected spending) যদি উদ্দিষ্ট বা প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মাত্রার চেয়ে কম থাকে, তবে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে সরকারী ব্যয়ের দ্বারা বা কর হ্রাস করার মাধ্যমে, বেসরকারী খাতে ব্যয়ে উৎসাহের মাধ্যমে টাকা সহজলভ্য করে অথবা বেসরকারী শিল্পে ভর্তুকীর দ্বারা। অপর পক্ষে, অত্যধিক ব্যয়ও বন্ধ করা হবে কর অথবা আর্থিক নীতি (monetary policy) বিপরীত দিকে কার্যকরী করে। এই ছিল কেইন্‌সীয় নকসা অনুযায়ী সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

অধিকাংশ দেশেই জাতীয় অর্থনৈতিক বাজেট নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও তুলনামূলকভাবে অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে (যেমন, দক্ষিণ ইতালী বা দক্ষিণ

www.pathagar.com

ফ্রান্সে) ব্যবসায়ের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কিছু সহায়ক কর্মসূচীর প্রয়োজন হয়। পশ্চিম জার্মান সরকার রফতানি শিল্পের প্রসারে সহায়তা দেয় আর পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশেও তাই করা হয়, যদিও তাদের বেলায় ততটা সাফল্য অর্জিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অস্ত্র নির্মাণে (spending on armaments) বিপুল পরিমাণ সরকারী ব্যয় দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলোতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করেছে। অধিকন্তু, সকল শিল্পোন্নত দেশই শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতের সেবায় সরকারী বরাদ্দের সম্প্রসারণ করে, কল্যাণমূলক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং বাসস্থান আর পরিবহণে ভর্তুকীর ব্যবস্থা করে। তা ছাড়া ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে যে শক্তির সংকট (energy crisis) সৃষ্টি হয় আর পরে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তার ফলে যুক্তরাষ্ট্র এবং সব পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশেই সরকার কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং শক্তির অপর নতুন সূত্রের উন্নয়নে জাতীয় লক্ষ্য স্থির করে, উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ সুসংগঠিত করে। গণতান্ত্রিক সরকারগুলো এটা স্বীকার করতে চায়নি যে তারা জিনিসের উৎপাদন আর বন্টনের ব্যবস্থাপনায় হাত দিতে চেষ্টা করছে কিন্তু আসলে তো তারা তাই করছিলো।

যুক্তরাষ্ট্রে, একটি প্রধান ক্ষেত্র যেখানে ফেডারেল সরকার পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সেটা হচ্ছে কৃষি। সরকারের ভূমিকা গবেষণা এবং উন্নয়ন আর তথ্য সরবরাহ করা থেকে এখন পরিবর্তিত হলো সমন্বয় বিধান করে দেয়াতে। প্রকৃত প্রস্তাবে উৎপাদনের কোন লক্ষ্য স্থির করা হয় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন খাদ্য শস্যের কি পরিমাণ উৎপাদন হবার সম্ভাবনা, আগে সেটা ঘোষণা করা হয় আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে কৃষকরা কতটা বীজরোপন করবে তা স্থির করতে তাদের উৎসাহিত করা হয়। কৃষিতে এই সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্য হলো কৃষক এবং ভোক্তা উভয়ের স্বার্থে বাজার দরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং বৈদেশিক দেনা-পাওনায় সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করা, কারণ বর্তমানে কৃষিজ পণ্যই মার্কিন জাতির সবচেয়ে মূল্যবান রফতানি।

আর একটি অনুভবনশীল ক্ষেত্রে সকল পশ্চিমা দেশের সরকারই ক্রমবর্ধমানভাবে হস্তক্ষেপ করেছে ঃ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক। শক্তিশালী-ব্যবসায়ী আর শক্তিশালী-শ্রমিক (প্রতিষ্ঠান) এই দুই-এর মধ্যকার বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করাটা আধুনিক অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার জন্য অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি ট্রাকের ব্যবসায় অথবা রেলরোডে জাতীয় পর্যায়ে

www.pathagar.com

একটা ধর্মঘট হয়, তবে সম্পূর্ণ অর্থনীতি এক সপ্তাহের মধ্যেই অচল হয়ে পড়বে। তা ছাড়া শ্রমিকের মজুরী যদি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তবে যেসব শিল্প রফতানি আয়ের উপর বেশী নির্ভরশীল, সেগুলোর খুব ক্ষতি হয়ে যাবে, এটা জাপান আর পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর জন্য বিশেষভাবে সত্য, যেহেতু সেসব দেশের সমৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে রফতানির উপর নির্ভরশীল। তাই এই সব দেশ দ্রুত এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখে যতটা সম্ভব, মজুরী সম্পর্কে একটা চুক্তিতে পৌঁছতে অগ্রসর হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে তো ইউনিয়ন আর শ্রমিক সমিতিগুলোকে সরকারের কড়া নজরের সামনেই শৃঙ্খলার অভ্যাস করতে হয়েছে। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রও ১৯৭০-এর দশকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে অগ্রসর হতে শুরু করে।

ধরতে গেলে পশ্চিমের সকল শিল্পোন্নত দেশেই একটা নতুন প্যাটার্ন গড়ে উঠতে শুরু করলো। পূর্ণ কর্মনিয়োগ, সমৃদ্ধি আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দেখা গেল যে বড় (ভাবে সংগঠিত) শ্রমিক আর বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজন বড় (শক্তিধর) সরকারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। বড় সরকারও চাইলো যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার খাতিরে শ্রমিক-মালিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা যুক্তিসঙ্গত মিটমাট করা হোক। তা ছাড়া অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার আপাতঃ অবস্থাটা বজায় থাকা— এ সবের জন্যও প্রয়োজন হলো এমন এক সরকারী কর্মসূচী, যাতে দরিদ্রের জন্য আর আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা থাকবে। বড় শ্রমিক, বড় ব্যবসা আর বড় সরকার তাই এমন এক অবস্থায় পরস্পরের মুখোমুখী হলো, যে ক্ষেত্রে তাদের জন্য একে অপরের সাথে সহযোগিতা করার, সমস্যাবলীর (পরস্পরের কাছে) গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার আর বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোর মধ্যে উপস্থিত সম্পর্ক বজায় রাখাটা দরকার হয়ে পড়লো। অর্থাৎ, সকল শিল্পায়িত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ক্রমশঃ (অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংযোগে গঠিত) এক যৌথ রাষ্ট্রের (corporate state) বিকাশ ঘটানোর দিকে এগিয়ে চলেছে।

অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে সকল রকম সংঘর্ষ শেষ হয়ে গিয়েছে। অবস্থা বরং তার উল্টো। আধুনিক শিল্প-অর্থনীতিতে সংঘাত ঘটছেঃ শ্রমিক আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, শিল্পের প্রতিষ্ঠান আর গোটা শিল্পের মধ্যে, ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে, বিভিন্ন পর্যায়ের আয় সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে। সরকারের একটি ভূমিকা হলো এই সব সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করে দেয়া, স্বার্থের বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যে মিটমাট করে দিয়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

www.pathagar.com

বড়-ব্যবসায়ী, বড় শ্রমিক আর বড় সরকারের এই স্বার্থের মিতালী (symbiosis) দেখে মনে পড়ে, এ যেন প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের জার্মানী, ইতালি এবং জাপানের সেই কালের অর্থনীতিরই স্মারক, যার সাথে নেই শুধু তাদের স্বৈরাচারী সরকার আর ত্রাস-সঞ্চারের রাজনীতি। কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতে দেখা যাবে যে আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজ সংকটে পড়লে ফ্যাসিস্ট-ধরনের সমাধানের (Facist type solution) দিকেই এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী প্রগতিশীল পঁচিশ বছরে রাজনীতির ধারাটি কিন্তু এমন ছিল না। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে পথে বিকাশ লাভ করছে, তার সাথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলোর (শুধু) অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের আশ্চর্য রকম মিল আছে। শতাব্দীর শুরুতে ভেব্‌লেন ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণে যে সুর তুলেছিলেন আর যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউ-ডিল' যুগে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল, দেখতে পাচ্ছি এ যেন সেই পুরনো সুরেরই পুনরাবর্তন।

www.pathagar.com

১১

মিশ্র অর্থনীতি

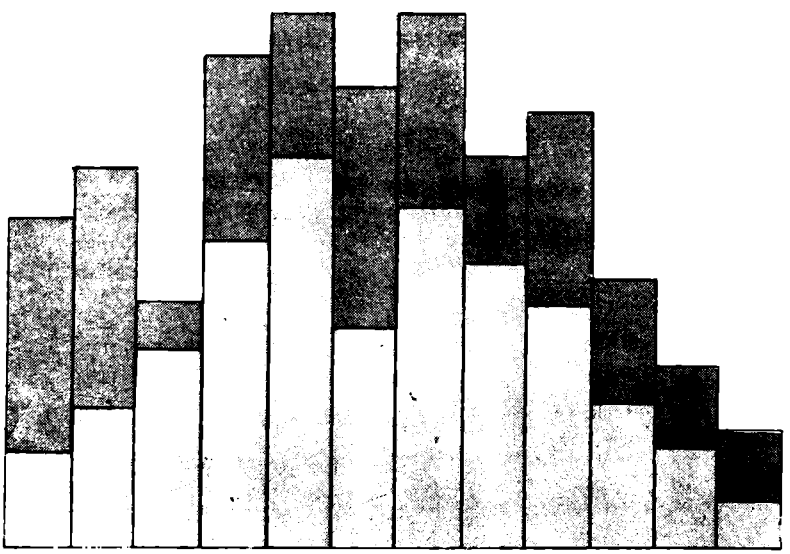

ভূতপূর্ব সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্‌চেভ একবার মস্কোয় মার্কিনীদের একটি দলকে ভোজ সভায় মদ্যপানে আহবান (toasted) করার সময় অধুনা-বিখ্যাত এক মন্তব্যে বলেছিলেন, 'আমরা তোমাদের করব দেব'। যদিও কথাটা কিছুটা কৌতুকের স্বরেই বলা হয়েছিল, তবু তা যেন এ যুগের মতাদর্শবাদী সংগ্রামেরই প্রতীক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ জনগণের আনুগত্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, আর এই প্রতিযোগিতাটা দার্শনিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক-সকল পর্যায়েই দৃশ্যমান।

www.pathagar.com

এই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে উভয় পক্ষেরই ব্যবহার করা 'লৌহ যবনিকা', 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ', 'জন–গণতন্ত্র', 'নয়া সাম্রাজ্যবাদ', 'দাঁতাত' (detente) ইত্যাদি কথার মাধ্যমে। ইতিমধ্যে আবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, আর অর্থনীতিবিদরা ঐসব পরিবর্তনের প্রকৃতিটা বুঝে নেবার জন্য, আর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

ধনতন্ত্র কি টিকে থাকবে ?

জোসেফ শুম্‌পেটার (১৮৮৩-১৯৫০) মনে করতেন ধনতন্ত্র টিকে থাকতে পারবে না। তিনি এবং জন মেনার্ড্ কেইনস্ একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই কালের দুইজন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হিসেবে শুম্‌পেটারকে কেইন্‌সের সমতুল্য মনে করা হতো। অর্থনৈতিক তত্ত্বের যে দিকটাতে শুম্‌পেটার কাজ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আজ ঐ শাস্ত্রের অন্যান্য দিকেও সম্প্রসারণ ঘটেছে, কিন্তু তাঁর তিনটি প্রধান গ্রন্থ অর্থনীতিবিদদের কাছে সমাদর লাভ করতেই থাকবে। এই তিনটি গ্রন্থেই পুঁজিবাদী উদ্যোগীর (capitalist entrepreneur) প্রশংসা গাওয়া হয়েছে আর তাকে বর্ণনা করা হয়েছে একজন নতুনের প্রবর্তনকারী, মুনাফা সন্ধানী হিসেবে, যার চেষ্টার ফলেই অবিরাম পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানা–ভিত্তিক ব্যবস্থা তার গতিশীলতা পেয়েছে।

'দি থিওরী অব ইকনমিক্ ডেভেলপ্‌মেন্ট' (১৯১২) নামক তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে শুম্‌পেটার অর্থনৈতিক অগ্রগতি আর পরিবর্তনে শিল্পোদ্যোগীর কাজ আর ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। মালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতিতে যারা নতুন জিনিস উৎপাদন করবে, উৎপাদনের নতুন কৌশল এবং নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করতে পারবে, তাদের জন্য প্রচুর পুরস্কারের সম্ভাবনা বিদ্যমান। যে লোকটি সকলের আগে উৎপাদন ব্যয় কমাতে পারবে বা ভোক্তার কাছে আকর্ষণীয় কোন নতুন জিনিস বাজারে ছাড়বে, সে বিরাট মুনাফা অর্জন করতে পারে। সেই অগ্রগামী লোকটি হলো শিল্পোদ্যোগী, যার ক্রমাগত নিত্য নতুন প্রবর্তনই হচ্ছে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রবৃদ্ধি আর পরিবর্তনের যে স্বভাব রয়েছে, তার গোড়ার কথা।

শুম্‌পেটার তাঁর বিশ্লেষণ আর এক ধাপ এগিয়ে নেন 'বিজিনেস্ সাইকল্‌স্' (১৯৩৯) নামক গ্রন্থে যেখানে তিনি যুক্তি দেখান যে এক–একটা সময় আসে

www.pathagar.com

যখন নতুনের প্রবর্তনগুলো (innovations) গুচ্ছ হিসেবে অনেকটা এক সাথে ঘটে যায়, একটির ফল স্বরূপ আর একটি এসে যায়— যা থেকে সৃষ্টি হয় বড় ধরনের বিনিয়োগের তেজী বাজার (booms), আর তা থেকেই আসে দীর্ঘস্থায়ী একটা সমৃদ্ধির যুগ। এই উঁচু পর্যায় থেকে বিনিয়োগ যখন নেমে আসে, তখন সমৃদ্ধির সময় শেষ হবার পর আসে নিশ্চল অবস্থা আর দুঃসময়। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের এই 'দীর্ঘ তরঙ্গে'র উপর আবার প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের সুপরিচিত ব্যবসায়ের চক্রগুলো (business cycles) ঃ সুসময়ের একটা উঠ্‌তি দীর্ঘমেয়াদী তরঙ্গের স্থায়ী গতির মধ্যেই ছোট আকারের হাল্কা নিম্ন গতি দেখা যায় এবং তার বিপরীতটা আবার ঘটে দীর্ঘমেয়াদী দুঃসময়ের আমলে। সেই পদ্ধতিতেই পুঁজিবাদের এই সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পর পর শিল্প-বিপ্লবগুলো ঘটতে থাকে, যার প্রত্যেকটাই একবার দীর্ঘকালের জন্য সুসময় নিয়ে আসে আর এর মূলে থাকে একগুচ্ছ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত নতুন আবিষ্কারের প্রয়োগ।

যেসব নৈরাশ্যবাদীরা ১৯৩০ এর মহামন্দা দেখে ভেবেছিলেন যে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পতনের এটাই আলামত, তাদের জন্য ঐ গ্রন্থটা ছিল এক ধরনের জবাব। শুম্‌পেটারের যুক্তিতে এই কথাই নিহিত ছিল যে গোটা ব্যবস্থাটা এখন তার দীর্ঘমেয়াদী তরঙ্গের নিম্নমূখী পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং ভবিষ্যতে যখন আবার নতুনের প্রবর্তন আর প্রকৌশলিক পরিবর্তন ঐ তরঙ্গের গতি ঊর্ধ্বমুখী করে দেবে তখন সামনে আবার সুদিন আসবে। অধিকন্তু, এই গ্রন্থে তিনি ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত গতিশীলতা সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করলেন আর মার্কসের প্রতি তাঁর জবাবটা ছিল এতে। ধনতন্ত্রের কুফলগুলো এর দোষ থেকে আসছে না বরং এর নিজস্ব শক্তির কারণেই তা ঘটছে। শিল্পোদ্যোগীর অভিনবত্ব প্রবর্তন আর মুনাফার সন্ধানমূলক কার্যাবলীর কারণেই পরিবর্তন, প্রবৃদ্ধি আর সম্প্রসারণ ঘটছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা সুস্থির আর সুকোমল নয় বরং এর স্বভাবই অনিশ্চিত গতি, যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যবসায়ের চক্র।

এই ব্যবস্থাটা, অর্থাৎ ধনতন্ত্রের গতিশীল উপাদানগুলোই যে এর অসুবিধাগুলোও ঘটায়, এটাই শুম্‌পেটার ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে যার নাম 'ক্যাপিটালিজ্‌ম, সোসালিজ্‌ম অ্যাণ্ড ডেমোক্র্যাসি' (১৯৪২)। সকলের জন্য পর্যাপ্ত দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদনের জন্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা যে উপযুক্ত, এটা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর হিসাব মত ১৯২৮ থেকে ১৯৭৮ এই পঞ্চাশ বৎসর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে বলে দেখা যাবে, যার ফলে সে দেশে, শুধু অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ছাড়া সর্বত্র দারিদ্র্য খতম

www.pathagar.com

করা সম্ভব হবে। কিন্তু, এই প্রক্রিয়ায় ধনতন্ত্রের কয়েকটি সামাজিক বৈশিষ্ট্যও দৃশ্যমান হয়ে উঠবে।

একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শিল্প সংগঠক বা শিল্পোদ্যোগী (entrepreneur) শ্রেণী ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাবে। বৃহদাকার উৎপাদনের প্রকৌশল আর সংগঠন পুঁজিবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান যার ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রমশ বড় হতে থাকবে আর তার বাজার একচেটিয়া হবার প্রবণতা লাভ করবে। আর বড় বড় প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে যে আমলাতন্ত্র সৃষ্টির দরকার হয়, সেখানে কোন ব্যক্তিত্বপূর্ণ উদ্‌ভাবক শিল্পোদ্যোগীর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। ঐ মানুষগুলো একলা-চলায় অভ্যস্ত, বড় পরিকল্পনার স্বাপ্নিক এবং ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত, অপর পক্ষে, আমলাতন্ত্র পরিচালিত হয় 'কমিটি'র সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর কমিটির লোকদের প্রবণতা হলো যা আছে সেটার পরিবর্তন না করে যথাসম্ভব স্থিতাবস্থা (status quo) বজায় রাখা। তাই শিল্পোদ্যোগীরা যে প্রতিষ্ঠান একদিন সৃষ্টি করেছিল, সেটা তাদের সেবা অপ্রয়োজনীয় বলে তাদেরকেই বাতিল করে দিল।

বিকাশমান ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে বলে শুম্‌পেটার ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তা হলোঃ ঐ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের বদলে দেশের বুদ্ধিজীবী মহল বরং এর বিরোধিতাই করবে। চিন্তাশীল, লেখক, শিক্ষক সাধারণতঃ বিরাজমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচক, যদিও এটা সত্য যে তাঁদের বর্তমান মর্যাদাটা ধনতন্ত্রের সৃষ্ট প্রাচুর্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাঁদের কাজ হলো এই পৃথিবীর কল্যাণের জন্য এর যাবতীয় দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দেয়া। তাঁরা ধনতান্ত্রিক জীবন-যাপন পদ্ধতির বিরোধী একটি মত-পরিবেশ গড়ে তুলতে সফল হয়েছেন।

আর ঐ জনমতের পরিবেশই জন্ম দিয়েছে তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের যেটা হলো- অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকারী হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপ অর্থনীতির ত্রুটিগুলোর দিকেই নির্দেশিত হয়- অসমতা হ্রাসের দিকে, ব্যবসায়িক চক্রের উঠা-নামা হ্রাস করতে ফাট্‌কাবাজারী হ্রাস করতে, একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে, কৃষিতে ভর্তুকী দিতে, ইত্যাদি। এ সবের পরোক্ষ ফল (by-product) হিসেবে কিন্তু শিল্পোদ্যোগীর কাজের স্বাধীনতা কমে যায় আর অর্থনীতির গতিশীলতা আরো হ্রাস পায়।

অর্থনৈতিক সংগঠনের এই গতিধারা, মত-পরিবেশ এবং সরকারী কর্মনীতি ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক জীবন থেকে শিল্পোদ্যোগীকে খতম করে

www.pathagar.com

দিচ্ছে আর সেই সাথে শেষ হয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক প্রগতি.যা হলো ধনতন্ত্রের প্রধান আকর্ষণ। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ধনতন্ত্র নতুন প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আর এ ব্যবস্থা একদিন ভেঙ্গে পড়বে বলে বুদ্ধিজীবীরা যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়। এ ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা যত কম হতে থাকে, সরকারী হস্তক্ষেপও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা এই ব্যবস্থার প্রাণশক্তিকে আরো ক্ষীণ করে আনে এবং সমাজতন্ত্রকে অনিবার্য করে তোলে। শুম্পেটার বিশ্বাস করতেন যে সময়ের ধারায় এমন একদিন আসবে যখন ধনতন্ত্রের স্থলে সমাজতন্ত্র এসে যাবে আর সেটা গণতান্ত্রিক কিম্বা স্বৈরাচারী রাজনৈতিক কাঠামোর যে কোনটাতেই হতে পারে– অর্থাৎ ভবিষ্যতে বেছে নেবার জন্য প্রধান যে বিষয়টা থাকবে সেটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থিত। "ধনতন্ত্র কি টিকে থাকবে?'' এই প্রশ্নে শুম্পেটারের উত্তর ছিল, "না, আমার ধারণা তা পারবে না।''

পরিবর্তনশীল অর্থনীতি

একটি বিষয়ে শুম্পেটারের কথা ঠিকঃ অভিনবত্বের প্রবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর পরিবর্তন, এগুলো এক সাথেই ঘটে, আর একে অপরকে জোরদার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পঁচিশ বছর ছিল বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর ক্রমাগত সম্পদ সৃষ্টির এক অতুলনীয় সুযোগের কাল। ১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অনেক অর্থনীতিবিদেরই যে চিন্তা এবং ভয় ছিল, বাস্তবে সেটা ঘটে নি অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অর্থনীতিকে যে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে গতিশীল করে তুলেছিল, যুদ্ধ শেষে অর্থনীতি আর সেই নির্জীবতায় ফিরে যায়নি। মন্দা বা গতিহীনতার বদলে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব–অর্থনীতি বরং দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের দ্বারা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো অচিরেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আর বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠে। গোড়ার দিকে কিছুদিন অর্থনৈতিক আর সামাজিক আন্দোলনের পর পূর্ব–ইউরোপও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই মিছিলেই সামিল হয় এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন তার অগ্রগতির ধারা বজায় রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাও ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক অব্যাহত ধারা, যদিও মাঝে ১৯৫০–এর দশকে সেকেলে আর্থিক আর শুল্ক–নীতির ফল হিসেবে কিছুকাল মাত্র একটা উল্লেখযোগ্য মন্দা ভাব দেখা দিয়েছিল। জাপান এই সময়ে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয় এবং বেশ কয়েকটি অনুন্নত দেশ নিজেদেরকে উন্নয়নশীল জাতিতে রূপান্তরিত করে।

www.pathagar.com

এই অগ্রগতির একটি বড় কারণ ছিল ইলেক্‌ট্রোনিক্স, প্লাস্টিক, আণবিক শক্তি আর মোটর–পরিবহণ শিল্পে বিনিয়োগের বিপুল আকস্মিক বৃদ্ধি। এসবের ফলে মোটর গাড়ী, জেট-বিমান, কম্পুটার আর স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের এক নতুন যুগ শুরু হলো, সেই সাথে নগরায়ন সম্প্রসারিত হয় আর অর্থনৈতিক সুযোগের এক বিশাল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

প্রবৃদ্ধির প্রসারে দ্বিতীয় উপাদানটি ছিল গবেষণার ক্ষেত্রে বিপ্লব। ব্যবসা–প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী কর্মকাণ্ডে অভিনবত্বের প্রবর্তন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা দেয়। মৌলিক এবং ফলিত গবেষণা এমন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায় যে তা ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকের পর্যায়কে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায় আর তা ব্যবসা এবং সরকার উভয়েরই কাজের একটি স্বীকৃত অংশ হয়ে পড়ে। এই গবেষণা আর উন্নয়ন (Research and Development) যা হলো নতুনের প্রবর্তনের জন্য একটি মৌলিক উপাদান এটাই গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নতুন এক গতিশীলতা এনে দিল, যদিও স্বীকার করতেই হবে যে এর অধিকাংশই জড়িত ছিল সামরিক প্রয়োজন আর চাঁদে যাবার প্রতিযোগিতার সাথে।

যুদ্ধোত্তর সম্প্রসারণের তৃতীয় উপাদান ছিল আগের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বসহ ক্রেতার আত্মপ্রকাশ। আয় বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক ক্রেতার জন্য জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের পর আয়ের উদ্বৃত্ত 'ইচ্ছামত খরচ করবার অংশ' (discretionary income) ক্রমশ বাড়তে থাকে, যাতে করে তারা বাড়ী বানানো, বাড়ীর আসবাবপত্র, গাড়ী এবং অন্যান্য স্থাবর সামগ্রীতে বিনিয়োগ, তার সাথে অধিক পরিমাণে নিরাপত্তামূলক সঞ্চয় এবং বীমা পলিসিতে টাকা খাটাতে সমর্থ হয়। মানুষের অবসর সময় বৃদ্ধি পাওয়ায় চিত্তবিনোদনের শিল্প সম্প্রসারিত হয় আর অধিক পরিমাণে সেবামূলক শিল্পও গড়ে উঠে। এক কালে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রা আর মিশ্রণ নির্ধারণ করাতে এইভাবে "শক্তিশালী ক্রেতা" আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী হয়ে উঠলো।

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চতুর্থ উপাদানটা ছিল সরকারী খাতে অস্ত্র নির্মাণ আর কল্যাণমূলক কাজে বিপুল পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি। যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়ার মধ্যকার ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে সামরিক ব্যয় বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায় এবং কোরিয়া আর ভিয়েতনামে যে যুদ্ধ চলতে থাকে তাতেও সরকারী ব্যয়ের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের প্রকৌশল যখন বন্দুক, ট্যাংক আর উড়োজাহাজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে আণবিক অস্ত্র, মিসাইল আর ইলেক্‌ট্রোনিক অস্ত্রের রূপ নিল, তার কারণে বিনিয়োগের পরিমাণটাও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।

www.pathagar.com

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো এই সম্প্রসারণের সুযোগ কাজে লাগালো। যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলোতে কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতায় যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটে, তা দুই-একটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনায় পরিণত হয়। সারা পৃথিবীর বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং বাণিজ্যের বাধাসমূহ অপসারণের আন্তর্জাতিক কর্মসূচী গ্রহণের ফলশ্রুতি হিসেবে আসে 'জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস্ অ্যান্ড ট্রেড' ইউরোপের 'সাধারণ বাজার' এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যকার আঞ্চলিক সংঘসমূহ।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বারা কারিগরী কৌশলের দ্রুত পরিবর্তনও উৎসাহিত হয়। কম্পুটার এবং ইলেকট্রোনিক নিয়ন্ত্রণসমূহ প্রবর্তনের ফলে বৃহদায়তন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিরও ব্যবহার শুরু হয় বিশেষভাবে শিল্পোৎপাদনে আর ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনায়। শ্রমের বিকল্পে যেমন ক্রমাগত অধিক পরিমাণে মূলধন ব্যবহৃত হতে লাগলো, তার ফলে শ্রমের আর শ্রম শক্তির প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটতে শুরু হলো। শ্রমবাজারের উপরের স্তরে নতুন শ্রেণীর সব উচ্চ কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন পদের সৃষ্টি হলো-যেমন কম্পুটার প্রোগ্রামিং বা পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্যও নতুন ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন পড়লো। দরকার হলো নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আর ব্যবস্থাপনার কৌশল, এবং প্রকৌশলী ব্যবস্থাপক-খানদান (technical managerial elite) শ্রেণীর সংখ্যা আর উৎকর্ষ উভয়ই বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে, শ্রম-শক্তির নিচের স্তরের অনেক পদ. বিলুপ্ত হলো বা পরিবর্তিত হয়ে গেল। উৎপাদন-লাইনের অনেক কাজই ছোট ছোট সহজ শ্রেণীতে ভাগ করে তা মানুষের বদলে কোন না কোন যন্ত্র দিয়ে করানো সম্ভব হলো। যদিও এই প্রক্রিয়াটা বিপ্লবের শুরু থেকেই চালু হয়েছিল, তবুও ১৯৪৫ সনের পরবর্তী বৎসরগুলোতে নতুন প্রকৌশল উদ্ভব হওয়ার পর এর তীব্রতা এবং প্রয়োগের বহুমুখিতা অনেক বৃদ্ধি পায়। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অবশ্যই শ্রম-শক্তির উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করলো। কিন্তু তার ফলে এখন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করেও উৎপাদন বৃদ্ধি করাটা সম্ভব ছিল, আর কার্যতঃ ঠিক এটাই ঘটলো। ১৯৫০ সনের পর যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যদিও এর জন্য কারখানায় শ্রম-শক্তির অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টি হয় অতি সামান্য পরিমাণে।

সম্ভবতঃ মানুষের সংখ্যার সাথে কাজের পরিমাণের এই সম্পর্কের সবচেয়ে লক্ষণীয় উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছিল কৃষিতে। যন্ত্রের ব্যবহার, শঙ্কর-চারা

www.pathagar.com

আর সার ব্যবহারের ফলে কৃষিতে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি, একই সঙ্গে দেখা গেল খামার থেকে বহু লোক শহরে চলে আসছে। কালো-চামড়ারই বিশেষভাবে এ ভোগান্তির শিকার হয়। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তুলা আর ভুট্টার ফসল তোলবার জন্য কার্যকর যন্ত্র চালু হয়ে যায় দক্ষিণের কৃষি খামারগুলোতে আর সেই সাথেই সয়াবিনের আবাদও দ্রুত বৃদ্ধি পেল, যাতে শ্রমিকের দরকার খুব অল্প। এসবের ফলে, দক্ষিণ অঞ্চলে অদক্ষ শ্রমিকের ব্যবহার খুব বেশী পরিমাণে হ্রাস পেলো আর বিপুল সংখ্যায় কালো মানুষেরা উত্তরের শহরগুলোতে উঠে আসলো। অন্যান্য শক্তির সহযোগে এই পরিযান (migration) যে চাপ সৃষ্টি করলো, সেটা অনুভূত হয় ১৯৬০-এর দশকে শহরের দাঙ্গা-হাঙ্গামায়, আর এখানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের এবং বর্ণ সম্পর্কের যে সংকট চলছে, তাতে ঐ কারণটার অবদান যথেষ্ট।

কিন্তু ওটা ছিল প্রকৌশলিক পরিবর্তনের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষক উদাহরণ। শ্রম-শক্তির একটা কাঠামোগত পরিবর্তন ইতিমধ্যে স্থিরভাবে ঘটে চলেছিল। শিল্প-কারখানায় যখন পদের সংখ্যা কমে গেল (যেগুলোর মজুরীও বেড়ে গিয়েছিল), তখন অধিক সংখ্যায় পদের সৃষ্টি হলো সেবামূলক শিল্পগুলোতে (যেখানে তুলনামূলকভাবে মজুরী কমই থেকে যায়)। অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগ বাড়লো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সেবার জন্য সরকারী চাকুরীতে এবং সম্প্রসারণশীল যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাদা-পোষাকের (white collar) প্রশাসনিক পদসমূহে।

শিল্প কেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের সামাজিক শ্রেণীগুলোতে কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন এলো। উপর তলার ব্যয় বহুল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চ-আয় সম্পন্ন বাছাই করা কারিগর আর ম্যানেজারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো। সম্প্রসারণশীল সেবামূলক শিল্পে নিচের তলার স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়ে গেল। এই সব শ্রমিকের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল নগণ্য। তাদের মজুরী কমই থেকে গেল, কারণ জনসংখ্যার একটি অংশ বেকার বা আধা-বেকার অবস্থায় কল্যাণ-ভাতা, খাদ্যের টিকিট (food-stamps) এবং অন্যান্য সাহায্যের উপর নির্ভরশীল উদ্বৃত্ত শ্রমিক হয়ে যায়। (যুক্তরাষ্ট্রে শ্রম-শক্তির এই অংশে ছিল বিপুল সংখ্যক কালো মানুষ, হিস্‌প্যানিক বা বহিরাগত শ্রমিক আর অনেক মহিলা।) এই পরিপ্রেক্ষিতে অসন্তোষ, হিংসাত্মক ঘটনাবলী এবং আইন-শৃংখলাভংগও বেড়ে যায়। অনেক আগে ১৯১৪ সনের দিকে লেনিন এই ধরনের কিছু ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং একজন সুইডিস অর্থনীতিবিদ একে "ইংরেজদের

www.pathagar.com

অসুখ" বলে আখ্যা দেন, কারণ এটা নাকি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডেই দেখা গিয়েছিল। একই ধরনের ব্যাপার ইউরোপের সকল শিল্পোন্নত জাতিগুলোতেই দেখা গেল।

প্রবৃদ্ধি, পুঁজি সঞ্চার আর কারিগরী পরিবর্তনের প্রকৃতি অনুধাবনের ব্যাপারে অর্থনীতিবিদরা ছিল উদ্যমহীন। নিও-ক্ল্যাসিক্যাল এবং কেইন্‌সীয়, উভয় তত্ত্বেই বাজার-ব্যবস্থায় উঠা-নামা এবং সার্বিক চাহিদার দিকে মনোযোগ দেয়া হয় বটে, কিন্তু অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর (institutional structure) পরিবর্তনের দিকে তারা বিশেষ নজর দেয়নি। অবশ্য পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ফলাফল নিয়ে হঠাৎ একবার চিন্তাভাবনার জোয়ার দেখা দেয় এবং ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি "কাঠামোগত বেকার সমস্যা" নিয়ে একটা বিতর্কের ঝড় উঠে। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের শেষে এবং ১৯৭০-এর দশকের শুরুতেই প্রথম একদল তরুণ অর্থনীতিবিদ এই ঘটনাটার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলঃ কেইন্‌সীয় নীতি কার্যকর করা, যুদ্ধকালীন অর্থনীতি এবং উর্ধ্বগামী দ্রব্যমূল্য এসব সত্ত্বেও কেন বেকারত্বের হার সব সময় বেশীই থেকে যাচ্ছে ? তারা এর কারণ খুঁজে পেল দ্বৈত শ্রম-বাজারে (dual labour market) যার একটি অংশে মজুরী উচুঁতেই থাকছে, তুলনামূলকভাবে অধিক শ্রমিক-ইউনিয়নের কড়া সংগঠনের ফলে; এবং অপর অংশে মজুরী কম, শ্রমিকের অদক্ষতা, তাদের কোন ইউনিয়ন নেই এবং তাদের মধ্যে বেকারত্বের হারও অধিক।

অর্থনীতির অপরাপর পরিবর্তন সম্পর্কে পর্যাপ্ত বর্ণনা আছেঃ বৃহদায়তন যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়, সুসংগঠিত শ্রমিকের আবির্ভাব এবং সরকারী খাতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণ। এই সব পরিবর্তনের ধারা অনুশীলনের দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মোটামুটি স্বয়ং-সমন্বয়কারী বাজার-ব্যবস্থার যে সনাতন ধরনটা ছিল নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির অভিজ্ঞতাপ্রসূত ভিত্তি, সেটা এখন যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

বৃহৎ-ব্যবসা, বৃহৎ-শ্রমিক আর বৃহৎ-সরকার

ধনতন্ত্রের পক্ষে মহা-মন্দা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছিল এবং অতঃপর অর্থনীতি এক অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কিন্তু প্রাণে বাঁচার মূল্য হিসেবে তার চেহারার পরিবর্তন হলো। আমরা আজ যে ধনতন্ত্র দেখছি, তার সাথে আমাদের দাদা-দাদীর আমলের ধনতন্ত্রের মিল খুব কম। 'বৃহদায়তন-শিল্প' প্রতিষ্ঠান আরো বড় আকার পেয়েছে আর ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম দিয়েছে

www.pathagar.com

'বৃহদায়তন শ্রমিক' প্রতিষ্ঠানের। আর এ দুটোই আবার সরকারের আয়তনে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

ব্যবসা–প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে একটি সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ হলো অ্যাডল্‌ফ এ. বেরলী (জুনিয়র) এবং গার্ডনার সি মিনস্ রচিত "দি মডার্ন কর্পোরেশন অ্যান্ড প্রাইভেট প্রপার্টি'' (১৯৩২)। আধুনিক অর্থনীতিতে বড় কর্পোরেশনগুলোর প্রভাবশালী ভূমিকা, তাদের পুঁজির ক্রমশঃ ব্যাপক বিস্তার এবং মালিকানা থেকে নিয়ন্ত্রণের পৃথকীকরণ সম্পর্কে এতে প্রচুর তথ্য দেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে, ক্ষমতার যে নতুন কাঠামো আত্মপ্রকাশ করলো, তাতে এসব যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা নীতি–নির্ধারণের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে, যদিও এদের শেয়ারের মালিকানার পরিমাণ থাকে অতি নগণ্য। বইটিতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে পুরনো আমলের "মুনাফার যুক্তি"–টা এখন অযৌক্তিক হয়ে পড়ছে, কারণ মুনাফা যাচ্ছে শেয়ার মালিকদের কাছে, ব্যবস্থাপকদের কাছে নয়, আর উৎপাদনের সিদ্ধান্তগুলো এখন আর ভোক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। ভোক্তার চাহিদা, মুনাফা আর ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত– এই তিনটির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং বন্ধন ছিল, সেটা এখন একেবারেই শিথিল হয়েছে। একালের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে বরং প্রতিফলিত হচ্ছে ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন, এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

এই লেখকদ্বয়ের চিন্তাধারা পরে আরো কতকগুলো গ্রন্থে বিকাশ লাভ করে। বেরলী কয়েকটি প্রবন্ধে এবং গ্রন্থে দুটি ধারণা সম্পর্কে লেখেন, এগুলোর মধ্যে অধিক উল্লেখযোগ্য হলো 'দি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্যাপিটালিস্ট রেভলিউশন্' (১৯৫৪), 'পাওয়ার উইদাউট্ প্রপার্টি' (১৯৫৯) এবং 'দি আমেরিকান ইকনমিক রিপাবলিক' (১৯৬৩)। প্রথম ধারণাটা এই যে অর্থনীতিতে কর্পোরেশন যে নতুন স্থান দখল করেছে তার ফলে এই বৃহৎ ব্যবসায়ের কাজটাও যেমন সার্বজনীন হয়ে পড়েছে, তেমনি তাদের দায়িত্বও আজ সার্বজনীন, যার ফলে এসব ব্যবসা–প্রতিষ্ঠান এবং তার ব্যবস্থাপকদের নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা সাবধান হয়ে ব্যবহার করতে হবে, জন-সাধারণের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে আর তাদের মুনাফার অভিযানকে পরিমিত করতে হবে। বলা বাহুল্য, এটা অত্যন্ত বিতর্কিত বক্তব্য। দ্বিতীয় ধারণাটা এই যে ব্যক্তিগত সম্পদের প্রকৃতিও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। সম্পদ যখন শক্তিমান যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানায় থাকছে, আর

www.pathagar.com

ঐ সব প্রতিষ্ঠানে যখন ব্যাপক প্রকৃতির, এই সম্পদও সুতরাং, আগের দিনের অর্থে আর ব্যক্তি মালিকানায় নেই, এবং যাদের হাতে এই শক্তিটা নিহিত, তারাও আর স্বাধীনভাবে ইচ্ছামাফিক শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে, আমরা এমন একটা সম্পর্কের দিকে এগিয়ে চলেছি, যেখানে সাধারণের স্বার্থ (public interest) ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে থেকে যায়। বেরলীর ভাষায় ঃ

মার্কিন সমাজকে এখন আর মুনাফা সন্ধানী বাজার-প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক ব্যবস্থা তার নিজ স্বার্থে ব্যবহার করছে না, বরং মার্কিন সমাজই এখন ওটাকে ব্যবহার করছে, আর নিঃসন্দেহে তাদের দ্বারা প্রশাসিত হচ্ছে না। তাই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলো আদতে রাষ্ট্রেরই একটি হাতিয়ার আর আগে যেটা মনে করা হতো (সম্ভবতঃ সঠিকভাবেই) যে এদের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র আছে, সে কথাটা ঠিক নয়। কথাটা অন্যভাবে বল্‌লে দাঁড়ায় যে সম্পদ যদিও ব্যক্তির হাতেই আছে, তবুও এর ব্যবহারটা আংশিকভাবে সমাজতান্ত্রিক (socialised) হয়ে গিয়েছে। গার্ডনার মিন্‌স পর্যালোচনা করেছেন অর্থনীতিতে 'বৃহৎ-ব্যবসা'র স্থান সম্পর্কে অন্য কতকগুলো বিষয়, যেমন, জিনিসের মূল্য এবং মূল্যনির্ধারক নীতি। অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্র একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর আওতায় রয়েছে, সেখানকার মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটাকে তিনি 'নির্দেশিত মূল্য' (administered prices) নামে সর্বপ্রথম আখ্যায়িত করেন।*

মিনস্ দেখিয়ে দিলেন যে ঐ ধরনের মূল্যগুলো তুলনামূলকভাবে অনমনীয় হয়ে থাকে, আর চাহিদার পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে ঐসব মূল্য পরিবর্তিত হতে দেখা যায় না। মন্দার বছরগুলোতে যখন চাহিদা কমে যায়, কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাদের মূল্য স্থির রেখে উৎপাদন আর শ্রমিক নিয়োগ হ্রাস করে দেয়। দ্রব্যমূল্যের পক্ষে বাজারে কার্যকারিতাকে এইভাবে এড়িয়ে যাবার স্বাধীনতা আর সেই সাথে বড় কর্পোরেশনগুলোর বিপুল ক্ষমতা বস্তুতঃ এক নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। মিন্‌স 'দি কর্পোরেট রেভলিউশন ইন আমেরিকা' (১৯৬৪) নামক তাঁর পরবর্তী একটি কাজে বলেনঃ

---

* কথাটা সর্বপ্রথম কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক একটি গোপণীয় মেমোরান্ডামে ব্যবহৃত হয় যেটা ফাঁস হয়ে প্রথমে সাংবাদিকদের হাতে এবং পরে কংগ্রেসে পৌছায়; পরে ওটা মার্কিন সিনেটের ৭৪তম কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের ১৩ নম্বর নথি হিসেবে প্রকাশিত হয়, যার নাম ছিল, ইন্ডাষ্ট্রিয়েল প্রাইসেস্ অ্যান্ড দেয়ার রিলেটিভ্ ফ্লেক্সিবিলিটি'।

www.pathagar.com

"এখন আমাদের একটি যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে, তাদের শত সহস্র শেয়ার মালিক রয়েছে সেখানে কোটি কোটি টাকার উৎপাদন যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে আর তাদের খরিদ্দার রয়েছে লক্ষ লক্ষ, কিন্তু এই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি মাত্র ব্যবস্থাপক দলের দ্বারা। এগুলো বিশাল 'বহু প্রতিষ্ঠানের কালেকটিভ' (collectives of enterprise) আর এসব নিয়ে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেটাকে কালেকটিভ ধনতন্ত্র (collective capitalism) বললেও অত্যুক্তি হয় না।"

বের্‌লীর সাথে মিন্‌সের মত-পার্থক্য হয়। মিন্‌সের যুক্তি ছিল যে যৌথ সম্প্রদায়গুলো গোটা অর্থনীতির উপর প্রভুত্ব করছে আর এদের কাছে গণস্বার্থটা প্রধানতমনয়।

মার্কিন অর্থনীতিতে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব এবং বহু ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া প্রকৃতির ব্যবসা সম্পর্কে যদি বা কারো মনে কোন সন্দেহ থেকেও থাকতো, তবে তা ঘুচিয়ে দেয় ১৯৪০ দশকের গোড়ার দিকে 'অস্থায়ী জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটি'র প্রকাশিত রিপোর্ট। কংগ্রেসের এই যুগ্ম কমিটির অনুসন্ধানের বিষয় ছিল, ১৯৩০ দশকের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কি না। এই কমিটির শত শত খণ্ড সাক্ষী-প্রমাণ এবং তেতাল্লিশ জন বিশেষজ্ঞের লেখা পৃথক পৃথক নিবন্ধে এটা সুপ্রমাণিত হয় যে বড় বড় কর্পোরেশনগুলো বিপুল প্রভাবশালী, বিশেষ করে অর্থ, পরিবহণ, ভারি শিল্প, এবং স্থায়ী ভোক্তা পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

অন্যান্য সরকারী অনুশীলনেও বড় বড় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আবরণীর দ্বারা পরিচালকরা পরস্পরের সাথে গ্রন্থীভুক্ত, অর্থ সরবরাহে বন্ধনভুক্ত, মোটা শেয়ারের মালিক, যেমন রকফেলার গোষ্ঠী, এবং মেলন্ গোষ্ঠী এমন আরো পরিবারদের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। যদিও একেবারে উপরের স্তরেও অর্থনৈতিক সুবিধা, শক্তির আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অবিরাম চলছে, তবুও কয়েক শত প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বপুর্ণ এক ধরনের যৌথ ধনতন্ত্র (corporate capitalism) যে বিকাশলাভ করেছে, এর ফলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নতুন অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই ক্ষমতার পরিণতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য আজও একটা সক্রিয় কর্মনীতির জন্য বিবেচ্য প্রসঙ্গ হয়ে পড়েছে। উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলোর সহজ গঠনটা নিজেই আজ লেজে ফেরেকে (laissez faire) অচল করে দিচ্ছে। সরকার যদি আজ অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে নাও চায়, তবুও 'বৃহৎ ব্যবসা' ও কাজটা নিজেই করবে।

www.pathagar.com

বের্‌লী, মিন্‌স এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটি যেমন 'বৃহৎ–ব্যবসা'র ক্ষমতা আর তাদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে দূর্ভাবনা করেছেন, তেমনই আবার সুমনার এইচ. স্লিশ্‌টার ভেবেছেন শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে। মার্কিন অর্থনীতির এই বিচক্ষণ সমালোচকটির বক্তব্য ছিল যে "আগামীতে একটা ধনতান্ত্রিক সমাজের বদলে আসছে এক শ্রম-তান্ত্রিক সমাজ"। "কর্মচারীরা যখন নিজেদেরকে শ্রমিক ইউনিয়ন হিসেবে সংগঠিত করছে, তখন ক্ষমতাটা ব্যবসায়ীর হাত থেকে শ্রমের হাতে চলে যাচ্ছে– ব্যবস্থাপকদের সাথে যৌথ দরকষাকষিতে শ্রমিক–ইউনিয়নগুলো আজকের দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সংগঠন।" স্লিশ্‌টার তাঁর রচিত 'ইউনিয়ন পলিসিজ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ম্যানেজমেন্ট' (১৯৪১) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ইউনিয়ন আর মালিক পক্ষের দরকষাকষি আজ এমন এক শিল্প আইন শাস্ত্রের সৃষ্টি করেছে যা আগে ঐ দুই দলের পারস্পরিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক লাভের ব্যাপারে তাদের সম্পর্ক স্থির করবার যে, 'খোলা বাজার' ছিল, তারই স্থান দখল করেছে। 'ট্রেড ইউনিয়নস্‌ ইন এ ফ্রি সোসাইটি' (১৯৪৭) নামক গ্রন্থে তিনি ইউনিয়নগুলোর সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই যুক্তিপুর্ণ গ্রন্থটি এমন এক সময়ে আসে, যখন দেশের জনসাধারণ এবং কংগ্রেসও এই সমস্যা নিয়ে খুব চিন্তা করছিল। সেই বৎসরেই টাফ্‌–হার্টলী আইন পাশ করা হয় – কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কটা ইউনিয়ন সম্পর্কে দুই চরম মতের দিকেই মেরু কেন্দ্রীভূত হলো যাতে স্লিশ্‌টারের সংযত বিবেচনাপূর্ণ অনুশীলনের অভাব ছিল। তিনি এই যুক্তি দেন যে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন ব্যবস্থাপক সম্পর্কে সহযোগিতা সামাজিক মঙ্গলের জন্য একটি প্রবল শক্তি হতে পারে, অপর দিকে, দুই পক্ষের কারো স্বার্থপর এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী অর্থনীতির এবং সম্পূর্ণ সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। সমস্যাগুলো ছিল কি করে সংঘাত সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়, স্বাধীনতা আর সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার হ্রাস করা যায় এবং কিভাবে ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণের মধ্যে একটা যুক্তিযুক্ত ভারসাম্য অর্জন করা যায়। স্লিশ্‌টার কোন সমাধান দেননি, কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে এসব সমস্যার সমাধান আপনা–আপনি হয়ে যাবে না। আবার একজন অর্থনীতিবিদ বললেন যে শতাব্দীর মধ্যকালীন বিকাশমান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমাজের প্রধান লক্ষ্যগুলোর একটা যোগসূত্র স্থাপনের জন্য বিজ্ঞ সামাজিক কর্মনীতির প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বৃহৎ-ব্যবসা (big business) আর বৃহৎ শ্রমিকের (big labour) অভ্যুদয়ের সাথে সাথেই গড়ে উঠে বৃহৎ-সরকার (big government)। এ হলো মার্কিন অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রচারিত একটি পরিবর্তন, আর এই পরিণতির বেশীর ভাগটাই এসেছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এই মতিগতির সম্পর্কে তাদের আপত্তি প্রকাশের অংশ হিসেবে ঐ আপত্তি দাতারা সময় সময় বলেছে যে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়া একটা বেমানান পরিণতি, যেটা এক অনিচ্ছুক সমাজের উপর রাজনৈতিক দুঃসাহসী আর বক্তৃতাবাজের দল গোপনে চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু অর্থনীতিবিদরা ব্যাপারটা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করলো।

উদাহরণস্বরূপ, সলোমন ফ্যাব্রিক্যান্ট 'দি ট্রেন্ড অব গভর্নমেন্ট অ্যাক্টিভিটি ইন দি ইউনাইটেড স্টেট্স্ সিন্স ১৯০০' (১৯৫২) নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে এই যুক্তি রাখেন যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই হলো সরকারের ভূমিকা সম্প্রসারণের প্রধান কারণ। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি এবং তার কাঠামোগত পরিবর্তন, সীমানা উঠে যাওয়া, বিজ্ঞান আর প্রকৌশলের অগ্রগতি, নগরায়ন আর শিল্পায়ন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকারের ক্রম বৃদ্ধি, এবং অর্থনীতিতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্রম বৃদ্ধি-এই সব পরিবর্তন এমন অনেক নতুন সমস্যার জন্ম দিল, অবাধ-বাজার ব্যবস্থার পক্ষে যার সমাধান করা সহজ ছিল না এবং এর জন্য কেন্দ্রীয়, রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয়, এই সকল পর্যায়েই সরকারের জন্য নতুন কর্তব্যের সৃষ্টি হলো। ঘন ঘন মন্দা, যুদ্ধ আর যুদ্ধের সম্ভাবনার বৃদ্ধি অবশ্য এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। উপসংহারে ফ্যাব্রিক্যান্ট বললেন যে আজ মত-পরিবেশ বদলে গিয়েছে, নতুন ধরনের প্রয়োজন মেটাতে সরকার যে সমর্থ হবে, এ বিষয়ে বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে, যেটার কারণ আংশিকভাবে সরকারের নিজের সংগঠন এবং দক্ষতার বৃদ্ধি। তিনি উল্লেখ করেন যে শতাব্দীর মধ্যকালে সরকার হয়ে গিয়েছে জাতির সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কার, সবচেয়ে বড় বীমা কোম্পানী, শ্রম-শক্তির এক-অষ্টমাংশের নিয়োগকারী; সরকার আজ মজুরী এবং বেতনের মাত্রা নির্ধারণের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী শক্তি, এবং এককভাবে দ্রব্যসমূহের সর্ব বৃহৎ ক্রেতা। তিনি আশা করেন যে অর্থনীতি যত বড় হবে এবং আয় যত বাড়বে, ততই অর্থনৈতিক কার্যকলাপে এই সরকারী অংশটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

তা পেয়েছেও। পনেরো বৎসর পরে, এলি গিঞ্জবার্গ এবং তাঁর গবেষণা সহকারীরা 'দি পুরালিস্টিক ইকনমি' (১৯৬৫) নামক গ্রন্থে দেখালেন যে আগের দিনে বহু অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিষয়বস্তু এবং যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল পুঁজিবাদের

www.pathagar.com

কেন্দ্রবিন্দু, অর্থাৎ ব্যক্তি-মালিকানার মুনাফা সন্ধানী কারবার, এখন বাস্তব ক্ষেত্রে আরো দুই ভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগঠনের সাথে তা একত্রে বিরাজ করছে। প্রথমটা হলো 'সীমিত-মুনাফা' প্রতিষ্ঠান (limited profit enterprise) যেমন জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এবং সরকারী ভর্তুকী প্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন প্রতিরক্ষা বিষয়ক শিল্পসমূহ। দ্বিতীয়টি হলো 'মুনাফার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট নয়' (not for profit) এমন একটি খাত, যার অন্তর্গত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলো (যারা ধর্মীয় পুস্তকাবলী প্রকাশ করে)। দ্বিতীয় শ্রেণীটির সম্পর্কে গিল্ডবার্গ দেখিয়েছিলেন যে ঐ 'মুনাফার-উদ্দেশ্যে-সৃষ্ট নয়' খাত থেকেই আসছে জাতির মোট আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং কর্মসংস্থানের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ। এগুলো হলো অভিনবত্বের প্রবর্তন আর কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন শ্রম-শক্তির প্রধান সরবরাহকারী। সাম্প্রতিক বৎসরগুলোতে অর্থনীতির এই খাতটি সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর মধ্যে প্রত্যেক দশটি নতুন সৃষ্ট চাকুরীর নয়টিই হয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'মুনাফার-উদ্দেশ্যে-সৃষ্ট-নয়' খাতের সম্প্রসারণের দ্বারা।

এই বৃহৎ ব্যবসা, বৃহৎ সরকার আর বৃহৎ শ্রমিকের অভ্যুদয় থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বাজার শক্তিসমূহের নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) কর্মপদ্ধতির স্থানটা এখন আংশিকভাবে হলেও দখল করা হয়েছে শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ দলগুলোর, ব্যবস্থাপকদের এবং সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করার ক্ষমতার দ্বারা। আজকের দিনে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান আর তাদের সঞ্চারপথ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহকে যতটা প্রভাবিত করছে, এমন আগে কখনো সম্ভব হয় নি।

নিও-ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরবর্তী পঁচিশ বৎসর অর্থনৈতিক চিন্তার আসরে কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই পরিবর্তনশীলতা কোন প্রাধান্য পায় নি। তার বদলে বরং মনোযোগটা কেন্দ্রীভূত হয় উপস্থিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে।

সকল শিল্পোন্নত জাতিই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যাতে উচ্চ পর্যায়ে রাখা যায়, তেমন কর্মনীতি গ্রহণ করে। সকল উন্নত দেশেই নীতি প্রস্তুতকারীরা

www.pathagar.com

কেইন্‌সের দৃষ্টিভঙ্গিটা গ্রহণ করে নিয়েছিল, যার অর্থ ছিল এই যে কর্মনিয়োগ উচ্চ পর্যায়ে রাখার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গ্রহণযোগ্য হার বজায় রাখার দায়িত্বটা সরকার নিজের উপর নিয়ে নিল। যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৬ সনের 'কর্ম-নিয়োগ আইন'পাশ করাটা এই নতুন মনোভাবের দৃষ্টান্ত ঃ

"কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে ফেডারেল সরকার এই অবিচল নীতি এবং সম্ভাব্য সকল বাস্তব উপায় কাজে লাগাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলো.... যাতে করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় এবং তা বজায় রাখা যায়, তাতে উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ দেয়া হবে .... যেন যারা কাজ করতে সক্ষম, ইচ্ছুক এবং কাজ সন্ধান করছে এমন সকলেই সর্বাধিক কর্মনিয়োগ, উৎপাদন আর ক্রয়-ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে।

এই সব নীতি বাস্তবায়নের জন্য কয়েক ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হলো। যখন অর্থনীতি খারাপ সময়ে পড়ে তখন তেজী ভাব আনার জন্য আর যখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তখন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মন্দীভূত করার জন্য আর্থিক-নীতি (monetary policy) ব্যবহার করা হলো। কর সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তন করা হলো, যাতে প্রয়োজনে বিনিয়োগ আর ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎসাহ দেয়া যায়। যখন মন্দা আসার উপক্রম হয়, তখন বেসরকারী খাতের সঙ্কোচন পুষিয়ে নেবার জন্য সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা হলো এবং ব্যক্তিগত খাতে ব্যয় আর বিনিয়োগ যাতে উৎসাহিত হয় সে জন্য কর হ্রাস করা হলো। এক্ষেত্রে লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মনিয়োগ পর্যায়ে ভারসাম্য অর্জন করা, নিছক সরকারের আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা নয়, আর অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে বাজেটকেই ব্যবহার করা হলো। আদর্শ অবস্থা হিসেবে কল্পনা করা হলো অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকা, স্থির মূল্যমান এবং বাজেটের এমন এক ভারসাম্য অবস্থা, যাতে মুদ্রাস্ফীতি আর পূর্ণ-কর্মনিয়োগ থেকে বিচ্যুতি, এগুলোর কোনটাই দেখা না দেয়।

কেইন্‌সীয় অর্থনীতির শিক্ষা ছিল এটাই যে সমৃদ্ধি অবিরামভাবে বজায় রাখা যাবে, যদি সরকার সঠিক শুল্কনীতি আর আর্থিক নীতি অনুসরণ করে। বেসরকারী খাতে যদি অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, সেখানে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ঋণব্যবস্থা সহজ করতে হবে অথবা সরাসরি সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎসাহ বাড়াতে হবে। আসল ব্যাপার হচ্ছে মোট চাহিদার পরিমাণ আর ভোক্তাদের ব্যয়, এবং ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ যদি সেটাকে পূর্ণ-কর্মনিয়োগ

www.pathagar.com

পর্যায়ে রাখতে না পারে, তা হলে প্রয়োজনীয় সম্পূরক আসবে সরকারী খরচ বৃদ্ধির দ্বারা। অর্থনীতিতে যদি সমৃদ্ধি বজায় থাকে, তবে সিদ্ধান্তসমূহ বেসরকারী খাতের উপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। সরকারী খাত যদি পূর্ণ-কর্মনিয়োগ অবস্থা বজায় রাখতে কার্যকর থাকে, ব্যক্তিগত সঞ্চয় আর বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে প্রবৃদ্ধির ধরন গড়ে উঠে, সেটাকে যদি যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে হয়, তবে কি কি উৎপন্ন করা হবে, এই ধরনের জটিল সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ গাড়ী বানাবো, না বাড়ী বানাবো; লাঙ্গল না মাখন, রেফ্রিজারেটার না বরফ সরানোর গাড়ী), আর সেগুলো কতটা পরিমাণে উৎপন্ন করা হবে সেটা খোলা বাজারের ইচ্ছা মাফিক সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া চলে। ভোক্তারা যেমনভাবে খুশী তাদের আয় খরচ করে উৎপাদকদের জন্য ইঙ্গিত যোগাবে কি উৎপাদন করা উচিত, আর মুনাফার ধান্দা ঐসব দিকেই সম্পদের বিনিয়োগ এবং ব্যবহার ঘটিয়ে দেবে। মনে হলো যেন কেইন্‌সের 'বৃহৎ অর্থনীতি' (macro-economics) আবার 'স্মিথের অদৃশ্য হাত'কেই পুনর্জীবিত করলো। কেইন্‌সের 'বৃহৎ-অর্থনীতির' সাথে নিও ক্লাসিক্যালদের 'ক্ষুদ্র-অর্থনীতি'র (micro-economics) এক মহাসংশ্লেষণ ঘটানো হলো।

অবশ্য, এই নিও ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণকে 'বৃহৎ-ব্যবসা'র বিকাশ সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রসঙ্গটা যে একটা বড় সমস্যা, কয়েকজন বড় অর্থনীতিবিদ তা অস্বীকার করলো। ট্রাস্ট বিরোধী আইনসমূহের এবং অত্যাবশ্যক জনসেবামূলক (public utility) প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, এবং বলা হয় যে ওগুলোর দ্বারা এমন কি 'আংশিক একচেটিয়া' (oligopolistic) বাজারেও কাজ চলার মত প্রতিযোগিতা আনা গিয়েছিল। ১৯৫০-এর দশকে বিশেষ করে বড় কর্পোরেশনের আবাসভূমি যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এই রকম ধারণার প্রসার দেখা দেয়। জন মরিস্ ক্লার্ক 'কম্পিটিশন অ্যাজ এ ডাইনামিক প্রসেস' (১৯৬১) গ্রন্থে যুক্তি দেখালেন যে শিল্পের কাঠামো কেমন, তার চেয়ে বরং শিল্পের কার্যক্ষমতা (performance) বিবেচনা করাটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণঃ অভিনবত্ব উদ্ভাবনে তার অবদান কেমন, শিল্পের প্রবৃদ্ধি বা শ্রমিক মালিক সম্পর্ক কেমন, এগুলোর তুলনায় শিল্পটা প্রতিযোগিতার তাত্ত্বিক বিচারে কোথায় আছে, সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ। মরিস অ্যাড্‌লেমান্ যুক্তি দেন যে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভূতী (concentration) বৃদ্ধি পায় নি (পরবর্তী তথ্যে দেখা যায় আসলে তা পেয়েছে) এবং তাঁর তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গার্ডনার

www.pathagar.com

এক্‌লি, যিনি পরে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হন, লিখেছিলেন যে 'নির্ধারিত মূল্য' (administered price) একটা বড় সমস্যা নয় এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদরাও তাঁর সাথে ঐক্যমত হয়। এমন কি জন কেনেথ গল্‌ব্রেথও দেখাতে চেষ্টা করেন কিভাবে 'বৃহৎ ব্যবসা' আর 'বৃহৎ-শ্রমিক' নিয়েও অর্থনীতি ঠিকভাবে কাজ করতে পারে। 'অ্যামেরিকান ক্যাপিটালিজ্‌ম' (১৯৫২) গ্রন্থে তিনি যুক্তি দেখান যে বেসরকারী খাতে প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি গড়ে উঠে। বৃহৎ-ব্যবসা জন্ম দেয় বৃহৎ-শ্রমিকের, আর বৃহদায়তন উৎপাদনকারী জন্ম দেয় বৃহদায়তন খুচরা বিক্রেতার আর বৃহদায়তন কাঁচামাল সরবরাহকারীর। একের শক্তি অপরে অকেজো করে দেয় এবং সরকার সমতা সৃষ্টিকারী চক্র হিসেবে কাজ করে, আর সদা-প্রস্তুত থাকে, যখনই কোন একটি ক্ষমতা-কেন্দ্র প্রবল হয়ে উঠে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য। স্বল্প সংখ্যক সমান শক্তিমান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর কষাকষি একটা স্বয়ংক্রিয় বাজার ব্যবস্থার সম্পূরক হিসেবে কাজ করে, ফলে একটা যুক্তিসঙ্গত উৎপাদন কাঠামো আত্মপ্রকাশ করে। এই সব মতামত যে যুক্তিটা জোরালো করে তোলে তা এই যে যদি সামগ্রিক চাহিদাটা উঁচু পর্যায়ে রাখা যায়, তাহলে বেসরকারী খাত ভালভাবেই কাজ করবে।

নিও ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ (neo-classical synthesis) যদিও আয় বন্টন এবং দরিদ্র্যের সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করে নি, তবুও এই সংশ্লেষণে বড় ধরনের পরিবর্তনের তেমন উপায় ছিল না। দারিদ্র্যের ঔষধ হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর পূর্ণ-কর্মনিয়োগ। সকলেই কাজ পাবে আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্যের অবস্থা ভাল করবে। তবুও অসমতা থাকবে, কিন্তু সেটা একটা গুরুতর ব্যাপার নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে সকলেই ধনী হয়ে যাবে, আর বিশেষ করে শিক্ষা এবং পেশামূলক প্রশিক্ষণের ন্যায় বিশেষ সাহায্য কর্মসূচী অতি হতভাগ্যদেরও উদ্ধার করবে। যদিও পরিবর্তন আর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ফলাফলটা উপেক্ষণীয় নয়, তবুও ঐভাবে সৃষ্ট সমস্যাবলী শিল্প, প্রবৃদ্ধি আর পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ ব্যবস্থার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। এগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটাই হলো চাবিকাঠি, যেহেতু প্রবৃদ্ধির ফলেই অধিক পরিমাণে জিনিসপত্র পাওয়া যায়, যা দিয়ে একটি শিল্পোন্নত সমাজের জীবনযাত্রা ভাল করা আর বিবিধ মুসকিল আসান করা সম্ভব।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে একটি বিশেষ সমস্যা বলা যায়, কিন্তু তাদের জন্য সাহায্য কর্মসূচীর দ্বারা সুবিধা করে দেয়া যায়। মার্শাল পরিকল্পনা যেমন

www.pathagar.com

ইউরোপকে আবার তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল, তেমন ধরনের কোন সাহায্য কর্মসূচীর দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশগুলোকেও কাজ শুরুর জন্য সহায়তা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে ওয়াল্ট ডব্লিউ. রোস্টোর 'স্টেজেস্ অব ইকনমিক গ্রোথঃ এ নন্ কমিউনিস্ট ম্যানিফোস্টো' (১৯৬০) বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এতে যে ছবিটা আঁকা হয়েছে, তাতে পশ্চিম ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে একটা প্রবৃদ্ধির রাস্তায় "যাত্রা শুরু থেকে সুস্থির প্রবৃদ্ধি" (take-off into sustanined growth) পর্যন্ত যেতে প্রায় কুড়ি বৎসর লাগার কথা। অর্থনৈতিক সাহায্য এই প্রক্রিয়াকে চালু করে দেবে, আর উন্নয়নশীল দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকবে।

নিও–ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ কোন নির্দিষ্ট দুই-একজন অর্থনীতিবিদের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কর্মনীতি উদ্ভাবনের সমস্যায় কেইন্সীয় 'বৃহৎ অর্থনীতি' (macro-economics) প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রায় সকলেরই অব্যক্ত ঐক্যমত হিসেবে এর বিকাশ ঘটে। তাত্ত্বিক ভিত্তির কাজ কিছুটা ছিল সুদের হার কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং অর্থনৈতিক কাজের মাত্রার উপর তার প্রভাব সম্পর্কে, কারণ উৎপাদনের প্রকৃত 'মাত্রা' এবং অর্থনীতির 'অর্থ–সম্পর্কিত' বিষয়গুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক থাকা সম্ভব, তারই সংযোগ–সূত্র পাওয়া যায় এই বিষয়গুলোতে। এইসব প্রসঙ্গের একটি সর্বস্বীকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সনে জন আর. হিকস্ নামক একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদের বিশ্লেষণেঃ "মিঃ কেইন্স অ্যান্ড দি ক্লাসিকস্ঃ এ সাজেস্টেড ইন্টারপ্রেটেশন" নামক রচনায় যার শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় যে এটা ছিল ঐ দুই পথের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা।

নিও–ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে অর্থনীতিবিদ, তিনি একজন মার্কিন, নাম পল স্যামুয়েলসন (জন্ম ১৯১৫)। প্রায় পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক "ইকনমিকস্" (প্রথম সংস্করণ ১৯৪৭) ছিল কলেজের ছাত্রদের সর্বাধিক ব্যবহৃত গ্রন্থ। এর প্রথম সংস্করণের প্রধান বিষয় ছিল কেইনসীয় বিশ্লেষণের পরিবেশন, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলোতে আলোচনা সম্প্রসারিত করা হয় এবং নিও ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির বাজার বিশ্লেষণের উপরও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। স্যামুয়েলসনের ডক্টর‍্যাল গবেষণার বিষয়ঃ "ফাউন্ডেশন্ অব ইকনমিক অ্যানালিসিস্" (রচনা–১৯৪১, প্রকাশ–১৯৪৭) ছিল প্রধানতঃ নিওক্লসিক্যাল আর কেইন্সীয় অর্থনীতিকে একটি গাণিতিক রূপান্তরকরণ, যাতে করে অর্থনীতির তত্ত্বকে গাণিতিক নকসার (mathematical

www.pathagar.com

models) ভিত্তিতে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার এক নতুন বিশ্লেষণ-পদ্ধতির আওতায় আনা যায়। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট্ অব টেকনোলজির অধ্যাপক হন এবং স্যামুয়েলসন আর তাঁর রচিত অনেকগুলো প্রবন্ধে অর্থনৈতিক তত্ত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন দিকে চিন্তার সংযোজন করে।

নিগূঢ় তত্ত্বের উপর জোর দেয়া হলেও হাল-আমলের অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রশ্নগুলোও বিবেচনা থেকে বাদ পড়েনি। স্যামুয়েলসন হচ্ছেন অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মনিয়োগ, স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি আনার জন্য বাস্তবধর্মী আর্থিক আর শুল্ক নীতির একজন জোর প্রবক্তা। তাঁর দৃষ্টিতে সরকারী ব্যয়, কর-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আর আর্থিক-নীতি এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নীতিগুলোর কোন্ বিশেষ মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে, সেটা নির্ভর করছে বাস্তব অবস্থার উপর এবং এই সব ব্যবস্থার ব্যবহার প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল হতে হবে। অবস্থা যদি অনিশ্চিত হয়, তবুও স্যামুয়েলসন মনে করেন যে অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কার্যকর কর্মনীতি গ্রহণটা বরং ইতস্ততঃ করার চেয়ে ভাল।

নিওক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ যতটা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বিষয়, ততটাই রাজনৈতিক অর্থনীতির ব্যাপারও ছিল। এতে যেমন কেইনসীয় ব্যবস্থার সঠিক 'বৃহৎ অর্থনীতির' পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন ছিল, তেমনি দারিদ্র্য-বিরোধী উদার চিন্তামূলক কর্মসূচী এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সাহায্যের প্রস্তাবনাও ছিল। সেই সাথে, এতে অর্থনীতির মূল-কাঠামোর ব্যাপারে বর্তমান অবস্থাটা বজায় রাখার প্রতিও সমর্থন দেয়া হয় ঃ আয়ের বন্টন কিম্বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঞ্চার পথটায় তেমন একটা বড় পরিবর্তন আনবার প্রয়োজন নেই। 'বৃহৎ-অর্থনৈতিক' কর্মপন্থা যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ কর্মসংস্থান আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করতে সক্ষম, সে পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রাপ্ত বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির লাভ প্রত্যেকেরই প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাড়তি সম্পদ এনে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা-যুদ্ধের সময়ে নিও-ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণই অর্থনৈতিক-কর্ম-নীতির প্রসঙ্গে প্রাধান্য লাভ করে। এক হিসাবে এটা ছিল 'সাম্যবাদের বিস্তার নিরোধক' ট্রুম্যান তত্ত্বের (Truman Doctrine) নীতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকগুলোতে ঐ নীতি কেবল সহ-অবস্থান বা দাঁতাতের (detente) কথাই ভাবেনি; এতে আরো মনে করা হয়েছিল যে সাম্যবাদী শিবিরের নিজস্ব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপা উত্তেজনার ফলেই তাদের ঐ ব্যবস্থাটা একদিন ভেঙ্গে পড়বে।

www.pathagar.com

যদি সাম্যবাদকে ততদিন পর্যন্ত তার নিজস্ব পরিসীমার মধ্যে ধরে রাখা যায়, তবে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের প্রতি হুমকিটা আপনা-আপনিই খতম হবে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলোর সমৃদ্ধিও ঘটতে থাকবে। পূর্ণ-কর্মনিয়োগ আর জীবন ধারণের মানের ক্রমবৃদ্ধি মানুষের মনে সন্তোষ এনে দেবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশের অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্যের সমাধান করবে; উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাহায্য দেয়া যাবে এবং বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি থেকে বিপুল একটা প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব হবে। রাজনৈতিক অর্থনীতির এই নয়া ব্যবস্থা এই ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের বিশ্ব-ক্ষমতার আন্তর্জাতিক সংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের এবং তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোর অবস্থানকে বৈধতা (validated) দিল, যেমন দেখেছি ইতিপূর্বে বৈধতা দিয়েছে দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা-কাঠামোকে আর বর্তমান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে। নিও-ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ যে নীতি-মিশ্রের (policy mix) সংজ্ঞা দিল, তার ফলে ধনতন্ত্র টিকেতো থাকবেই, বরং জয়ীও হবে।

রক্ষণশীলদের ভিন্ন মত

রক্ষণশীল নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের একটি দল পূর্বোক্ত নিওক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণের হস্তক্ষেপপ্রবণ আর্থিক এবং শুল্ক নীতির কড়া সমালোচনা করে প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতির গুণাবলী পূর্ণ সমর্থন করলো। এই পূর্ণ সমর্থনের দুটি অংশ ছিল, একটি প্রাচীন এবং একটি নতুন।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অংশটি ছিল মেন্‌গার এবং তাঁর অনুগামীদের অস্ট্রিয় নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতি, যেটা পুনরুক্ত হলো সেই ঐতিহ্যে শিক্ষিত একদল ইউরোপীয় পণ্ডিতের দ্বারা। একজন ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রেডরিখ ভন্ হায়েক্ (জন্ম ১৮৯৯), সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রতি যাঁর আক্রমণের কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর একজন ছিলেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের লুডইগ্ ফন মিজেজ্ (১৮৮১-১৯৭৩) যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণের একমাত্র অমোঘ ঔষধ হিসেবে এবং ব্যক্তিতাবাদকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হিসেবে অবাধ বাজার-ব্যবস্থার (free market) প্রতি জোর সমর্থন দেন। তাঁর ইউরোপীয় প্রতিরূপ হলেন সুইজারল্যান্ডের জেনিভায় অবস্থিত ইন্‌স্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের উইল্‌হেল্‌ম রোপ্‌কে (জন্ম ১৮৯৯)। এঁরা সকলেই আধুনিক সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়, আধুনিক সংস্কারবাদীদের কেইন্‌সীয় হস্তক্ষেপবাদ, তথা সমসাময়িক সরকারগুলোর

www.pathagar.com

অনুসৃত কল্যাণমূলক বিধি-ব্যবস্থা, এর প্রত্যেকটিরই সমান নিন্দাবাদ করেছেন। এঁদের বর্ণনা করতে সবচেয়ে উপযুক্ত কথাটা হলো 'স্বাধীনতা-মতবাদী' (libertarian) অর্থাৎ এঁদের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতাটাই সবচেয়ে বেশী কাম্য। তাঁরা যে কোন রকমের সরকারী হস্তক্ষেপকেই ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন।

রক্ষণশীলদের এই ভিন্নমতের নবতর অংশটি ১৯৬০-এর দশকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই মতের আবাসস্থল বলা চলে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে, আর এর প্রধান প্রবক্তা হলেন মিল্টন ফ্রিডম্যান (জন্ম ১৯১২)। ফ্রিডমান হলেন প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতির একজন জোর প্রবক্তা, কিন্তু স্বাধীনতা মতবাদীদের মতের বৈপরীত্যে তিনি জোর দিয়েছেন সরকার কর্তৃক একটি কাঠামো সৃষ্টির উপর, যাতে করে মুক্ত-বাজার ব্যবস্থাটা আরো ভালভাবে কাজ করতে পারে। তাঁর এই অবস্থানটা এসেছে হেনরী সি. সাইমনস্‌কে (১৮৯৯-১৯৪৬) অনুসরণ করে, যিনি ফ্রিড্‌ম্যানকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীতে পড়িয়েছেন। সাইমন্‌স বিশেষ একটা লেখেন নি- তাঁর সারা জীবনের কাজ হলো কয়েকটি রচনা এবং নিবন্ধ, যার সবগুলো মিলে একটাই গ্রন্থ হয়েছে- কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী। 'এ পজিটিভ প্রোগ্রাম ফর লেজে ফেরে' (১৯৩৪) নামে একটি রচনাতেই প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং এর সজীবতা বজায় রাখার জন্য সংস্কারের একটি কর্মসূচী দেয়া হয়েছেঃ

"…. বাজার-শক্তির উপর যত রকম একচেটিয়া ব্যবস্থা হতে পারে, তার সবগুলোর উচ্ছেদ করতে হবে, এর মধ্যে বড় বড় আধা একচেটিয়া কর্পোরেশনগুলো ভেঙ্গে দেয়া এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইনের আওতায় আনাও আছে। কর্পোরেশনের আকার সীমাবদ্ধ করে দেয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পর্যায়ের 'ইনকর্পোরেশন-আইন' ব্যবহার করা যায় এবং যে ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য প্রকৌশলিক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের আকারটা সুবিশাল হতেই হবে, সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাতেই ঐ রকম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা উচিত।… অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার জন্য আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কার এবং আর্থিক কর্মনীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল নিয়ম-কানূনের প্রতিষ্ঠা করা উচিত।… কর ব্যবস্থার সংস্কার এবং আয় করের মাধ্যমে সমদর্শিতা প্রতিষ্ঠা করা উচিত।… বিজ্ঞাপন দেয়া বা ঐ জাতীয় অপব্যয়মূলক

www.pathagar.com

ব্যবসায়িক আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে করে অপচয় হ্রাস করা যায়।"

সাইমন্‌সের কর্মসূচী একদিকে যেমন কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আর বাজারের উপর চাপানো বিধি-নিষেধের বিপক্ষে ছিল, অন্যদিকে তেমনই তা ছিল প্রতিযোগিতা আর ব্যক্তিতাবাদের স্বপক্ষে। এতে অস্থিতিশীলতা, অসমদর্শিতা এবং অপব্যয়মূলক খরচকে উপেক্ষা করা হয়নি, বরং এমন সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা ওগুলো একদম বন্ধ না হলেও অন্ততঃ হ্রাস পাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীল নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির রূপদান প্রসঙ্গের আর একজন গুরুত্বপুর্ণ সাহায্যকারী ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইমন্‌সেরই সহকর্মী ফ্র্যাঙ্ক এইচ. নাইট্ (১৮৮৫-১৯৭২)- এঁরা দুইজন একই বৎসরে ১৯২৭ সনে ফ্যাকাল্টীতে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সাইমনস্ ছিলেন বাস্তব কর্মনীতির প্রবক্তা আর নাইট ছিলেন তাঁর তাত্ত্বিক প্রতিরূপ। অধিক সমতাপূর্ণ আয় বন্টন এবং আরো বেশী পরিমাণে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রবক্তাদের দ্বারা নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতি আক্রান্ত হয় ১৯২০-এর দশকে। নাইটের পুরো কর্মজীবনটাই ব্যয় হয় মূলতঃ অধিক সাবধানতার সাথে উক্তিগুলোর সংজ্ঞাদান এবং সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ আক্রমণের প্রত্যুত্তর দানের কাজে। ফলে মুক্ত-বাজার অর্থনীতির তত্ত্বটির অধিক শক্তিমান একটি বর্ণনা পাওয়া গেল, যার ভিত্তি স্বরূপ ছিল অর্থনৈতিক ব্যক্তি (economic individual)। নাইট স্বীকার করেন যে সবকিছুই এই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার সাথে বাস্তব অবস্থার পার্থক্যও ছিল, কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল এই যে এটা কাজে লেগেছিল। 'শিকাগো গোষ্ঠী'র নিয়মতন্ত্রগত অবস্থানের (methodological position) এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল পরবর্তী সময়ে ফ্রিডম্যান কর্তৃক বিকশিত চিন্তাধারার ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ।

আজকের দিনে মিল্টন ফ্রিডম্যানই হলেন প্রাচীন উদারপন্থী দর্শনের (classical liberal philosophy) সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি, যে দর্শনকে অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত করা যায়। তাঁর বক্তব্য এই যে 'লেজে ফেরে' (laissez faire) নীতি থেকে যে উপকার পাওয়া যায়, সেটা দুই একটা উপস্থিত সমস্যার সমাধানের জন্য গৃহীত খোলা-বাজার তৎপরতাকে পরিবর্তিত করার হস্তক্ষেপমূলক নীতি অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। উদাহরণ স্বরূপ ন্যূনতম মজুরী আইনের কথাটাই ধরা যাক। যদিও এটার উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প

www.pathagar.com

মজুরীতে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি করে দেয়া, ফ্রিড্‌ম্যানের মতে এটার ফল হয়েছে উল্টো। নিয়োগকর্তাদের পক্ষে শ্রমিক নিয়োগ অধিক ব্যয়বহুল করে দিয়ে এই আইনগুলো বেকারত্ব বাড়িয়ে তুলেছে, আর অর্থনৈতিক পিরামিডের নিচের তলায় অবস্থানকারী সকলের জন্যই অর্থনৈতিক দুরবস্থা বৃদ্ধি করেছে। এই ধরনের আরো বহু উদাহরণ দেয়া ফ্রিড্‌ম্যানের বহুল পঠিত 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ফ্রিডম' (১৯৬২) গ্রন্থে, যেখানে দেয়া মৌলিক যুক্তিটা এই যেঃ মুক্ত-বাজার ব্যবস্থাকে বাধা দেয়া হয় যে সব বিধি-নিষেধের দ্বারা, সেগুলো লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই ডেকে আনে, অপর পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে দীর্ঘমেয়াদে বরং অধিক কল্যাণই সংঘটিত হয়।

একালের অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো কেইনসীয় 'বৃহৎ-অর্থনীতি বিষয়ক পরিকল্পনা' (macro economic planning)। ফ্রিড্‌ম্যান সবচেয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন শুল্কনীতিকে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার কাজে ব্যবহার করার এবং সবচেয়ে কড়া সমর্থন দিয়েছেন আর্থিক নীতি ব্যবহার করাকে কিন্তু সেটা একটা বিশেষ ধরনের আর্থিক-নীতি, যার গোড়া রয়েছে সাইমনস্-এর নীতিমূলক প্রস্তাবাবলীতে।

ফ্রিড্‌ম্যানের যুক্তি এই যে, বেসরকারী খাতের উঠানামাকে সরকারী ব্যয় বা কর পরিবর্তনের দ্বারা সমভার করা (counter balance) অত্যন্ত কঠিন। ব্যবসায়িক চক্রের গতিধারার পূর্বাভাষ দেয়াটা কঠিনই নয়, বরং ফ্রিডম্যানের কথায়ঃ

"যখন হস্তক্ষেপটা দরকার আর যখন সরকার এটা টের পায়, তার মধ্যে অনেকটা সময় কেটে যায়, কাজ করার প্রয়োজন অনুভব করা আর বাস্তবে সেই কাজটা করার মধ্যেও একটা বিলম্ব হয়; আর কাজ করা এবং সেই কাজের ফল অনুভূত হওয়ার মধ্যেও বেশ কিছুটা কালক্ষেপ (lag) হয়।"

এসবের ফলে "নিরসনমূলক কার্যক্রম নিজেই কিছুটা ভ্রান্তির শিকার হতে পারে," অর্থাৎ যখন খরচ করার স্পৃহাটা বৃদ্ধি পায়, তখন হয়ত আসলে তা নিরুৎসাহিত করাই উচিত ছিল- তেমনি এর বিপরীতটাও হতে পারে।

ফ্রিডম্যান বিশ্বাস করেন যে শুল্ক নীতির (fiscal policy) তুলনায় আর্থিক ব্যবস্থা অর্থনীতির উপর অধিক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি টাকার-পরিমাণ-তত্ত্বকে (Quantity Theory of Money) পুনরুদ্ধার করেন এবং তার জীবন দান করেন-টাকার

www.pathagar.com

পরিমাণ যে সাধারণ মূল্যমান নির্ধারণ করে–মুদ্রা ব্যবস্থা নানা সূক্ষ্ম কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মোট চাহিদার এবং জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণকে প্রভাবিত করে। কেইনস্‌বাদীরা কখনো আর্থিক নীতির (monetary policy) গুরুত্ব অস্বীকার করেনি, তারা শুধু চেয়েছে শুল্কনীতির সাথেই ওটাকেও কেঁচির অপর একটি বাহুর মত 'বৃহৎ–অর্থনীতির' নীতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে। কিন্তু এই বিষয়েও ফ্রিড্‌মান কেইন্‌সীয়দের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। তিনি আর্থিক নীতির সক্রিয় ব্যবহার পছন্দ করেন না। তিনি পূর্ণ–কর্মনিয়োগের জন্য অর্থের প্রাচুর্যও (easy money) যেমন পছন্দ করেন না, তেমনি মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য অর্থের সঙ্কোচনও (tight money) পছন্দ করেন না। তাঁর যুক্তি অনুসারে, ও দুটোরই দীর্ঘমেয়াদী ফল হয় ওগুলোর স্বল্পমেয়াদী কাম্য ফলাফলের ঠিক উল্টো। তিনি চান অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনে গৃহীত একটি নিরপেক্ষ আর্থিক নীতি। তাঁর বিধান অনুসারে অর্থ সরবরাহের পরিমাণটা অর্থনীতির প্রসার এবং প্রবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক, এমন একটি নির্ধারিত বাৎসরিক হারে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

কিন্তু ব্যবসায়ের চক্র আর মন্দা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কি ? ফ্রিডম্যানের নীতিটা যদি অনুসরণ করাই হয়, তাহলে অর্থনীতি আর একটি বড় ধরনের মন্দার জন্য উন্মুক্তই থেকে যাচ্ছে না কি ? তাঁর উত্তর এই যে, তা থাকছে না, এবং তাঁর কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি এবং আনা সয়ার্তজ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেন যে আর্থিক ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতাই কর্ম–নিয়োগ এবং উৎপাদন বিষয়ে অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ। এই সিদ্ধান্তগুলো 'এ মনিটারী হিস্ট্রি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস্' (১৯৬৩) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের একটি বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত আলোচনায় দেখানো হয়েছে, কেমন করে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থার আর্থিক–নীতি ১৯৩০ –এর দশকের মহা–মন্দা আসতে সাহায্য করে এবং কিভাবে তা আসার পর তাদের নীতির দোষেই সেটা আরো দুঃসহ হয়ে উঠে। ইঙ্গিতটা পরিষ্কারঃ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করে তোল, অর্থনীতির স্থিতিশীলতাও তাকে অনুসরণ করবে।

ফ্রিড্‌ম্যান আর তাঁর সমর্থকরা, যাদেরকে 'মনিটারিস্ট' বলা হয় (কারণ এঁরা আর্থিক উপাদানগুলোর উপরই জোর দিয়েছেন) তাঁদের মত এই যে 'বাজারের শিথিলতা' (recession) প্রতিরোধ করার জন্য যে সরকারী ব্যয় বাড়ানো হয়, মুদ্রাস্ফীতির সেটাই একটা স্পষ্ট কারণ। বাজারের শিথিলতার

www.pathagar.com

সময় ঘাটতি বাজেটের কারণে যে সরকারী ঋণ-পত্র বিক্রি করা হয়, সেটা অর্থনীতিতে স্বাভাবিকভাবে যে সরকারী এবং বেসরকারী ঋণ জমা হয়, তার উপরেও একটা বাড়তি বোঝা স্বরূপ। সুতরাং অর্থনীতি যখন আবার পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ ব্যবস্থায় ফিরে যায়, তাদের মতে, তখন টাকার সরবরাহটাও বাড়াতে হয়, যাতে করে ঐ বাড়তি দেনার সংস্থান করা যায়। অধিকতর টাকার সরবরাহের ফলে পূর্ণ-কর্মনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই যখন অর্থনীতি পূর্ণ-কর্ম নিয়োগের দিকে এগিয়ে যায়, তখন বাজার শিথিলতার দ্বারা সৃষ্ট ঘাটতিকে অর্থ-বিষয়ক কর্তৃপক্ষের কাজের দ্বারা 'টাকায় রূপান্তরিত' (monetized) করা হলো, এবং মূল্যমানও বেড়ে গেল। শিথিলতা এড়ানো সম্ভব হবে, কিন্তু এজন্য যে মূল্য দিতে হবে তা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি।

ফ্রিড্‌ম্যান এবং শিকাগো গোষ্ঠীর কেইন্‌সীয় নীতির প্রতি এই আক্রমণের ফলে সরকারী নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেইন্‌সীয় 'বৃহৎ-অর্থনীতির' যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, সেটা ভেঙ্গে পড়লো। এতে দেখানো হলো যে অর্থটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিমধ্যেই অর্থ-প্রবক্তাদের (monetarist) কাজের অনেকটাই একত্রিত করে অর্থনীতির বৃহত্তর তাত্ত্বিক অঙ্গে তা জুড়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কঠিন মত পার্থক্যের একটি অংশ থেকেই গিয়েছে। সক্রিয়তাবাদী উদারপন্থী দল যারা সমাজের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য কড়া সরকারী কার্যক্রমের দাবী করে এবং 'লেজে ফেরে' সমর্থক উদারপন্থী, যারা ঐ পথটাকে ভুল মনে করে, তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকে কেন্দ্র করেই এই মতভেদটা গড়ে উঠেছে। পরবর্তী উল্লিখিত দলটি চায় যে সরকার খোলা বাজার-ব্যবস্থা যাতে কার্যকর ভাবে চালু থাকে শুধু সে জন্য একটা কাঠামো সৃষ্টি এবং তা রক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। 'লেজে ফেরে' উদারপন্থীরা 'নয়া-প্রাচীনপন্থী' (neo-classical) নীতিতেই স্থির থাকতে চায় এবং তারা কেইন্‌সীয় 'বৃহৎ অর্থনীতি'কে স্বীকার করে না।

জন্ কেনেথ গলব্রেথ্ ঃ উদারপন্থী সমালোচক

সাম্প্রতিক অর্থনীতির, অর্থনৈতিক কর্মনীতির এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের সম্ভবত: সবচেয়ে পরিচিত সমালোচক হলেন জন কেনেথ গলব্রেথ্ (জন্ম ১৯০৮)। যুক্তরাষ্ট্রের উদারপন্থী শিবিরের তিনি একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কার্যকর সরকারী নীতির তিনি একজন জোর প্রবক্তা।

www.pathagar.com

তবুও গলব্রেথ্ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটা যে অর্থনৈতিক নীতির একটি পর্যাপ্ত লক্ষ্য (sufficient goal) বা বাজার ব্যবস্থা যে সম্পদ বরাদ্দকরণের একটি কার্যকর উপায়, এর কোনটাই স্বীকার করেন না। গলব্রেথের যুক্তি প্রধানতঃ তাঁর তিনটি গ্রন্থে পরিবেশিতঃ 'দি অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি' (১৯৫৮) 'দি নিউ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট' (১৯৬৭), এবং 'ইকনমিক্স অ্যান্ড দি পাবলিক পারপাস' (১৯৭৩)। একত্রে এই তিনটি গ্রন্থে, ভেব্লেনের পরবর্তী আধুনিক মার্কিন ধনতন্ত্রের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। প্রথমটিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বেশী উৎপাদন যে নিঃসন্দেহে একটি ভাল জিনিস, এই 'প্রচলিত বুদ্ধি'টাকে তিনি আক্রমণ করছেন, দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে দেখিয়ে দিয়েছেন সমাজের এমন এক চিত্র, যেখানে প্রধান প্রভাব হলো বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর আর এক কারিগরি কাঠামোর, যা এগুলোকে পরিচালিত করে, আর তৃতীয়টিতে যুক্তি দেয়া হয়েছেঃ গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজের মঙ্গলকে ব্যক্তিগত লাভের উপরে স্থান দেয়া উচিত। তিনটে একসাথে যা দিয়েছে, তা হলো আধুনিক সমাজ এবং তার মূল্যবোধের একটি সুন্দর সমালোচনা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে যা কাম্য হওয়া উচিত সে বিষয়ে বড় ধরনের পরিবর্তনের আহবান।

গলব্রেথের বক্তব্য এই যে আজ আধুনিক প্রকৌশল যে প্রাচুর্যের সমাজ সম্ভব করেছে, সেটা সব সময় মানব জাতির একটি স্বপ্ন সাধ ছিল। প্রাচুর্য কিন্তু সুখ আনতে পারে নি, কারণ লোকেরা এখনো অভাবের তত্ত্বেই বিশ্বাসী, আর তারা অবিরামভাবে বেশী এবং আরো বেশী সামগ্রীর উৎপাদন চেয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক শিল্প অর্থনীতি বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করে চলেছে, কিছুটা ইঙ্গিতে এবং একে অপরের সমকক্ষ হবার চেষ্টায়, এবং কিছুটা উৎপাদনকারীদের বিজ্ঞাপন আর বিক্রয় দক্ষতার জ্ঞান প্রচেষ্টার মাধ্যমে। উৎপাদনের উচ্চতর পর্যায় শুধু চাহিদা সৃষ্টির উচ্চতর পর্যায়কে ডেকে আনছেঃ যে প্রক্রিয়ায় চাহিদার পরিতৃপ্তি, তার উপরই দেখা যাচ্ছে চাহিদাটা নির্ভরশীল। এটাকে গলব্রেথ্ 'নির্ভরশীলতার প্রতিফল' (dependence effect) নাম দিয়েছেন এবং এভাবে তিনি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ক্রেতাকে (Rational Consumer) বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর কথা যদি সত্য হয়, তা তাহলে গোটা অর্থনীতিটাই হয়ে পড়ে বিচার শক্তিহীন ঃ উৎপাদনকারীরা যদি ক্রেতার সিদ্ধান্তকে নির্ধারিত করে দিতে পারে, অন্তত: পক্ষে তা পর্যাপ্তভাবে প্রভাবিতও করতে পারে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে শক্তির উত্তরে তাদের সাড়া দেবার কথা,

www.pathagar.com

সেই শক্তির তারাই এখন নির্ধারক হয়ে উঠেছে, আর স্বয়ং-সমন্বয়কারী বাজার-ব্যবস্থাটা হয়ে পড়ছে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর টিকে থাকার আর ধনী হবার একটা কৌশল মাত্র।

ঐ ধরনের অর্থনীতিতে বড় বড় কর্পোরেশনগুলো, যারা বাজারকে নিজের আয়ত্বে রাখতে পারে তারাই হলো দৃশ্যমান একক। আপাতঃ দৃষ্টিতে এগুলোর ব্যবস্থাপনার ভার সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত থাকলেও, আসলে সিদ্ধান্তগুলো আসে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি প্রকৌশলিক কাঠামো (techno-structure) থেকে, যারা একালের জটিল উৎপাদন প্রকৌশল এবং বিপণন ব্যবস্থাকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করতে সক্ষম। এই প্রশাসনিক কাঠামোর স্বার্থ হলো কারবারটার টিকে থাকা, প্রবৃদ্ধি এবং তার নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধি। ; কিন্তু মুনাফা সর্বাধিক করাটা এদের প্রধান ভাবনা নয় এবং মুনাফা সর্বাধিক না হলে উৎপাদনটা পরিষ্কারভাবে ক্রেতার চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানো (যা নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিতে ঘটবে বলেই ধরে নেয়া হয়) তেমনটি আর হবে না, এমন কি 'নির্ভরশীলতার প্রতিফল' যদি না থাকে, তা হলেও।

এখান থেকেই গলব্রেথের বিশ্লেষণটার সম্প্রসারণ হয়েছে। দৈত্যকায় কর্পোরেশনগুলো ঝুঁকি এড়াতে চায় আর তাদের দরকার প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীল বাজার। তা পাবার একমাত্র উপায় হলো কেইন্‌সীয় 'বৃহৎ-অর্থনীতি'র নীতিসমূহ। সরকার ঐ প্রকৌশলিক-কাঠামোর সহযোগী হয়ে পড়ে। শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়ে যায় আর এক সহযোগী, কারণ সেখান থেকে যেসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক বের হয় এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়, বিশাল কর্পোরেশনগুলোর সে দুটোই প্রয়োজন আর তার ব্যয় ভারটা বহন করছে মোটামুটি সরকারই। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে ছোট সহযোগী বলা যায়, দৈত্যকায় ঐ সব প্রতিষ্ঠানে তারা নিয়মিত শ্রমিক সরবরাহ করে থাকে, যার বদলে তারা পায় যৌথ-দরকষাকষির মাধ্যমে নিরাপত্তা।

প্রাচুর্যময় সমাজের (the affluent society) মূল্যবোধ এমনই যে তাতে ব্যক্তির প্রয়োজনটাই সমাদর পায়, আর জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তাই আমরা 'প্রাইভেট কারে' চড়ে ভারাক্রান্ত রাজপথের বিষাক্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে 'পাবলিক পার্ক' গুলোর দিকে ছুটি, আর সেখানে গিয়ে দেখি, প্রাচুর্যের সমাজের সকল ব্যক্তির জন্য সেখানে জায়গা নেই, বড্ড ভীড়।

গোটা ব্যবস্থাটাই একটা অযৌক্তিক লক্ষ্যের দিকে এগুচ্ছে। অবিরাম বিক্রয় প্রচেষ্টার প্রভাবে খরিদ্দাররা ক্রমাগত অধিক এবং নতুন সামগ্রী চাচ্ছে; অগ্রসরমান

www.pathagar.com

প্রকৌশল ক্রমাগত বেকারদের সংখ্যা ভারী করছে; সরকারী নীতি অবিরামভাবে অর্থনীতিকে অধিক মাত্রায় উৎপাদনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ; আর সামাজিক পর্যায়ের যেসব প্রয়োজন উৎপাদনে অগ্রাধিকার পাচ্ছে তা হলো সামরিক প্রয়োজন এবং বিশেষ ধরনের গবেষণা আর উন্নয়নের কর্মসূচী (বর্তমানে তা হলো শক্তির নতুন উৎস সন্ধান, ইতিপূর্বে তা ছিল মহাশূন্য বিষয়ক অনুসন্ধান)।

তা হলে অর্থনীতিকে আবার মনুষ্যত্বপূর্ণ লক্ষ্যের দিকে ফিরিয়ে আনা যায় কি করে? পূর্বোক্ত তিনটি বইয়ের তৃতীয়টিতে গলব্রেথ সেই উপায়টাকে 'নয়া-সমাজতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন; আয় এবং সম্পদের অধিকতর সমতা ছাড়াও যাতে থাকবে, সুবিশাল কর্পোরেশনগুলোকে মজুরী, মূল্য, মুনাফা এবং বেতন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার জন্য কার্যপন্থা, আর থাকবে যারা সামরিক সামগ্রী সরবরাহ করে তেমন প্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয়করণ, এবং আশ্চর্যের বিষয়, তিনি স্বাস্থ্য-পরিচর্যার মত অর্থনীতির অপেক্ষাকৃত কম কেন্দ্রীভূত খাতকেও জাতীয়করণ করতে বলেছেন, যাতে করে ঐসব বড় কর্পোরেশনে যে ধরনের পরিকল্পনা করা হয় সেই সুযোগটা কাজে লাগানো যায়। অতি দুর্বল এবং অতি শক্তিশালী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক মালিকানায় আনতে হবে এবং বাদবাকীদের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে, তাহলেই গণ-স্বার্থ ব্যক্তি স্বার্থের উপর জয়ী হবে, অবশ্য এই সব অর্জন করা সম্ভব হবে তখনই, যখন আধুনিক অর্থনীতির বাস্তব সত্যগুলো অনুধাবনের মাধ্যমে একটি নতুন মত-বিশ্বাস গড়ে উঠবে এবং তাতে পুরনো পরিত্যক্ত মতবাদের চর্বিত-চর্বণ থাকবে না। এই পথেই আসতে পারে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য এক নতুন গণ-আন্দোলন, যা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আনবে নয়া-সমাজতন্ত্র।

আমূল-সংস্কারমূলক অর্থনীতি (RADICAL ECONOMICS)

আধুনিক সামজের যেসব ত্রুটি গলব্রেথের সমালোচনার কারণ ছিল, সেগুলোই মার্কস্‌বাদেরও এক পুনরুত্থান ঘটায় এবং সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। ১৯৬০-এর দশকে শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে যে 'আমূল সংস্কারবাদ' পূনর্জন্ম লাভ করে, সেটা বিদ্যমান অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং নীতিকে যতটা আক্রমণ করে, তার চেয়ে অনেক বেশী সমালোচনা করে অর্থনৈতিক গোটা ব্যবস্থাকে এবং তার ফলাফলকে। মার্কস্‌বাদে নতুন করে আগ্রহ তো দেখা

www.pathagar.com

দিলই, তার সাথে আসলো আধুনিক জগত সম্পর্কে নানা ধরনের অমার্কস্‌বাদী মৌলিক সংস্কারমূলক বিশ্লেষণ।

একালের অর্থনীতি বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবে মার্কস্‌বাদের পুনরভ্যুত্থান বিষয়ে একটি গ্রন্থ যুক্তরাষ্ট্রে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে, তা হলো পল বারান এবং পল সুজি রচিত 'মনোপলি ক্যাপিটাল' (১৯৬৬)। বারানের মৃত্যু হয় এই গ্রন্থ প্রকাশের দুই বৎসর আগে, তখন তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। মার্কস্‌বাদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের একজন প্রধান পণ্ডিত হিসেবে তিনি ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন অপর একটি গ্রন্থ রচনা করে যার নাম— "দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব গ্রোথ্" (১৯৫৭)। এতে তিনি যে দিকে মন সংযোগ করেন তা হলো একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান, যেটা উন্নত ধনতন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের উদ্ভব, যেটার বিলি ব্যবস্থা দরকার, এবং এক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রসার, যার ফলে উন্নত আর অনুন্নত অর্থনীতিগুলোর মধ্যে এক আসন্ন সংঘাত। এই সবগুলো বিষয়বস্তুই পরবর্তী একটি গ্রন্থে আলোচনা করার কথা ছিল। বারানের সহযোগী লেখক পল সুজি প্রথমে অধ্যাপনা দিয়েই জীবন শুরু করেন, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ সন পর্যন্ত হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান এবং মার্কিন কর্পোরেশনসমূহের স্বার্থান্বেষী মহল এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের আধা–একচেটিয়া (oligopoly) বিষয়ক তত্ত্ব নিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ রচনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সরকারী চাকুরীর শেষে ১৯৪৯ সনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ স্থানীয় মার্কস্‌বাদী পত্রিকা 'মান্থলি রিভিউ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন আর তার পর থেকে তিনি ঐ পত্রিকার একজন সম্পাদক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী গ্রন্থও রচনা করেন, যার নাম 'দি থিওরী অব ক্যাপিট্যালিস্ট ডেভেলপমেন্ট' (১৯৪২), যেটা এখন পর্যন্তও সাম্প্রতিক পাঠকদের জন্য মূল মার্কস্‌বাদী তত্ত্বের এক শ্রেষ্ঠ পুন:প্রকাশ হয়ে আছে।

'মনোপলি ক্যাপিট্যাল' মার্কস্‌বাদী তত্ত্বের উপর একটি প্রধান অবদান, যাতে মার্কসের বিশ্লেষণ প্রতিযোগিতমূলক অর্থনীতির বিষয়ে মার্কস্ যে মৌলিক শর্ত (assumption) ধরে নিয়েছিলেন, তা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল আধুনিক অর্থনীতির সুবিশাল প্রতিষ্ঠানগুলোর একচেটিয়া বৈশিষ্ট্যের উপর। এই কাজ কাজ করতে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা এবং শ্রেণী সংগ্রামের উপরও আর আগের মত জোর দেয়া হয় নি, যেহেতু এই বিশ্লেষণের জোরটা ছিল প্রধানতঃ বেসরকারী মালিকানার বড় কর্পোরেশনগুলোর উপর। যুক্তিটা ছিল নিম্নোক্ত রূপঃ

www.pathagar.com

"একচেটিয়া বড় কর্পোরেশনগুলো তুলনামূলকভাবে চড়া বিক্রয়মূল্য বজায় রাখতে পারে, একে অপরের সাথে ব্যয় হ্রাস, বিজ্ঞাপন দেয়া আর বিক্রয়ের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে এবং নতুন বা পরিবর্তিত দ্রব্য চালু করে, যার সবই মুনাফা শিকারের এক বিপুল প্রতিযোগিতার অংশ। এ সবের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে উদ্বৃত্ত, যা ক্রেতার ব্যয় দ্বারা পরিপূর্ণ হচ্ছে না, তা সেটা যত অপচয়মূলকই হোক বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃতই হোক। এতে করে শুধু উদ্বৃত্তটা বাড়াতেই থাকে। এই উদ্বৃত্তের একটি অংশ বিপুল আকারের বিক্রয় এবং বিপণন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, আর একটি অংশ সরকারী কর্ম নিয়োগে ব্যয় হয়। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজির প্রধান বেগটা সাম্রাজ্যবাদ এবং সমরবাদের দিকেই চালিত হয়, কারণ ও দুটোই হলো ঐ বাড়তি উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগানোর সহজতম এবং নিশ্চিততম পথ। এই প্রক্রিয়ায় শোষণটা দেশের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় কম মজুরীর শ্রমিকদের উপর, বিশেষভাবে কাল মানুষ আর অন্যান্য সংখ্যালঘু দলের উপর, এবং বিদেশে অনুন্নত অঞ্চলগুলোর উপর, যেখানে মুনাফার সুযোগ পাওয়া যায়, দেশের অর্থনীতির চেয়েও বেশী। সাধারণ মানুষের জন্য এই মুনাফার সম্পর্ক আর বিনিময় সম্পর্কটা অর্থবহ মানবিক সম্পর্ককে ধ্বংস করে দেয়, ফলে আসে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা, প্রতিহিংসা আর নিরর্থকতা। এই গোটা ব্যবস্থাটাই মূলতঃ অযৌক্তিক, কারণ যদি বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরা পৃথকভাবে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তবুও গোটা ব্যবস্থাটা এক অযৌক্তিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হয়। এসব সত্ত্বেও সামরিক ব্যয় আর কেইনসীয় পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ নীতির বদৌলতে এই ব্যবস্থাটা বেশ ভালভাবেই কাজ করতে থাকে। আর তা করতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বল্পোন্নত দেশগুলো নয়া-সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালটা কাঁধ থেকে ফেলে দেয় আর বিশ্বব্যাপী শিল্প ভিত্তিক ধনতন্ত্রের পতন হয়।"

এই সারসংক্ষেপ থেকেই বোঝা যাবে, যে গ্রন্থটির বিশ্লেষণ কত প্রাচুর্য পূর্ণ এবং ব্যাপ্তিময় এবং এতে আধুনিক জীবন সম্পর্কে যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে তা কতটা ক্রোধ মিশ্রিত। এই বই যদি দুই জন নেতৃস্থানীয় যুক্তরাষ্ট্রের মার্কসবাদী ছাড়া অপর কারো দ্বারা লেখা হতো, তবে এর কাটতি হতো ঢের বেশী। যেমন হয়েছে অমার্কস্‌বাদী সমালোচনাগুলোর বেলায়। বারান এবং সুজি নিঃসন্দেহে সেই একই বিশ্লেষণ করেছেন, যেটা ছিল গলব্রেথেরও, এবং তাদের বিশ্লেষণের ধারা দুটিও বহুলাংশে সমান্তরাল। যেভাবে আছে তাতেও 'মনোপলি ক্যাপিট্যাল'-এর প্রভাব ক্রমশ যুক্তরাষ্ট্রে এবং তার বাইরে প্রসার লাভ করেছে।

www.pathagar.com

সম্ভবতঃ আধুনিক সামজের উত্তেজনাপূর্ণ মৌলিক বিশ্লেষণ হিসেবে একই রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল কিছু আগে প্রকাশিত আর একটি গ্রন্থ, 'দি পাওয়ার এলিট' (১৯৫৬), যার লেখক ছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজানী সি. রাইট মিলস্ (১৯১৬–১৯৬২)। মিল্সের বক্তব্য ছিল এই যে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে ব্যবসায়ী, রাজনীতিক এবং সামরিক নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি দলের দ্বারা, যারা এক বিরাট আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আধুনিক জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ থেকে আসা কয়েক সহস্র ব্যবস্থাপকের এই দলটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় এমনভাবে নির্বাচিত হচ্ছে যে পুরনো নেতৃবৃন্দ তাদের মূল্যবোধটা পরবর্তী পুরুষের কাছে হস্তান্তর করে যাচ্ছে, যার মূল কথাটা হলো সম্পদের সঞ্চয় আর ব্যক্তিগত–মালিকানা ভিত্তিক সংগঠন। মিল্সের মতে গণতন্ত্রের বদলে বরং অল্প সংখ্যক কিছু লোকের শাসনই যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করে আছে, যার সাথে রয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রীক বস্তুবাদের দুর্নীতিপূর্ণ মূল্যবোধ।

জেমস্ ও' কোন্নোরের 'দি ফিস্কাল ক্রাইসিস্ অব দি স্টেট' (১৯৭৩) হলো মৌলিক বিশ্লেষণের তৃতীয় উদাহরণ, যাতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে শিল্পোন্নত জাতিগুলোর নিজেদের মধ্যকার সংঘাতের উপর। বারান্ আর সুজির মতের বিপরীত ধারায়, ও' কোন্নোর যুক্তি দেখিয়েছেন যে শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্র সংকটের দিকে এগুচ্ছে, তার অভ্যন্তরীণ অসুবিধার কারণেই। প্রধান কারণটা মার্কসেরই দেখিয়ে দেয়া: উৎপাদন-ক্ষমতার দ্রুত প্রসার আর ক্রয় ক্ষমতার স্বল্প প্রবৃদ্ধি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজের নিজের স্বল্প পরিমাণ বিক্রির সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে বিজ্ঞাপনে প্রচুর ব্যয়ের মাধ্যমে। এত সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য সরকারকে সম্প্রসারিত ব্যয়ের কর্মসূচী নিয়ে নেমে পড়তে হয়, যাতে থাকে সরকারী খাতে কর্ম–নিয়োগ, কল্যাণমূলক কর্মসূচী, আর সামরিক ব্যয়। কিন্তু এসব কর্মসূচীর জন্য তো টাকার প্রয়োজন। করের হার বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু তাতে রাজনৈতিক বাধা আসে, তাই সরকার ঋণের আশ্রয় নেয়, যার ফলে ঘটে মুদ্রাস্ফীতি। ব্যয়ের কর্মসূচী ছাঁটাই করা হয়, সুতরাং এবার আসে বেকারত্ব আর তাতে অশান্ত অবস্থা বাড়তে থাকে। অর্থনীতি তখন এক ত্রিমুখী বিনিময় (trade-off) চক্রের আবর্তে পড়ে, যাতে থাকে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ক্রমবর্ধমান কর আর ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি। সংকট যত এগুতে থাকে, ঐ তিনটিই ক্রমশঃ অর্থনীতিকে গ্রাস করে। দেখে মনে হয়, ও'কোন্নোরের বিশ্লেষণ ১৯৭০ এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ের বাস্তব ঘটনাবলীর সাথে একদম মিলে যায়।

www.pathagar.com

অন্যান্য ভিন্ন মতাবলম্বীরা নজর দেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শিল্প-কেন্দ্রীক ধনতন্ত্রের প্রক্রিয়ার উপর। ইস্‌ভান মেজারোস্ তাঁর 'মার্কস্‌এজ্ থিওরী অব অ্যালিএনেশন্' (১৯৭০) এবং ওয়াল্টার এ. উইস্‌কফ্ তাঁর 'অ্যালিএনেশন অ্যান্ড ইকনমিকস্' (১৯৭১) গ্রন্থে আধুনিক ধনতন্ত্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাঁরা যুক্তি দেখান যে বস্তুভিত্তিক সম্পদ বৃদ্ধি ঘটার পরও ব্যক্তিগত সন্তোষ বরং হ্রাস পেয়েছে। হ্যারী ব্রাভারম্যান তাঁর 'লেবার আন্ডার মনোপলি ক্যাপিট্যালিজ্‌ম' (১৯৭৫) গ্রন্থে বলেছেন যে শিল্প পুঁজিবাদ যখন কারখানার উপর উচ্চ স্তরের প্রকৌশলিক আর ব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করছে, তার ফল হয়েছে শ্রমের মর্যাদা হ্রাস। ও' কোন্‌নোর গোটা অর্থনীতিতে যে সাধারণ সংকটের কথা বলেছে, এই গ্রন্থটি তার সাথে জুড়ে দিয়েছে দৈনন্দিন জীবনেও সংকটের এক ছবি।

একটি স্বনির্বাচিত এলিট (elite) গোষ্ঠীর নেতৃত্বে দৈত্যাকার কর্পোরেশনসমূহের প্রাধান্য এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চূড়ান্ত পরাজয়, এই সব কাহিনীই হলো আধুনিক অর্থনীতির আমূল সংস্কারপন্থী বিশ্লেষণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সার্বিক অর্থনৈতিক কর্ম-সম্পাদন এবং ব্যক্তি জীবন, উভয় দিক থেকেই এর ইঙ্গিত এখনকার তরুণ অর্থনীতিবিদ যাদের জীবন মাত্র শুরু হয়েছে, তাদের একটি বড় অংশের জন্য এক মহা ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি, ফলাফল এবং আয়ের বন্টন, এই সব বিষয় এখন আমূল সংস্কারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নতুন ভাবে বিচার করে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'দি ইউনিয়ন ফর র‍্যাডিক্যাল পলিটিক্যাল ইকনমিকস্' একটি পত্রিকা প্রকাশ করে, জাতীয় আর আঞ্চলিক সম্মেলন ডাকে এবং এটা এখন অবিচল 'মার্কিন অর্থনৈতিক সমিতির' বাৎসরিক সভারও একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে। ইংল্যান্ডে, প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একদল তরুণ অর্থনীতিবিদ আমূল সংস্কারপন্থী এবং মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে পড়েছে। ইউরোপে, ১৯৬০-এর দশকে যে ছাত্র আন্দোলন হয় জার্মানী, ফ্রান্স আর ইটালীতে, তার চেহারা ছিল তীব্র মার্কস্‌বাদী। সেখানে একজন অগ্রগামী তাত্ত্বিক হলেন আর্নেষ্ট ম্যান্ডেল, যাঁর লিখিত 'মার্কসিস্ট্ ইকনমিক থিওরী' (১৯৬৮) একাধারে মূল মার্কস্‌াবাদী অর্থনীতির সমালোচনা, পুনরুল্লেখ এবং সেই সাথে তাতে বিশ্লেষণ করেছে কিভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থনীতি পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারবে।

www.pathagar.com

মার্কস্‌বাদের পুনরভ্যুদয় এবং তার সাথে সম্পর্কিত আমুল-সংস্কারপন্থী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সোভিয়েট ইউনিয়ন বা তাদের মার্কা ওয়ালা সমাজতন্ত্রের বিশেষভাবে কোন ঘনিষ্ঠতা নেই। মার্কস্‌বাদীসহ অনেক মৌলিক সংস্কারপন্থী সোভিয়েট ইউনিয়নের আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রায়ীত পরিকল্পনা পদ্ধতিতে নৈরাশ্য প্রকাশ করে থাকে। তাদের মতামত বরং বিকেন্দ্রায়িত প্রশাসন এবং বাজার ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের (market socialism) প্রতিই অধিক অনুকূল এবং একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে তারা তাকিয়ে আছে যুগোস্লাভিয়ার বিকাশমান 'শ্রমিকদের দ্বারা ব্যবস্থাপনা' পদ্ধতির দিকে। ১৯৬০ দশকের শেষের দিকে হাংগেরী এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে পরিকল্পনায় বাজার ব্যবস্থাকে যে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তাতে খরিদ্দারের চাহিদা এবং ক্রয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্যে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করছে। মৌলিক সংস্কারপন্থীরা আজ সারা পৃথিবীব্যাপী খুঁজে বেড়াচ্ছেঃ যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপে ব্যবহৃত ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক ধনতন্ত্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, এই দুই ব্যবস্থারই কোন বিকল্প পাওয়া যায় কি না।

www.pathagar.com

১২
সাম্প্রতিক সংকট

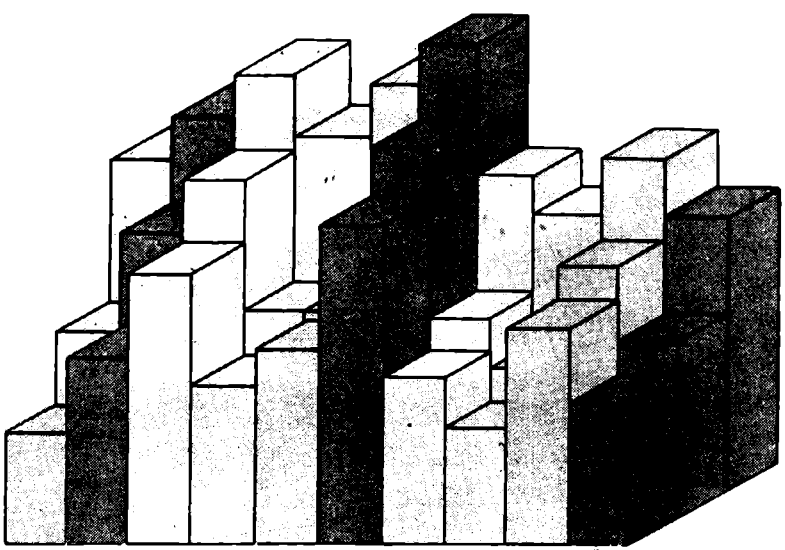

বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুথাংশের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র এক দুঃসময়ের মধ্যে তার দুই শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি নেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক প্রলয়ংকর যুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে এবং একজন রাষ্ট্রপতিকে কেলেংকারীর পরিবেশে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি যে মন্দা ডেকে আনে, তা ছিল ১৯৩০-এর পর সবচেয়ে কঠিন। নিউইয়র্ক শহরের আর্থিক অসুবিধার সাথে তাল রেখে উত্তর-পূর্ব রেল

www.pathagar.com

পথগুলোতে আসে এক ব্যাপক দেউলিয়া অবস্থা। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর একটি জোট (cartel) তেলের দাম প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যকার দুর্বল 'মন-কষাকষি-নেই' (detente) অবস্থাটা ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো আর সেই সাথে নতুন করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আর স্পেন, ইতালী, পর্তুগাল এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতা গোটা ইউরোপের রাজনীতিতেই এক অস্থিতিশীলতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করলো। ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সনে বৃটন-উড্স এ যে আন্তর্জাতিক আর্থিক-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তাও যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি এবং দেনা-পাওনায় (balance of payment) ঘাটতির কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তার স্থান দখল করে 'অবাধ ভাসমান বিনিময় হার' (free floating exchange rate) নামক একটি পরিমার্জিত এবং অপরীক্ষিত ব্যবস্থা।

যদিও নিওক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সমৃদ্ধির যুগে দৃশ্যতঃ প্রাধান্য লাভ করে এবং জয়ী হয়, তবুও তার অবস্থান যে একেবারে নিরাপদ ছিল, তা নয়। আমরা দেখেছি যে, এই মতকে আক্রমণ করেছেন ফ্রিডম্যান এবং রক্ষণশীল অর্থবাদীরা, (monetarists), গলব্রেথের অনুসারী উদারপন্থী সমালোচকগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মৌলিক পরিবর্তনবাদীরা। রাজনৈতিক বর্ণালীতে এটার অবস্থান ছিল মাঝের একটা বড় অংশ জুড়ে, যাতে প্রচলিত অর্থনৈতিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল, তবে কিছু কিছু প্রান্তিক সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে যাতে অবস্থার কিঞ্চিত উন্নতি সম্ভব হয়। ১৯৭০-এর দশকে অর্থনীতির এই প্রধান স্রোতধারাটা ক্রমশ অচল হয়ে পড়েছিল। কেইন্সীয় 'বৃহৎ-অর্থনীতি' এবং তা থেকে অনুসৃত নীতিমালা বেকার-সমস্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির যুগপৎ অবস্থানের সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারেনি- যে সমস্যাটাকে অনেকে 'স্ট্যাগফ্লেশান্ (stagflation) বলে আখ্যায়িত করলো, কারণ এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক মন্দা উভয়ই একত্রে দৃশ্যমান হয়। একই সময়ে, নিরেট তাত্ত্বিক ধারণার ক্ষেত্রেও এমন কিছু নতুন চিন্তার বিকাশ ঘটলো, যার ফলে নিওক্লাসিক্যাল 'বৃহৎ অর্থনীতি'র মূল মতবাদ এবং প্রধান ধারণাগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বই যখন লেখা হচ্ছে সেই সময়ে তত্ত্ব এবং নীতি নির্ধারক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি শাস্ত্র এক ছত্রভংগ অবস্থায় পড়ে গিয়েছে, ১৯৭০-এর দশকের অনেক অর্থনৈতিক অসুস্থতাতেই কেইন্সীয় মতবাদের

www.pathagar.com

কর্মপদ্ধতি দ্বারা আর কোন চিকিৎসাই করা যাচ্ছিল না বলে তা কঠোর আক্রমণের সম্মুখীন হয়। তাই কেইন্‌সীয় তত্ত্বের এক পুনর্গঠন আজ জন্ম নিচ্ছে বলে মনে হয়। কখন তা সম্পূর্ণ রূপ পাবে এবং কি এর রূপ হবে, তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না, তবে যারা অর্থনীতি শাস্ত্র অনুশীলন করছে, তাদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ এই শাস্ত্রটা আজ সকল পর্যায়েই এক আলোড়িত অবস্থায় পৌঁছেছে।

বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি

কেইন্‌সীয় 'বৃহৎ–অর্থনীতিতে' বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি এই দুটি অবস্থার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে 'সামগ্রিক চাহিদা' (aggregate demand) বা মোট ক্রয় ক্ষমতার মাধ্যমে। যদি ক্রয় ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়, তা হলে উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় নিরোধক হলো অর্থনীতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করাঃ অধিক সরকারী ব্যয় অথবা টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি করা বা ঐ দুটোর মিশ্রণ। বিপরীতক্রমে মনে করা হলো যে মুদ্রাস্ফীতিটা ঘটছে অধিক ব্যয়ের দরুণ এবং তার নিরোধক হলো সরকারী ব্যয় কমানো এবং আর্থিক বিষয়ে সংযম। এই দুটির মাঝখানে অবস্থিত রইলো সেই 'অবাস্তব স্বপ্ন' যাকে বলা যায় পূর্ণ–কর্মনিয়োগ, স্থির মূল্যমান, সুসম সরকারী বাজেট এবং 'উপযুক্ত' আর্থিক নীতির দ্বারা সৃষ্ট এক সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা।

অবশ্য মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসেবে অর্থনীতিবিদরা সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত আরো তিনটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে। জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে পারে, যদি সামগ্রিকভাবে দেশে পূর্ণকর্মনিয়োগ অবস্থা আসার আগেই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলোর (যেমন ইস্পাত) উৎপাদন বৃদ্ধিতে অসুবিধা (bottle necks) দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে পারে, যদি শ্রমিকের অভাব বা ইউনিয়নগুলোর শক্তির দ্বারা মজুরী বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়; মোট খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে যে 'ব্যয়ের ধাক্কা' আসবে, সেটাই উচ্চ মূল্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ অর্থনীতির গোটা ব্যয় কাঠামোটাই উপরে উঠে যেতে পারে, যদি কোন মৌলিক কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে, যেমনটা ১৯৭০–এর দশকের গোড়ার দিকে তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে হয়েছে (যদিও অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই এই ঘটনা বাস্তবে ঘটার আগে এই ব্যতিক্রমটার কথা ভাবে নি)। যাই হোক, সোজা কথাটা রয়েই গিয়েছেঃ ব্যয় যদি হ্রাস পায়, তাহলে বেকারত্ব বেড়ে যায় এবং ব্যয় যদি অতিরিক্ত বেশী হয়, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

www.pathagar.com

অবশ্য, মুদ্রাস্ফীতির এই কেইন্‌সীয় ব্যাখ্যা ১৯৫০-এর দশকের এবং তার পরের মূল্যমানের গতিবিধির কোন মানে করতে পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটলো, তা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে ক্রমশঃ প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথেই হয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সনে যখন মন্দা আসে, তখন দেখা গেল দ্রব্যমূল্য ঐ মন্দার পরেও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, যা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ঐ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা আর কাজে লাগছে না। কেউ কেউ যুক্তি দেখালো যে মন্দার সময়ে চাহিদার পরিবর্তন এক এক জিনিসের জন্য এক এক রকম হয়েছে, অর্থাৎ কোন কোন শিল্পের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে আবার কোন কোনটায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে চাহিদা কমেছে, যেখানে দাম কমেনি, কারণ মূল্য নিচের দিকে পরিবর্তনে বিমুখ (inflexible downward) ছিল; অর্থাৎ বড় বড় কর্পোরেশনগুলো বাড়তি চাহিদার সময়ে দাম বাড়াতে খুবই রাজী থাকে, কিন্তু যখন চাহিদা কমে যায় তখন দাম কমাতে অস্বীকার করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু তত্ত্বে এই কথাটুকু জুড়ে দিলেও তাতে বোঝা যায় না কেন ১৯৬০-এর দশকে ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যখন অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে বেকার সমস্যা এবং কারখানায় ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকাটা একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে পড়ে। এই সময়েই আসে তথাকথিত 'ফিলিপস্ কার্ভে'র (Philips Curve) মতবাদ। যাঁর নাম অনুসারে এই লেখ-চিত্র, একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, এ. ডব্লিউ ফিলিপস্ ইংল্যান্ডের মজুরী এবং মূল্য বিষয়ে তিনি একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 'ফিলিপস্ কার্ভে'র মাধ্যমে সম্ভবতঃ এটাই দেখানো হয় যে যখন বেশী পরিমাণে বেকারত্ব থাকে এবং অর্থনীতিতে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যবহৃত ক্ষমতা (slack) থাকে, তখন কর্মনিয়োগ এবং মূল্য-মানের মধ্যে কিছুটা নেয়া-দেয়া (trade off) ঘটে, সে অবস্থায় মূল্যের প্রবণতা থাকে স্থিরতা কিম্বা ধীর গতিতে বৃদ্ধির দিকে; কিন্তু বেকারত্ব হ্রাস পেলে অর্থনীতির ঐ অব্যবহৃত ক্ষমতা কমে যায় আর তখন মূল্য বৃদ্ধি হতে থাকে অধিক দ্রুত। ১৯৬০-এর দশকের শেষে এই মতটা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে এর সামঞ্জস্য ছিল, এতে দেখানো যেত যে বেকারত্ব হ্রাসের সাথে সাথে মূল্য বৃদ্ধিও ঘটবে।

'ফিলিপস্ কার্ভ' তত্ত্ব ছিল কাঠামোগত বেকারত্ব (structural unemployment) ব্যাখ্যা করবার একটা প্রচেষ্টা, অর্থাৎ কিনা যখন মূল্য ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে তখনো যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক বেকার থেকে যাওয়ার

www.pathagar.com

ঘটনার অর্থ দর্শানো। ঘটনাটা দৃশ্যমান হতে শুরু করে ১৯৫০-এর দশক থেকে, যার অনেকগুলো কারণ ছিলঃ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে চড়া দামের শ্রমিকের বদলে মূলধন ব্যবহার, মোটর যান এবং ইস্পাত শিল্পে মূলধনের ঘনত্ব বৃদ্ধি; পুর্টোরিকো এবং দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো থেকে অল্প শিক্ষিত প্রশিক্ষণহীন শ্রমিকের বিপুল সংখ্যায় আগমন, মহিলাদের ক্রমাগত শ্রমিকের বাজারে ভিড় জমানো এবং আইসেনহাওয়ারের সময়কার মন্থর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। ১৯৬০-এর দশকে সমস্যাটা আরো চরমে পৌছায় যখন বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো পাইকারী হারে তাদের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম মজুরীওয়ালা দেশগুলোতে, যেমন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশে স্থানান্তরিত করে। কিছুকাল অবশ্য শ্রম-বাজারের এই সব পরিবর্তন পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকের বিপুল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং তুলনামূলকভাবে সরকারী খাতে অধিক কর্মনিয়োগের কারণে ধামাচাপা পড়ে থাকে। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে যখন সেই বিপুল প্রবৃদ্ধি শেষ হয়ে এলো, সরকারী কর্ম-নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থিতি ফিরে এলো, তখনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই জন্ম হার বৃদ্ধির 'প্রতিধ্বনী' স্বরূপ-বিপুল সংখ্যক তরুণ শ্রমিক শ্রমের বাজারে বন্যার বেগে আসতে শুরু করে। ফল হলো এই যে, তরুণ অপেক্ষাকৃত অল্প দক্ষ এবং অনভিজ্ঞ শ্রমিকের এক বিরাট উদ্বৃত্ত অংশ এমন এক শ্রম-বাজারে উপস্থিত হলো, যে বাজার তাদের গ্রহণ করার মত দ্রুত বেগে আর সম্প্রসারিত হতে পারলো না। এমন কি যখন 'প্রধান' শ্রমিক দলের, অর্থাৎ পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত সাদা চামড়া পুরুষ শ্রমিকদের পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থা বিরাজ করে এবং মোট চাহিদা বা উৎপাদন ব্যয় আরো বেড়ে যাবার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলো, তখনও বহু সংখ্যক তরুণ কালো চামড়া, ল্যাটিনো এবং মহিলা শ্রমিক বেকার, আধা-বেকার অথবা অত্যন্ত অল্প আয়ের এমন সব নামমাত্র মজুরীর কাজে নিযুক্ত ছিল যা ছাড়বার জন্য তারা ছিল নিতান্ত ব্যগ্র। তাই ১৯৭০-এর দশকে 'ফিলিপস্ কার্ভ'-এর দেখানো সম্পর্কটাও বাতিল হয়ে গেল, জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়েই চললো, তা সে অর্থনীতিতে বেকারত্বের হার বা 'অব্যবহৃত-ক্ষমতা' যতই থাকুক না কেন।

ইতিমধ্যে অর্থনীতির প্রধান শ্রোতধারার সমালোচকগণ মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে বিকল্প তত্ত্ব প্রকাশ করে। ফ্রিডম্যানের যুক্তি ছিল এই যে কেইন্সীয় অর্থনৈতিক কর্মনীতির ফলে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। গলব্রেথের মতে 'বৃহৎ ব্যবসা' এবং 'বৃহৎ শ্রমিক' প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরী নিয়ে

www.pathagar.com

দরকষাকষির দ্বারাই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকেঃ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যতটা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার চেয়ে বেশী মজুরী বৃদ্ধি মেনে নিতে বাধ্য হয়, আর সেই অবস্থায় পার্থক্য পুষিয়ে নেবার এবং নিজেদের মুনাফার মাত্রা বজায় রাখার জন্য তারা জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। মৌলিক পরিবর্তনবাদীরা (radicals) দাবি করলো যে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বর্ধিত সামরিক ব্যয় আর যুদ্ধের পরিণতি, অথবা ও'কোননোর যেমন বলেছিলেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রকৃতিগত অস্থিতিশীলতা নিরোধের জন্য যেসব বিধান দরকার, সেগুলো নিজেরাই মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিকারী। এ সব যুক্তির কোনটাই গোঁড়া কেইন্‌সীয় তাত্ত্বের দ্বারা ভালভাবে খণ্ডন করা গেল না, কারণ তাতে তত্ত্ব আর বাস্তবের মধ্যে এই দুর্ভাগ্যজনক পার্থক্যের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা ছিল না।

নিকোলাস্ ক্যালডর নামক একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের সহ-অবস্থান সম্পর্কে একটি কেইন্‌সীয় ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন। ক্যাল্‌ডরের মতে 'বৃহৎ-ব্যবসা' আর 'বৃহৎ-শ্রমিক' প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা মজুরী উচ্চ পর্যায়ে নির্ধারিত হলো এবং মোট ব্যয় বৃদ্ধি থেকেই গেল, মোট চাহিদার মাত্রাটা যাই থাকুক না কেন! এ অবস্থায় অর্থনীতি যদি সমৃদ্ধিশালী হতো এবং মজুরী যে পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে, উৎপাদনের পরিমাণ যদি সেই হারেই বাড়তো, তা হলে সব কিছুই ঠিক থাকতো। কিন্তু যদি মন্দা আসে, তাহলে উৎপাদন হ্রাস পাবে, অথচ ক্রয় ক্ষমতা বাড়তেই থাকবে, যার চাপে মূল্য বৃদ্ধি হবে, আবার উৎপাদন হ্রাসের কারণে বেকারত্বও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ক্যাল্‌ডর যে ব্যবস্থাপত্র দিলেন, তা ছিল একেবারে অভিনবঃ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে যদি উৎসাহিত করা যায়, তা হলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে আর মূল্যের উপর উচ্চচাপ হ্রাস পাবে, তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি আর বেকার সমস্যা, এই দু'টো থেকেই আরোগ্যলাভ সম্ভব হবে। অর্থনীতিবিদরা ক্যালডরের কথাটা কেউ বিশেষ আমলই দিল না, কারণ মুদ্রাস্ফীতির স্বীকৃত বিধানপত্র ছিল বরং অর্থনীতিকে ঠাণ্ডা করে আনা, তাকে আরো উত্তপ্ত করে তোলা নয়। তবুও মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৭৪-৭৬ বৎসরগুলোর অভিজ্ঞতায় ক্যাল্‌ডরের বিশ্লেষণের পক্ষেই সমর্থন পাওয়া যায়ঃ মন্দার সবচেয়ে খারাপ অবস্থাতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছিল, আর তা মন্থর হয়ে এলো যখন অর্থনীতিতে আবার গতি (recovery) ফিরে এলো। কিন্তু ক্যালডরকে বাদ দিলে, কেইনসীয়দের প্রধান দলটির চিন্তাধারা ছিল বাস্তব ঘটনা প্রবাহের সাথে একেবারে বেসুরো।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমস্যা

অসুবিধার কারণটা আংশিক নিহিত ছিল পুঁজিবাদী শিল্প ব্যবস্থার কাঠামোর অবিরাম পরিবর্তনে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর পুঁজির সঞ্চার নামক যে দুটি শক্তির বিশ্লেষণ করেছিলেন প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদ অ্যাডম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো থেকে কার্ল মার্কস্ পর্যন্ত, তা ক্রমাগত অর্থনীতিতে ধীরে অথচ সর্বক্ষণ এমন এক পরিবর্তন আনলো, কেইনসীয় বৃহৎ-অর্থনীতি (macro economics) যা সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনতে অসমর্থ হয়ে পড়ে, কারণ তার দৃষ্টি ছিল মোট ব্যায়ের স্বল্পকালীন পরিবর্তনের দিকে এবং তাতে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা কাঠামো রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা ধনতন্ত্রের যে বিশেষত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন তা এই যে শ্রম ক্রমাগত পুঁজিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো পুঁজি সংগঠনের প্রবৃদ্ধির দিকটার উপর গুরুত্ব দেন, অপর পক্ষে মার্কস্ জোর দিয়েছিলেন সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা আর অল্প সংখ্যক লোকের উচ্চ আয়ের বিষয়টার উপর। মার্কস্ কর্তৃক ভবিষ্যদ্বানীকৃত সমাজের এই মেরুপ্রবণতা (polarization of society) আধুনিক অর্থনীতিতে সরকারী কর্মপন্থা, যেমন কর ধার্য করা, কল্যাণমূলক ব্যয় এবং অন্যান্য কর্মসূচীর ফলে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু যদিও ব্যক্তিগত আয় এবং সম্পদের ক্রমবর্ধমান অসমতা আংশিকভাবে রুখতে পারা গিয়েছে, তবুও অধিকাংশ জাতিই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পুঁজি সঞ্চারকে উৎসাহিতই করেছে। কারবারের সংরক্ষিত আয় আবার সেই প্রতিষ্ঠানেই খাটানোর ফলে তাদের মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলোতে মূলধন কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, আর তারই ফলে এগুলোর মধ্যে যারা সর্ববৃহৎ, তারা বহুজাতিক (multi-national) আকার ধারন করেছে। সাথে সাথে প্রকৌশলিক পরিবর্তন সেখানে অবিরামভাবে শ্রমকে পুঁজির দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছে, বিশেষভাবে এটা ঘটেছে এমন সব শিল্পে যেখানে মজুরীর হার চড়া, পুঁজির ঘনত্ব (capital intensive) অধিক আর যেখানে শ্রমিকদের কড়া ইউনিয়ন থাকার ফলে প্রবৃদ্ধি আর বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতার বিরাট একটা অংশ তারা নিজেদের জন্য রেখে দিতে সমর্থ হয়েছে। ঐসব শিল্পের উচ্চ মজুরী বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোকে পৃথিবীর স্বল্পোন্নত অঞ্চলে শ্রম-উদ্বৃত্ত এলাকাগুলোতে (যেখানে মজুরীর হারও কম) বিনিয়োগ প্রসারিত করতে উদ্যোগী করেছে। আমরা দেখতে পাবো যে ঐসব দেশে আধুনিকায়নের ফলে তাদের জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধির প্রবণতা বেশী হয়েছে, শ্রমিকের উদ্বৃত্তও

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর সেই জন্য বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে অধিক বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে। অপর পক্ষে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে জনশক্তির একটি ক্রমবর্ধমান অংশ ঐসব বৃহৎ-কর্পোরেশনের বৃহৎ ইউনিয়ন প্রভাবিত উচ্চ-মজুরী সম্পন্ন কর্ম নিয়োগের সুযোগ তুলনামূলকভাবে অল্পই পাচ্ছে। এরই ফলে ঘটছে 'কাঠামোগত বেকারত্ব (structural unemployment), সেবামূলক শিল্পগুলোতে স্বল্প মজুরীর শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরকারী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, দীর্ঘ মেয়াদে যার অর্থ জোগান দেয়া সম্ভব শুধু অধিক পরিমাণ কর আদায়, অথবা মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা অথবা ঐ দুটোর দ্বারাই। অবস্থা ভেদে সামান্য হেরফের হলেও এই প্রক্রিয়াটাই কাজ করেছে উত্তর আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপের সমগ্র শিল্পোন্নত এলাকায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর প্রকৌশলিক পরিবর্তনের কারণে এইসব প্রবণতা কিছুকাল চাপা পড়েছিল। নয়া কারিগরী কৌশলসমূহ সম্পূর্ণ নতুন কয়েকটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন ঘটালো যেমন, ইলেকট্রোনিকস্, টেলিভিশন, এবং কম্পুটার অপরাপর কতকগুলো শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে, যেমন বিমান-পরিবহণ এবং প্লাস্টিক দ্রব্য। ঐ সব জায়গায় সৃষ্ট নতুন চাকুরী গোটা ১৯৫০-এর দশকটায় অর্থনীতিকে সচল, আর বেকারত্বের পরিমাণটা অপেক্ষাকৃত অল্প, রাখতে পেরেছে। কিন্তু এই সব শিল্পের প্রবৃদ্ধি যখন মন্থর হয়ে এলো, তখন পূর্ব-বর্ণিত আলামতগুলো অধিক পরিমাণে নজরে পড়লো। অর্থনীতির অন্যান্য যেসব খাত থেকে পঞ্চাশের আর ষাটের দশকের বিপুল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের প্রবাহ আসে, সেগুলোতেও মন্থরতা এলো, বিশেষ করে অস্ত্র শিল্প, এবং শিক্ষা বা হাইওয়ে নির্মাণের মত সরকারী ব্যয়ে। ১৯৪৫-১৯৭০ সময়ের সমৃদ্ধির বাজার যখন ১৯৭০-এর দশকে তুলনামূলকভাবে মন্দায় রূপান্তরিত হলো, তখন এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটা নিজেই শিল্প ভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীর কাঠামোতে বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং নিম্ন-আয়ের সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে, আর তা কাটিয়ে উঠার জন্য কেইন্‌সীয় অর্থনীতির সহজ ঔষধগুলোই যথেষ্ট নয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরো প্রশ্ন আনলো সম্পদ ব্যবহার আর পরিবেশ দূষিত করণের, যখন বিশেষভাবে ষাটের এবং সত্তরের দশকে অবিরাম প্রবৃদ্ধির পরিণতি পরিষ্কারভাবে চোখে পড়লো। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অধিক পরিমাণ কাঁচামাল এবং ক্রমবর্ধমান শক্তির ব্যবহার, যার থেকে উৎপন্ন হবে দ্রব্য সামগ্রী (output) এবং ময়লা (wastes)। বর্তমান কারিগরী কৌশলটা এমন

www.pathagar.com

ধরনের সম্পদ এবং শক্তির উপর নির্ভরশীল, যা ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর উচ্ছিষ্ট ময়লা নিষ্কাষণ করা হচ্ছে পৃথিবীর সঞ্চিত বায়ু, জমি আর পানির ভাণ্ডারে। সম্পদ আর ভাণ্ডার, ও দুটোর পরিমাণই সীমাবদ্ধ। একটি সম্পদ শেষ হতে শুরু করলে, অপর একটি তার বদলে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাওতো এক সময় শেষ হবে। আর উচ্ছিষ্ট ময়লা ক্রমশঃ জমা হলে তা পরিবেশকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে যে তাতে মানুষের স্বাস্থ্য এবং জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা।

অর্থনীতিবিদরা এই সব সমস্যা পর্যালোচনা করলো। ডোনেলা এইচ. মেডোস্ এবং অপর কয়েকজন 'লিমিটস্ টু গ্রোথ' (১৯৭২) নামক গ্রন্থে কম্পুটার ভান-করা (simulation) পৃথিবীর সীমিত সম্পদের পরিবেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার এক হিসাবে দেখিয়েছেন যে ইতিপূর্বে বিশ্বে যে হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, ভবিষ্যতে সেই উচ্চ হারটা বজায় রাখা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদিও যে কোন একটি উপাদানের সীমাবদ্ধতা (যেমন লৌহ আকরের অভাব) প্রবৃদ্ধি খতম করতে পারবে না, কিন্তু কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কিত উপাদানের অভাব হলে তেমন পরিস্থিতি হতেও পারে। যেমন, মরু অঞ্চলে পানি সেচের দ্বারা খাদ্যের সরবরাহ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব বটে, কিন্তু পানি পাওয়া গেলেও ঐ ধরনের প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি এবং মূলধন সরবরাহে অন্যত্র সীমাবদ্ধতা দেখা দিতে পারে। আগামী দিনে প্রকৌশলের উন্নতি এবং আবিষ্কারগুলো হয়তো অধিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এনে দেবে, কিন্তু এই গ্রহে যেটুকু সম্পদ আছে, সে দিক থেকে একটা সীমাবদ্ধতা রয়েই গিয়েছে। কেনেথ বৌলডিং-এর 'দি ইকনমিকস্ অব দি কামিং স্পেসশীপ আর্থ' (১৯৬৬) নামক প্রবন্ধে এই কথাটাই বলা হয়েছে। বৌলডিং এই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত এমন একটা নিশ্ছিদ্র (closed) অর্থনেতিক ব্যবস্থার বিকাশে, যা একটি স্থিতিশীল প্রাণী-ব্যবস্থার (biological system) মত সবটুকু উৎপাদিত দ্রব্যকেই আবার কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে, সৃষ্ট ময়লা বা জঞ্জালগুলোও (wastes) সেই কাঁচামালের মধ্যেই থাকবে। ভবিষ্যতে টিকে থাকতে সক্ষম অর্থনীতি কেমন হবে, তার সংজ্ঞা আরো পরিষ্কারভাবে দিয়েছেন হারম্যান ই. ড্যালি। 'দি স্টেডি-স্টেট ইকনমি: টুয়ার্ড এ পোলিটিক্যাল ইকনমি অব বাইওফিজিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম অ্যান্ড মরাল গ্রোথ' (১৯৭১) নামক প্রবন্ধে তিনি চেয়েছেন যে জনসংখ্যা এবং বস্তুগত সম্পদ (physical wealth) একই পরিমাণে অপরিবর্তিত রাখতে

www.pathagar.com

হবে, আর জিনিসের বিতরণ সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, প্রবৃদ্ধি চলতে পারবে শুধু নৈতিক ক্ষেত্রে। আরো একটি শর্ত দেয়া যায় যে, অর্থনৈতিক এককগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট হতে হবে, যাতে এমন প্রকৌশল ব্যবহার করা যায় যাতে করে যন্ত্রের বদলে মানুষের শ্রমের দক্ষতা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা যায়। এই কথাগুলো বলেছেন ই. এল. সুমেখার তাঁর 'স্মল ইজ বিউটিফুলঃ ইকনমিক্স অ্যাজ ইফ পিপ্‌ল ম্যাটার্ড' (১৯৭৩) নামক গ্রন্থে। অবশ্য দরকারী পরিবর্তনগুলো করার জন্য পর্যাপ্ত সময় হয়ত আর পাওয়া নাও যেতে পারে। রবার্ট এল, হেইলব্রোনার তাঁর 'অ্যান এনকোয়ারী ইনটু হিউম্যান প্রস্পেক্ট' (১৯৭৫) গ্রন্থে বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারার সাথে জনসংখ্যা, খাদ্য, সম্পদ এবং পরিবেশ দূষিতকরণের ফলে ভবিষ্যতে বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য বা বাস্তব সর্বনাশা পরিণতির কথা বলেছেন যা 'প্রবল আলোড়নমূলক পরিবর্তন' এনে দিতে পারে। মানবগোষ্ঠি এই কেয়ামতের সম্ভাবনা থেকে উদ্ধার পেতে পারে, তাঁর উপসংহার মতে, একমাত্র যদি মনুষ্য সমাজকে বর্তমানের চেয়ে পৃথক এক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হয়।

আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাসের এক সম্ভাবনা। কিন্তু যে সঞ্চয়ী মনোভাব পুঁজিবাদকে প্রেরণা জোগায়, তা পরিতৃপ্ত করার জন্য সর্বদাই প্রবৃদ্ধি একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। অর্থনীতির স্থির অবস্থা বজায় রাখার জন্য পদার্থগত সামগ্রী (material things) সম্পর্কে একটি ভিন্ন মনোবৃত্তির প্রয়োজন হবে, আর এজন্য দরকার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচণ্ড পরিবর্তন। এছাড়া, আধুনিক ধনতন্ত্রে আয়, সম্পদ এবং ক্ষমতার বন্টন নিতান্তই অসম, যেটা অধিকাংশ লোক মেনে নিচ্ছে, তার কারণ এ থেকে তারা পদার্থগত লাভ পাচ্ছে। লাভের মাত্রা যখন হ্রাস পাবে বা তা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন যেসব সাধারণ মানুষ ইতিপূর্বে সন্তুষ্ট ছিল, তারা আর সহজে অসম-অবস্থাটা মেনে নেবে না। প্রবৃদ্ধি যদি না থাকে, তা হলে আয় এবং সম্পদের পুনর্বন্টনটাই ঘটার সম্ভাবনা অধিক। যদি প্রবৃদ্ধিহীন যুগ সামনে আসে, তাহলে পুঁজিবাদের যে রূপটা আমরা চিনি, তার টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই এবং তখন আয় এবং সম্পদের বন্টন নিয়ে সংঘাত ঘটতে পারে।

আন্তর্জতিক অর্থনীতি

আন্তর্জতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একই ধরনের অস্থিরতার বিষয়ে জানা যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য

www.pathagar.com

ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিপুল বৃদ্ধি। শুল্ক এবং বাণিজ্যিক বাধাসমূহ হ্রাস করার ফলে কাজটা হয়, এবং ১৯৪৫ সনের বৃটন উড্‌স্ চুক্তিগুলোর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আর আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের জন্য একটি স্থিতিশীল আর্থিক ভিত্তি। মনে হলো যেন বিশেষ কর্মদক্ষতা এবং বাণিজ্যের উপকারের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব–সমৃদ্ধির এক নবযুগ সমুপস্থিত— অবশেষে ১৯৬০ এর দশকে এতে ফাটল দৃষ্টিগোচর হলো।

নতুন সমস্যা হলো একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশ নিয়ে, যা হয়ে উঠলো প্রত্যেক জাতির ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণের থেকে বহুলাংশেই স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার। এই তথাকথিত 'ইউরো ব্যাংক' (Eurobank) ব্যবস্থা ঋণ দেয়, আমানত গ্রহণ করে, পৃথিবীর নানা ধরনের মুদ্রায়, কিন্তু প্রধানতঃ ডলারে। যেসব ব্যাংক এই কাজে অংশ নেয়, নিজ নিজ দেশে তাদের নিজস্ব অফিস আছে, যেমন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান বা জার্মানী, কিন্তু তাদের বিদেশী মুদ্রার ব্যবসা মোটামুটি নিজ দেশের অর্থ–নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার বাইরেই থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি একটি সুইস ব্যাংক একজন গ্রীক জাহাজ মালিককে জার্মান যন্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য ইতালিয়ান লিরা ঋণ দেয়, তা হলে ঐ ঋণ দেশগুলোর কোন একটারও আর্থিক–কর্তৃপক্ষের বা আর্থিক নীতির আওতায় বা নিয়ন্ত্রণে আসে না। এখন পৃথিবীর আর্থিক ব্যবস্থার একটা মোটা অংশই শুধু বেসরকারী ব্যবস্থাপকদের আর আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর স্বেচ্ছাকৃত ছাড়া, অপর সব রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে আর্থিক অতি–সম্প্রসারণ এবং অস্থিতিশীলতার যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এমনকি ১৯৬৮ সনের পূর্বেও তা ছিল না।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭০–এর দশকে যে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইউরো ব্যাংক 'ব্যবস্থায় ঋণের সম্প্রসারণ। ইউরো ব্যাংকের দেয়া ঋণ সম্ভবতঃ ১৯৬৮ সনের ৫০ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৭৯ সনে গিয়ে পৌঁছায় আনুমানিক এক হাজার বিলিয়ন ডলারে। এটা যে কত বেশী পরিমাণ অর্থ, তা বোঝা যাবে যদি এর সাথে ১৯৭৯ সনের যুক্তরাষ্ট্রের গোটা অর্থ সরবরাহের পরিমাণের তুলনা করা যায় আর তা হলো মাত্র ৩৫০ বিলিয়ন ডলার। সমগ্র পৃথিবীর ভিত্তিতে দেখা যায় যে বর্তমানে সোভিয়েট ব্লক আর চীন ছাড়া অন্য সব দেশের মোট অর্থ সরবরাহের শতকরা ৪০–৫০ ভাগই হচ্ছে ইউরো ব্যাঙ্কের সৃষ্ট ঋণ, অথচ মাত্র দশ বছর আগেও এই পরিমাণটা ছিল অতি নগণ্য। অন্যভাবে বললে কথাটা দাঁড়ায়ঃ ইউরো–ব্যাংকের ঋণ সম্প্রসারণ

www.pathagar.com

দশবৎসরের মধ্যে পৃথিবীর মোট অর্থ-সরবরাহের পরিমাণটা একেবারে প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছে।

ইউরো ব্যাংক ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধির একটি কারণ হলো, যে সব দেশ নিজেরা তেল উৎপাদন করে না বা অতি সামান্য করে, তাদের তেল আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা। তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সচল রাখবার জন্য তেল দরকার। ওপেক (OPEC) যখন তেলের দাম বাড়ায়, তখন তাদের মূল্য পরিশোধের জন্য ঋণের প্রয়োজনঃ শুধু একটি প্রধান আমদানি দ্রব্যের দাম বেড়েছে বলেই তাদের রপ্তানীর দাম তো আর বাড়তে পারে না। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে শুধু এই জন্য অন্ততঃ পক্ষে বাৎসরিক ঋণ ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ঋণটা দেয়া হয় ডলারে, তার কারণ আংশিকভাবে এই যে ওপেক তাদের তেলের দাম ডলারেই স্থির করে, আর আংশিক কারণ এই যে ইউরোপের ব্যাংকগুলো তাদের নিজ নিজ মূদ্রায় কতটা ঋণ দিতে পারে তা তাদের প্রত্যেকের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সুইস ব্যাংকগুলো কতটা ঋণ সুইস ফ্র্যাংকে দিতে পারে, সুইস কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেটা নির্ধারিত করে দেয়, কিন্তু ডলারে তারা কি পরিমাণ ঋণ দেবে, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার ফল হয়েছে এই যে বিশ্বের টাকার বাজার মার্কিন ডলার দ্বারা প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। এর পরিণতি হলো মুদ্রাস্ফীতি ঋণের দ্বারা সৃষ্ট নতুন ডলারগুলো একই পরিমাণ তেলের দাম পরিশোধের জন্য ব্যয় হয়, তাতে উৎপাদনের মাত্রা একই থাকে, শুধু ক্রয়ের ব্যয় মাত্রাটাই বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই ঋণটা না থাকলে তেল আমদানীকারী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হ্রাস পেতো।

অতঃপর ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে আন্তর্জাতিক অর্থ এবং মুদ্রা-ব্যবস্থা একটি অস্থিতিশীলতার বল্গাহীন উৎসের সৃষ্টি করলো। এবার বিশ্বের মূদ্রা সরবরাহে এলোমেলো সম্প্রসারণ এবং সংকোচন ঘটা সম্ভব হয়ে উঠলো, আর্থিক নীতির দ্বারা যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক সংকট ইউরো ব্যাংক ব্যবস্থার এবং বিভিন্ন জাতির মূদ্রামানের ভাসমান বিনিময় হার (floating exchange rate) ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজেই এখন অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বড় বড় শিল্পোন্নত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ (যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম), এখন এমন এক অবস্থায় পড়লো যাতে অর্থনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের উপর তাদের প্রভাব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে বলে দেখতে পেলো।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী দেখা দিল, যখন স্বল্পোন্নত এলাকাগুলোতে শিল্পায়ন বিস্তার লাভ করলো। সেখানে পুঁজি সরবরাহ করা হলো উন্নত দেশ থেকে এবং অনুন্নত দেশের নিজস্ব পুঁজিও বিনিয়োগ করা হলো, শিল্পে, খনিতে আর বাণিজ্যিক ভিত্তির কৃষিতে—আর এই কাজের সহায়ক হলো আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলো এবং সরকারী সাহায্য কর্মসূচী। সম্প্রতি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মানুষদের মধ্যে একটা বড় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এই বিষয়ে যে এই উন্নয়নের ফলটা একান্তই আশানুরূপ হলো কি না— আর এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সবটুকু প্রয়োজনীয় তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু লাভটা সকল ক্ষেত্রে সমান হয়নি। অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশেই অল্প কিছু লোক অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠলো, যদিও সাধারণ মানুষ সেখানে নিতান্ত দরিদ্রই রইলো। এই অসম-উন্নয়ন ডেকে আনে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, যার উত্তরে প্রায়ই দেখা যায় দমননীতি— আর তাতে সৃষ্টি হয় অশান্তি। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই এ ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর গণতন্ত্র একসাথে টিকে থাকার সমস্যা দেখা দিয়েছে।

অধিকন্তু, অনেক স্বল্পোন্নত দেশই শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে তাদের আর্থিক সম্পর্কের কারণে সত্তরের দশকে এক তীব্র অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়। পঞ্চাশের আর ষাটের দশকে অনেক স্বল্পোন্নত দেশই তাদের শিল্পায়নের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহে অর্থ জোগানের জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন ব্রাজিল, সাফল্যজনকভাবে আরম্ভ করে এবং তাদের উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু কারো কারো বেলায় তা হয়নি, যেমন, ইজিপ্ট। এরা সকলেই বিদেশী ব্যাংক, সরকার বা আন্তর্জাতিক ঋণ দানকারী সংস্থাগুলোর কাছে ভারী রকম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত ঋণের অদক্ষ ব্যবহারের ফলে এই অবস্থায় আরো জটিলতার সৃষ্টি হয়, নিন্দা-পরিহাস করে যাকে বলা হয়ঃ "এক-তৃতীয়াংশ অপব্যয়, এক-তৃতীয়াংশ কলম জোড়ার (graft) ব্যয় আর এক-তৃতীয়াংশ উন্নয়নের জন্য", এর ফলে ঋণ পরিশোধ কঠিন হয়ে পড়েছে। আশা ছিল যে এই ঋণের দ্বারা যে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, তা বিদেশে রপ্তানী হবে (অথবা তা দিয়ে আমদানী হ্রাস করা যাবে), যার ফলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হবে। কিন্তু ঋণের অর্থ অদক্ষভাবে ব্যবহারের ফলে এবং নব্যধনী শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য বিপুল পরিমাণ বিদেশী সামগ্রী আমদানী ব্যয়ের ফলে বৈদেশিক দেনা-পাওনায় ঘাটতি দেখা দিল। সমস্যাটা আরো চরমে পৌছায় যখন ১৯৭০-এর দশকে ওপেক সম্মিলিত সংস্থা

www.pathagar.com

আমদানীকৃত তেলের মূল্য বিপুলভাবে বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন হ্রাস করে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে স্বল্পোন্নত দেশগুলো আর তাদের বিদেশী ঋণ শোধ করতে পারছে না এবং তাদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য মূদ্রাস্ফীতির আশ্রয় গ্রহণ করছে। আর্থিক দিক দিয়ে তাদের সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া রোধ করা গিয়েছে, ঐসব ঋণের পরিশোধ-সময় পূনর্বিবেচনার দ্বারা। বিদেশী ব্যাংকগুলো পরিশোধের সময় সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং কোন কোন বিদেশী সরকার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তাদের দেয়া ঋণ আংশিকভাবে মওকুফ করে দিয়েছে। এসব সমঝোতায় পৌছানো এবং দেউলিয়াত্ব এড়ানোর জন্য অধমর্ণ দেশগুলোকে মূদ্রাস্ফীতির হার এবং আমদানীর পরিমাণ হ্রাসে রাজী হতে হয়েছে। কিন্তু আমদানী হ্রাস সম্ভব হতে পারে, যদি আয় হ্রাস করা যায়। অর্থাৎ যদি সরকারী খাতের ব্যয় হ্রাস এবং কর বৃদ্ধি করা যায়। আজকের স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের অতীতের উন্নয়ন পরিকল্পনার খেসারত স্বরূপ যে মূল্য দিতে বলা হচ্ছে, তা হলো অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হ্রাস, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, আর অপেক্ষাকৃত নিচু জীবনধারণের মান। যেসব স্বল্পোন্নত দেশ সাফল্যের সাথে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালিযে যেতে পেরেছে (উদাহরণ স্বরূপ ব্রাজিল, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া) কিম্বা যারা প্রচুর তেল উৎপাদন করে (নাইজেরিয়া, মেক্সিকো) তাদের এই আর্থিক দুর্ভোগ নেই, কিন্তু অপর অনেক দেশই মুস্কিলের মধ্যে আছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মন্থর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নত দেশগুলোকেও প্রভাবিত করছে। যদি স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের আমদানী হ্রাস করে, তাহলে উন্নত দেশগুলোকেও তাদের রপ্তানী হ্রাস করতে হবে। অধিকন্তু তৃতীয় বিশ্বের সরকারসমূহের আর্থিক সমস্যা উন্নত দেশগুলির ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও বিপদগ্রস্ত করে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি হলো ভংগুর পারস্পরিক সম্পর্কের ঘনভাবে বোনা জালবিশেষ, যার যে কোন একটি খাতের অসুবিধা সাথে সাথে অন্যত্র সঞ্চালিত হয়েযায়।

আধুনিকীকরণ আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বৃদ্ধি করে। ফলে, উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা মজুরীর হার কমিয়ে আনে, যা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আকর্ষণ করে থাকে। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সেখানে পল্লীর উদ্বৃত্ত জন সমষ্টিকে শহরের বস্তিতে আসতে আকর্ষণ করে, সেখানে আবার দারিদ্র্য জন্মহার বৃদ্ধি করে, আর মজুরীর উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি হয়, আর সেই সুযোগে মালিক আর পরিচালকেরা ধনী হয়ে যায়। ইতিমধ্যে মানুষ

www.pathagar.com

শহরে যাওয়ার ফলে, খামারের কৃষকরা তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, অধিক শিশুর জন্ম দেয়, যেমনটা সব সময়ই ঘটছে। আধুনিকীকরণের এক দুষ্ট চক্র গড়ে ওঠে, যা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে পারে। এই ধরনটা ল্যাটিন আমেরিকা আর এশিয়ার বিপুল অংশে দেখা যায়, কিন্তু আফ্রিকায় তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়, কারণ, সেখানকার সামাজিক কাঠামোটা কৃষি-ভিত্তিক না হয়ে বরং উপজাতি ভিত্তিক। অবশ্য গোটা স্বল্পোন্নত পৃথিবীতেই সমতাহীন উন্নয়নের সমস্যা আরো তীব্র হয়েছে -কৃষির উৎপাদনে নিজের দেশে ব্যবহারের জন্য প্রধান খাদ্যগুলো উৎপাদনের বদলে চিনি বা কোকো জাতীয় রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনের ফলে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর আধুনিকীকরণ সম্ভবতঃ জনসংখ্যার চাপ আর দারিদ্র্য হ্রাসের বদলে তা বৃদ্ধিই করছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বেড়েই চলেছে। মাত্র দুই শত বৎসর আগে যা এক বিলিয়নের কম ছিল, ১৯৭৫ সনে সেটা এসে দাঁড়িয়েছে চার বিলিয়নে, আর যদি বাধা না দেয়া যায়, তবে সম্ভবতঃ আগামী পঞ্চাশ বৎসরে তা দশ বিলিয়ন অতিক্রম করে যাবে। অবশ্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাধাহীন থাকবে না। দুর্ভিক্ষ, রোগ এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধ একটা সীমাবদ্ধতা এনে দেবে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা এখন অনুমান করছে যে আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছয় থেকে সাত বিলিয়নে পৌঁছবে। এই মাত্রায়, আর খাদ্যের সরবরাহ যা ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়, তাতে পৃথিবীর মোট জন-সংখ্যার অর্ধেক প্রায় না খেয়ে থাকবে। অজন্মায় একবার খাদ্য সরবরাহে ভাটা পড়লে সার্বজনীন অনাহার শুরু হয়ে যেতে পারে আর তা থেকে বড় ধরনের রাজনৈতিক উৎক্ষেপ শুরু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা যে যুগে পদার্পণ করেছি, তাতে খাদ্য আর জনসংখ্যার মধ্যকার সম্পর্কটা একটি বড় রকমের ভাবনার বিষয় হয়ে পড়েছে।

আর একটি বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হলো সম্পদের উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের অসম বন্টন। পৃথিবীর মোট সম্পদের বেশীর ভাগটাই এখন ব্যবহার করছে তুলনামূলকভাবে প্রাচুর্য্য সম্পন্ন দেশগুলো যাদের জনসংখ্যা স্থিতিশীল আর জীবনধারণের মান ক্রমবর্ধমান। এরাই পৃথিবীর মোট সম্পত্তির বড় অংশটার মালিক আর পৃথিবীর মোট পুঁজিরও বেশীর ভাগই এদের নিয়ন্ত্রণে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জীবনধারণের মান অনেক নিচু এবং তাদের মাথা-প্রতি ভোগের পরিমাণ কম, কিন্তু তাদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী পঞ্চাশ বৎসরে

www.pathagar.com

যদি তারা জনসংখ্যার বৃদ্ধিটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়ও তবু তারা মাথা প্রতি ভোগের দিক দিয়ে সম্ভবতঃ কখনো সমৃদ্ধ দেশগুলোর সমান হতে পারবে না। ওটা সম্ভব করতে হলে যে পরিমাণ উৎপাদন উপকরণ (resources) প্রয়োজন হবে, গোটা পৃথিবীতে এখন তা নাই, অন্ততঃ এখন যে ধারায় ভোগ এবং সম্পদের ব্যবহার চলছে, সেদিক থেকে দেখলে কথাটা সত্য।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে একটা দল, অর্থাৎ তেল উৎপাদনকারীরা তাদের নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পেরেছে। আরব দেশগুলোর নেতৃত্ব সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে সস্তা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো প্রথমে তেল রপ্তানীকারক দেশগুলোর একটি প্রতিষ্ঠান (ওপেক) গঠন করলো। ওপেক গোড়ার দিকে বড় বড় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলোকে বাগে আনতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে আরব জাতিগুলো নিজেদের সহমনাদের সহ তেল উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে, তারপর তারা তেলের কোম্পানীগুলোর উপর উচ্চতর হারে রয়্যালটি আর কর ধার্য্য করে তেলের মূল্য নির্ধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে অগ্রসর হয়। শেষে, ১৯৭৩ সনে ইজিপ্ট এবং ইসরাইলের মধ্যকার যুদ্ধের সময়, আরব দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রে তেল সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং ওপেক তেলের দাম পাঁচগুণ বৃদ্ধি করে। ওপেক এবার একটি 'কার্টেলে' রূপান্তরিত হয়ে গেল, যা তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সনে প্রতিষ্ঠানটি ইরানের রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণে উৎপাদন হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করে আর একবার অনেকটা দাম বাড়িয়ে নেয়। যে তেল ১৯৭৩ সনে এক ব্যারেল মাত্র তিন ডলারে বিক্রি হচ্ছিল, দশকের শেষে তা থেকে আসতে লাগলো তিরিশ ডলার।

এই সব মূল্য বৃদ্ধির তাৎক্ষণিক ফল হলো এই যে, তেল আমদানীকারী দেশগুলোর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আয় তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোতে চলে গেল। এই লাভের মোটা অংশটা চলে গেল আরব প্রধান ব্যক্তিদের পরিবারের ব্যক্তিগত সৌভাগ্য হিসেবে, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আর আরব দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পৃথিবীর ঐ অঞ্চলটার অস্ত্র প্রতিযোগিতার ইন্ধন হিসেবে। লাভের একটা অংশ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে নব্যধনী আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে ঋণ হিসেবে চলে গিয়েছে। কিন্তু তেল আমদানিকারী স্বল্পোন্নত দেশগুলো এই ব্যবস্থার ফলে খুব মুস্কিলে পড়ে, যেমন, পাকিস্তান,

www.pathagar.com

ভারত এবং আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ। শিল্পোন্নত দেশগুলোও গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, কিছুটা তাৎক্ষণিক অভাবের জন্য, আর পরবর্তী মূল্য বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতিতে অত্যধিক সহায়ক হয়েছে, প্রথমতঃ শক্তির মূল্য বৃদ্ধির কারণে, এবং দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের অর্থের সরবরাহে বিপুল সম্প্রসারণ ঘটিয়ে। তবুও ভাগ্যের পরিহাস যে সেই ওপেকের নেতৃবৃন্দই যুক্তি দেখালেন, তেলের মূল্য অবিরাম বৃদ্ধির দরকার ছিল এজন্য যে তাদের কেনবার মত সব জিনিসেরই দাম বেড়ে চলেছিল।

সত্তরের দশকে বিশ্ব-অর্থনীতি মুস্কিলে পড়েঃ নিয়ন্ত্রণহীন একটি ইউরো ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থার বিকাশ, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ঋণ পরিশোধ প্রশ্নের দ্বারা আরো জটিল হওয়া, অবিরাম জন-সংখ্যার প্রবৃদ্ধিতে অনেক এলাকাতেই দৃশ্যতঃ ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা-ফাঁদ' গড়ে ওঠা, আর ওপেকের তেলের মূল্য এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ধ্বংসকারী প্রতিক্রিয়া, এই সবই নির্দেশ করছিলো যে একত্রিভূত বিশ্ব-ব্যবস্থাটা এবার খতম হতে চলেছে। পঞ্চাশের আর ষাটের দশকে বিশ্ব বাণিজ্য আর স্থিতিশীল আর্থিক সম্পর্কের কারণে যে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ছিল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের উৎস, সে ক্ষেত্রে ১৯৭০-এর দশকে এটাই হয়ে উঠলো অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার একটি উৎস।

মতবাদের সংঘাত এবং সামরিক ব্যয়

বিপুল পরিমাণ সামরিক ব্যয়ও বিশ্ব-অর্থনীতির সমস্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। পৃথিবীটাকে পুঁজিবাদী আর সাম্যবাদী ব্লকে ভাগ করা, যার একটির নেতৃত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, অপরটির সোভিয়েট ইউনিয়ন, এর ফলেও সামরিক তথা রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক রেষারেষি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরোধী পক্ষের প্রভাব-সীমার বিস্তার রোধনীতির (Policy of Containment) দ্বারা আমেরিকা চেষ্টা করেছে পৃথিবীর যতটা অংশ সম্ভব, সাম্যবাদী প্রভাবের বাহিরে রাখতে, যার ফলে অকমিউনিস্ট এলাকাগুলোর সাথে বাণিজ্য আর বিনিয়োগ সম্ভাবনা খোলা রাখা সম্ভবপর হয়েছে। এই ভাবে 'বিস্তার রোধ-নীতি' দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে সমৃদ্ধির এক মহান যুগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। 'বিস্তার রোধ-নীতি' আর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রেষারেষি যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন এই উভয় দেশেই বিপুল পরিমাণ

www.pathagar.com

সামরিক ব্যয় ডেকে এনেছে, যার আনুষঙ্গিক হিসেবে এসেছে আণবিক অস্ত্র, মিসাইল আর সেগুলোর সহায়ক ইলেক্ট্রোনিক যন্ত্রপাতির উন্নয়ন। নতুন অস্ত্রপাতি প্রচুর প্রকৌশলিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে, যা সকল শিল্পোন্নত জাতির জন্যই বিনিয়োগ আর উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা জুগিয়েছে, আর বর্ধিত সামরিক ব্যয় মোট চাহিদার পরিমাণকে উচ্চ পর্যায়ে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে, যার ফলে গোটা ১৯৫০-এর এবং ১৯৬০ দশকে এসেছিল সমৃদ্ধি আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এই দিক দিয়ে শিল্পোন্নত অর্থনীতিগুলোকে সামরিক ব্যয় নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে। অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রে বিপুল সামরিক ব্যয় তাদের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধা দিয়েছে, আর জনগণের জীবনধারণের মানটা যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে না পারা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্র চালু রাখতে বাধ্য করেছে-- যা আন্তর্জাতিক রেষারেষি আর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিরোধে ইন্ধন জুগিয়েছে।

কিন্তু, এমন কি ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতিতেও সামরিক ব্যয়ের দুটি ভিন্ন চেহারা আছেঃ অস্ত্রের ব্যবহার ধ্বংসের কাজে, মানুষের কল্যাণের জন্য নয়; আর একালের অস্ত্র অল্পদিন পরেই অচল হয়ে পড়ে। শ্রম আর সম্পদকে ভোগ্যপণ্য বা ভবিষ্যতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন উৎপাদনের বদলে অস্ত্র উৎপাদনে ব্যয় করাটা সর্বদাই অপব্যয়। রাজনৈতিক স্বার্থে এটার প্রয়োজন বোধ হতে পারে বটে, কিন্তু এ কাজের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি হয় না। সেই জন্যই সকল মতের অর্থনীতিবিদরাই যুদ্ধের চেয়ে শান্তিই পছন্দ করে ঃ সম্পদ যদি বন্দুক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা মাখন আর লাঙ্গলের ফাল-এর যে কোনটার উৎপাদনের জন্য কম পাওয়া যাবে।

অপর দিকে অস্ত্রের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়, কিন্তু অস্ত্রগুলো এসে সেই ক্রয় ক্ষমতাটা তো আর চুষে নিতে পারে না। অর্থনীতি যখন পূর্ণ বা প্রায় পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করছে, সেই পরিস্থিতিতে যদি অস্ত্র নির্মাণ বৃদ্ধি করা হয়, তার ফল হয় মুদ্রাস্ফীতিঃ ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিক্রির জন্য সরবরাহকৃত জিনিসের পরিমাণ ততটাই কমে যায়, যে অনুপাতে উৎপাদন ক্ষমতা বেসামরিক খাত থেকে সামরিক খাতে সরিয়ে নেয়া হয়।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ বিশেষভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। যাতে একটা অপ্রিয় যুদ্ধ আরো অপ্রিয় হয়ে না উঠে, সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার চেষ্টা করেছিল, যতটা সম্ভব কর বৃদ্ধি না করেই যুদ্ধের খরচ জোগাতে। উৎপাদন সামরিক খাতে

www.pathagar.com

সরিয়ে নেবার জন্য, বিপুল পরিমাণ বাজেট ঘাটতি এবং টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। মুদ্রাস্ফীতির সাথে বিদেশে বিপুল পরিমাণ সামরিক ব্যয় ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক লেন-দেনে বিরাট ঘাটতি সৃষ্টি করে। ব্যয়ের এই ঘাটতির ফলে বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার বিশ্বের টাকার বাজারে ছড়িয়ে পড়ে, আর তা থেকে তিনটি ফল দেখা দেয় ঃ এর সাহায্যে ইউরো-ব্যাংক ঋণ অনেকটা সম্প্রসারিত হয়, যা আগেই বলা হয়েছে এবং যার ফলে বিশ্বের মুদ্রাস্ফীতি জোরদার হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ এর ফলে ডলারের অবমূল্যায়ন (devaluation) করতে হয়েছে, যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে, এবং তৃতীয়তঃ এটা বৃটন উড্‌স্ সৃষ্ট স্থিতিশীল বিনিময় হারের ব্যবস্থাটা নষ্ট করতে সহায়ক হয়েছে। সত্তরের দশকের শুরুতে সামরিক পরাজয় আর যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি মার খাওয়ায় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি যুগ শেষ হয়ে যায়, আর সে অর্থনীতির ধ্বংসাবশেষ চারদিকেই ছড়িয়ে আছে। *

তিনটি চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম, তা হলো 'বৃহৎ অর্থনীতির' প্রসংগে সাম্প্রতিক অর্থনীতির সংকটের কয়েকটি দিক ঃ বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি, প্রবৃদ্ধি আর প্রকৌশলিক পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক কাঠামোর কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্তনশীল একটি আন্তর্জাতিক এবং আর্থিক ব্যবস্থা এবং জঙ্গীবাদের সৃষ্ট বিকৃতিসমূহ। এক পরিবর্তনশীল দুনিয়া যে নতুন সমস্যাবলী নিয়ে এলা, তার ব্যাপ্তি আর প্রকৃতি কেইন্‌সীয় তত্ত্ব--আর নীতির সনাতন কাঠামোকে অতিক্রম করে গেল।

নিওক্লাসিক্যাল 'বৃহৎ অর্থনীতি'ও মুসিবতের মধ্যেই ছিল, কিন্তু তাদের অসুবিধাটা ছিল অধিকাংশই তাত্ত্বিক আর ধারণা বিষয়ক (theoretical and conceptual) সমস্যা নিয়ে। নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের নিজেদের রচিত প্রায় তাত্ত্বিক প্রকৃতির কতকগুলো জটিল বিশ্লেষণ, যা প্রায়ই অত্যন্ত নির্বস্তুক এবং গাণিতিক (abstract and mathematical)- অর্থনীতির প্রধান ধারার ধারণা-ভিত্তিকেই অকেজো করে দিচ্ছিল।

---

* এমন কি যথেষ্ট কর বৃদ্ধি করেও এই মুদ্রাস্ফীতির চাপ এড়ানো সম্ভব নয়। ট্যাক্সের আদায়কৃত অর্থ সাথে সাথে খরচ করা হয়, যার ফলে ক্রয় ক্ষমতা ক্রেতার হাতে ফিরে যায়, অথচ সামরিক কাজের জন্য উৎপাদন ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়া চলতেই থাকে।

www.pathagar.com

কেইনস্ পরবর্তী সংশ্লেষণের প্রধান কথাটা এই যে প্রবৃদ্ধিকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ মাত্রায় বজায় রাখা গেলে বেসরকারী খাত মোটামুটি যুক্তিসংগত দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবে। ভোক্তারা তাদের কল্যাণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবার তাগিদে, আর উৎপাদনকারীরা তাদের মুনাফা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবার তাগিদে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে এমন একটি উৎপাদনের ধরন প্রতিষ্ঠিত করবে যা ভোক্তা আর উৎপাদনকারী উভয়কেই পরিতৃপ্ত করতে পারবে। এই প্রক্রিয়া থেকে উৎপাদনে ব্যক্তির অবদানের ভিত্তিতে এমনভাবে আয় সমজের মধ্যে বন্টন হয়ে যাবে, যা সকলের পক্ষেই ন্যায়সংগত হবে। বাজারকে কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতামূলক থাকতে হবে এবং জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে কিছু কিছু সরকারী ব্যয়েরও প্রয়োজন হবে, কিন্তু মোটের উপর এটা আশা করা যায় যে খোলা বাজারে উৎপাদনকারী আর ভোক্তার যুক্তিসংগত লেন-দেনের মাধ্যমে অর্থনীতি ক্রমশঃ একটি সন্তোষজনক 'শ্রেষ্ঠ অবস্থান' বা ভারসাম্য অবস্থার দিকে যেতে থাকবে। এটাই ছিল স্বপ্ন, আর তত্ত্বের সাথে বেমিল কিছু কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সত্ত্বেও তা বজায় রাখাই হচ্ছিল ঃ বড় ব্যবসায়িদের বাজার-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যৌথ দর-কষাকষির মাধ্যমে মজুরী নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপনের বাবত বিপুল ব্যয় আর উচ্চমাত্রার সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া। ধরে নেয়া হচ্ছিল যে আধুনিক অর্থনীতির এই সব উপাদান স্ব-নিয়ন্ত্রিত বাজারে যেসব অর্থনৈতিক শক্তি কাজ করছে, তার বিশ্লেষণে সামান্যই পরিবর্তন আনে।

যাই হোক, ১৯৬০-এর দশকে তিনটে নতুন চিন্তাধারার প্রাধান্য লাভের ফলে এই নিওক্লাসিক্যাল স্বপ্নটা উবে যেতে শুরু করলো ঃ অনিশ্চয়তার বিশ্লেষণ (Analysis of Uncertainty), দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সমাধানের তত্ত্ব (The Theory of Second Best Solution) এবং সামাজিক পছন্দের তত্ত্ব (The Theory of Social Choice) এগুলোর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, যদিও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য ছিল শুধু বাজার সমন্বয় তত্ত্বকে আরো কিছু ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা, কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে এর সিদ্ধান্তগুলো ঐ তত্ত্বটাকেই অকেজো প্রমাণ করে দিচ্ছে। সর্বোচ্চ কল্যাণদায়ক চূড়ান্ত ভারসাম্যমূলক (equilibrium) সমাধানের বদলে এই সব নতুন অনুসন্ধানের দ্বারা চূড়ান্ত নয় (indeterminate) এমন সব সমাধান পাওয়া যেতে লাগলো, অতএব, এই বিজ্ঞানের গোড়ায় সেসব সংজ্ঞা (assumptions) ছিল সেগুলোর যৌক্তিকতা (validity) সম্পর্কেই রীতিমত প্রশ্ন উঠে পড়লো।

www.pathagar.com

প্রমাণ ১ ঃ (অনিশ্চয়তায় বিশ্লেষণ) ১৯২০-এর দশকেই কোন কোন নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ 'অনিশ্চয়তার' সমস্যা নিয়ে ভাবা গোনা শুরু করে। যেহেতু ভোক্তা আর উৎপাদনকারীদের পছন্দের জন্য যতগুলো বিকল্প খোলা আছে, সে বিষয়ে তাদের পূর্ণ তথ্য জানা নাই, আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানা থাকা তো অসম্ভবই, তা হলে একটা যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছানো কেমন করে সম্ভব? এই প্রশ্ন নিয়ে প্রথম যারা চিন্তা করেন, তাঁদের মধ্যে একজন ফ্রাংক এইচ. নাইট (১৮৮৫-১৯৭২)। তিনি 'রিস্ক, আনসার্টেনটি অ্যাণ্ড প্রফিট' (১৯২১) নামক গ্রন্থে বলেন যে ঝুঁকির অর্থ এই যে ঘটনাটা ঘটা বা না ঘটার সম্ভাব্যতা (probability) আছে, এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার একটা পরিমাপ করা যায়। তা হলে বীমার মতই, একটা ঝুঁকির অর্থনৈতিক ব্যয়টাও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্যবহৃত ব্যয়-সম্পর্কের সাথে জুড়ে দেয়া যেতে পারে। অতঃপর নাইট যুক্তি দেখালেন যে 'মুনাফা' হচ্ছে ব্যবসায়ের অন্তর্নিহিত ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রাপ্ত অর্থনৈতিক পুরস্কার। অপরপক্ষে অনিশ্চয়তা (যা ঝুঁকি থেকে ভিন্ন) সৃষ্টি হচ্ছে এমন কতকগুলো অদ্বিতীয় (unique) ঘটনার উপস্থিতির দ্বারা, যেগুলোর 'সম্ভাব্যতা' (এবং ব্যয়) সাথে সাথে হিসাব করা যাচ্ছে না, অথবা যে বিষয়ে কোন খবর আমাদের জানা নাই, বা যেসব এলোমেলো ঘটনা (random events) আসছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাহিরের কোন উৎস থেকে। "খাঁটি অনিশ্চয়তা" (true uncertainty) অর্থনৈতিক ঘটনাবলীতে 'অনির্ণেয়তা' (indeterminateness) এনে দেয়।

নাইট্-এর এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রধান প্রবাহে শুধু আংশিক স্বীকৃতি লাভ করে। 'ঝুঁকি' সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা বাজার ভারসাম্যের নিশ্চিত (determinate) ভাবে নির্ধারিত হওয়ার তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু 'অনিশ্চয়তা' সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা মোটের উপর উপেক্ষাই করা হয়, আর শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে এসে অর্থনীতিবিদরা 'অনিশ্চিত' অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের (decision making) সমস্যাটা পূনর্বিবেচনা করতে শুরু করলো, এবং ক্রমান্বয়ে অধিক জটিল সমস্যা নিয়ে অনুশীলন করলো। প্রথমতঃ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার অর্থ এই যে ভবিষ্যতে কোন একটা ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনাটা এক এক লোক এক এক রকম হবে বলে স্থির করছে। আর কোন কোন ঘটনা মাত্র একবারই ঘটে, যেমন জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি বেছে নেয়া বা ব্যবসার একটা লাইন পছন্দ করা; আর, যদি কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকে তবে ভবিষ্যতের ফল কেমন হবে সেটা লোকে

www.pathagar.com

কিভাবে স্থির করবে? সব শেষে মনে করা যাক একেবারে নির্জলা ভাগ্য-নির্ধারিত এলোমেলোভাবে কোন কিছু ঘটাই যদি মানুষের অভিজ্ঞতার একটা উল্লেখযোগ্য উপাদান বলে মনে হয়; তা হলে এর ফল কি হবে? ষাটের দশকের শেষ অবধি অর্থনীতি শাস্ত্রের তাত্ত্বিকগণ ঐ সমস্যাগুলোর প্রথমটা থেকে শেষটা পর্যন্ত অনুশীলন করলো, আর কিছুটা পরীক্ষামূলকভাবে হলেও আকর্ষণীয় সব সিদ্ধান্তে পৌছালো। "আত্মবাদী সম্ভাব্যতা' (subjective probability) - অর্থাৎ এক এক লোকের দ্বারা এক এক রকম মূল্যায়ণ -এটা তাত্ত্বিক দিক থেকে কোন বড় সমস্যা নয়। কথাটার সোজা অর্থ এই দাঁড়ায় যে যেহেতু অবস্থার ওলট পালট বা পরিবর্তন ঘটতে পারে, তাই সিদ্ধান্তগুলোও সহজেই পরিবর্তন করা যায় (flexible), এমন রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে নাইট্-এর সমাধানটা শুধু ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যেসব সিদ্ধান্ত একবার করলে তা আর বদল করা সম্ভব হবে না, সেগুলোর সাথে একত্রে মিশালে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে সহজেই মারাত্মক ভুল সম্ভব। অর্থনীতির ভাষায়, প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সর্বোত্তম-কল্যাণদায়ক ফলাফলটা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। আর যে ক্ষেত্রে 'নিরেট দৈবঘটনার' (pure chance) সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন (লুডুর) ছক্কা ফেলা বা 'এলামেলো হেঁটে যাওয়া,' সেসব ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এমন কি একটা আদর্শ প্রতিযোগিতামূলক স্ব-নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থাতেও কোন কিছুর মূল্য, পরিমাণ বা অন্যান্য ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এটা হলো নিওক্লাসিক্যাল মডেলের একেবারে কেন্দ্রে উপস্থাপিত একটা সময়-বোমা (time bomb) স্বরূপ, যার সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছেঃ যদি দুনিয়ার ঘটনাবলিকে 'এলোমেলো ব্যাপার' (random events) প্রভাবিত করতেই পারে, তাহলে তো এটাও আশা করা যায় যে কল্যাণ সর্বোত্তম পর্যায়ে পৌছাতে নাও পারে, আর এটাও সম্ভব যে শুধু এলামেলো পরিবর্তন ছাড়া আর কোন ফল অর্জিতও না হতে পারে। অবশ্য যুক্তি দিয়ে দাবী করা যায় যে বাস্তব জগতের ঘটনাবলির পরিণতি নিশ্চিত ব্যাপারঃ যেমন জিনিসের একটা দাম থাকে, উৎপাদন বা আয় একটা বিশেষ পরিমাণে ঘটে থাকে, যা বাজারের শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু 'অনিশ্চয়তা'র আর দৈবের প্রভাব বিষয়ক এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ যদি আংশিকভাবেও সত্য হয়, তাহলে আমরা আর দাবী করতে পারি না যে সবচেয়ে ভাল (optimal result) ফলাফলটাই বাস্তবে ঘটবে। তাহলে বলতেই হবে যে 'নিরেট দৈবঘটনা'র প্রভাবে পড়ে এসব ফলাফল এমনও হতে পারে যে তা কাম্য বা উপকারী কোনটাই নয়।

www.pathagar.com

উপরে যেসব আলোচনা হলো তা যদি একান্তই তাত্ত্বিক কচ্‌কচি এবং দৈনন্দিন পৃথিবীর ব্যাপারে অপ্রাসংগিক বলে মনে হয়, তাহলে একটু ভেবে দেখুন, গত পঁচিশ বৎসরের যেসব অশান্তিকর ঘটনা ঘটেছে, আর নীতি নির্ধারকরা তা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যেসব চেষ্টা করেছে, এই পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি– আর সেসবের ফল কি হয়েছে তাও আমরা দেখেছি। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী, যেখানে দুটি মহাযুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি, মন্দা, গণহত্যা, অসামরিক বন্দী শিবির, রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ এবং স্বৈরাচারী উৎপীড়ন ঘটেছে এবং ঘটছে, এর সাথে সেই দুনিয়ার সামান্যই মিল আছে, যেখানে সর্বোত্তম কল্যাণের পথ হিসেবে জোর দেয়া হয়েছে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন অর্থবহ ব্যবহার বিধির উপর। ঘটনা আর চিন্তাধারার এই পরিবেশে যে তত্ত্বে জোর দেয়া হচ্ছে মানবিক বিষয়াবলীতে দৈবঘটনা আর অনিশ্চয়তার উপর, আর ফলে যে নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটলো, তাতে এটাই বোঝা যায় যে 'অর্থনৈতিক তত্ত্ব' নামক শাস্ত্রটাই সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের (General equilibrium Theory) স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির (mechanistic determinism) দৃষ্টিকোণের বদলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণের দিকে সরে যাচ্ছে।

প্রমাণ ২ঃ (দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সমাধান) নিওক্লাসিক্যাল মডেলের আরো সমস্যা আছে। তত্ত্বে যেসব অবস্থা ধরে নেয়া হয়, তা থেকে বাস্তব জগতের অবস্থাগুলো একেবারেই ভিন্ন। তাই বাস্তব জগতের ফলাফলও তত্ত্ব নির্দেশিত সিদ্ধান্ত থেকে আলাদা হয়েছে বলে দেখা যাবে। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা সাধারণতঃ প্রতিপাদ্য হিসেবে এটাই মেনে নিতে চেয়েছে যে তত্ত্ব থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলো বাস্তব জগতের অবস্থার কাছাকাছি থাকে, যদি তাত্ত্বিক মডেলটা বাস্তবের প্রায় কাছাকাছিই থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, আশা করা গিয়েছিল যে ট্রাস্ট–বিরোধী আইনগুলো প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে আরো ভালভাবে কাজ করতে দেবে, এবং জনসেবামূলক (public utility) শিল্পের নিয়ন্ত্রণ তাদের এমনভাবে চালাবে, যেন তারা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থাতেই কাজ করছে।

এখন আমরা জানি যে এই সহজ অনুমানটা আসলে সত্য নয়। তত্ত্ববিদরা সর্বোত্তম–সমাধান অবস্থার চেয়ে কম (less than optimal solution) প্রকৃতির ঘটনাগুলো পরীক্ষা করে একটা "দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সমাধানের সাধারণ সূত্র" (General Theory of Second best) প্রতিষ্ঠা করে, যা সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যায়ঃ

www.pathagar.com

"একটি জটিল আর পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত অর্থনীতিতে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন (perfect competitive) বলে ধরে নেয়া বাজার ব্যবস্থা থেকে কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তাহলে বাস্তব ফলাফল সর্বোত্তম সমাধানের (optimal solution) চেয়ে কম হবে। সে ফলাফল 'সর্বোত্তম' থেকে কতটা ভিন্ন হবে তা অবশ্য জানার কোন উপায় নাই অর্থাৎ, ধরে নেয়া শর্তগুলোর (assumptions) থেকে সামান্য ব্যতিক্রমই ফলাফলে অনেকটা পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। অধিকন্তু, ফলাফল অপেক্ষাকৃত ভাল করবার জন্য যদি অন্যান্য শর্তগুলোতে (other conditons) পরিবর্তন করা যায়, তাতে ফল ভিন্ন হবে বটে, কিন্তু বলা যাবে না যে তা ঐ সর্বোত্তমের (optimum) থেকে আগের মতই দূরে রইল, তার কাছে এলো, না আরো দূরে সরে গেল।"

অন্যভাবে বললে কথাটা দাঁড়ায় : যদি আমাদের বর্তমান অবস্থান 'ক' হয়, যা আদর্শ 'খ' থেকে দূরে। এখন আমরা 'খ' এর কাছে যেতে চেষ্টা করছি, এবং এই ত্রুটিপূর্ণ দুনিয়ায়, শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হলাম 'গ' বিন্দুতে। কিন্তু একবার সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে আর বুঝবার উপায় নাই যে 'গ' 'খ'-এর থেকে কাছে না দূরে।

জনসেবামূলক শিল্পের নিয়ন্ত্রণ থেকে একটা উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো মনে হবে যে একটি জনসেবা (public utility) প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া ক্ষমতা এবং মুনাফা যদি সরকার নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হবে, বিশেষ করে ভোক্তারা এর ফলে কম দামে সেবা পাবে। কিন্তু একটু থামুন, অত তাড়াতাড়ি যাবেন না। সে ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক ঐ শিল্পে (বা সেবায়) যদি মুনাফা হ্রাস করা হয়, তাহলে ঐ শিল্পের খাতে কেউ পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাইবে না, যার ফলে সেখানে সেবার মান নিচু হয়ে যাবে, আর তাতে দীর্ঘমেয়াদে দেখা যাবে যে ভোক্তাদের বরং ক্ষতিই হয়েছে। যেহেতু 'সর্বোত্তম' সমাধানটা (best solution) (সব শিল্পকে প্রতিযোগিতা পূর্ণ করে তোলা) সম্ভব হলো না, তাই 'দ্বিতীয় সর্বোত্তম' (second best solution) সমাধান (একটি খাতে প্রতিযেগিতার পুনরায়োজন) চেষ্টা করা হলো, কিন্তু তার ফল আগের অবস্থার চেয়ে বরং আরো খারাপ হতে পারে। এই উদাহরণে, মূল্য হ্রাস পেলো বটে, কিন্তু সেবার মান নিচু হয়ে গিয়েছে।

এটাও যদি যথেষ্ট মনে না করেন, তাহলে এবারে 'অনিশ্চয়তা'র বিশ্লেষণে পাওয়া সিদ্ধান্তের সাথে 'দ্বিতীয় সর্বোত্তম' তত্ত্বের ফলটা এক সাথে মিলিয়ে

www.pathagar.com

দেখুন ঃ নিছক দৈবের ঘটানো ফলটা দেখা যায়, সচেষ্ট যুক্তিপূর্ণ নির্বাচনের দ্বারা পাওয়া ফলের চেয়ে হয়ত ভালোও হতে পারে, তা ছাড়া, ঐ দুটি ফলের মধ্যে কোনটা শ্রেয়, তাও নির্ধারণ করা সম্ভবপর না হতে পারে। এই ত্রুটিপূর্ণ পৃথিবী, যেখানে সকল সমাধানই হলো' দ্বিতীয় সর্বোত্তম' সেখানে আমরা এটা আর দাবী করতে পারি না যে স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার অবাধ ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট ফলটা আদৌ কাম্য। এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বড়ই কম।

প্রমাণ ৩ ঃ (সামাজিক পছন্দের তত্ত্ব) অর্থনীতির প্রধান ধারায় সরকারী খাতের ব্যয়কে সর্বদাই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাধারণ মডেলের মধ্যে এটাকে নিয়ে আসতেও বিশেষ অসুবিধা হয়নি, যেহেতু কোন কাজের লাভ এবং ব্যয় (benefits and cost) তুলনা করে একটা যুক্তিপূর্ণ সামাজিক পছন্দের সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। যদি লাভটা ব্যয়ের চেয়ে বেশী থাকে, তাহলে ব্যয় বাড়ানো চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্ধিত লাভ বর্ধিত ব্যয়ের সমান হয়ে যায়। ভোট দাতাগণ অথবা তাদের প্রতিনিধিরা সরকারের পক্ষে হয়ে এই পছন্দগুলো করবে, যেমন ক্রেতারা পছন্দ (choice) করে থাকে তাদের ব্যক্তিগত ব্যয়ের বেলায়। এ প্রক্রিয়াটা যদিও খুব সহজ নয়, তবুও এর মূল নীতিটা মোটামুটি বোধগম্য।

তারপর ১৯৫১ সনে আসলো কেনেথ. জে. অ্যারো লিখিত সেই বোমার মত ধ্বংসকারী গ্রন্থ, 'সোসাল চয়েস্ অ্যাণ্ড ইণ্ডিভিজুয়াল ভ্যালুজ'–যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়টা পরবর্তী সময়ে অ্যারোর অসম্ভবতার তত্ত্ব' (Arrow's Impossibility Theorem) নামে পরিচিত হয়। তাত্ত্বিক যুক্তিজাল থেকে মুক্ত করে সহজ ভাবে বল্‌লে কথাটা নিম্নরূপ ঃ

"যদি দুইয়ের অধিক মৌলিকভাবে পৃথক মতাদর্শ থাকে, যেগুলোর কোন একটাই সংখ্যাগুরুর (majority) সমর্থনলাভ করতে পারেনি আর বিকল্প কর্ম–নীতিও যদি দুইয়ের অধিক থাকে, তেমন ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু লোকের জন্য সন্তুষ্টিকর একটা সিদ্ধান্ত বের করা মনে হয় একটা অসম্ভব ব্যাপার।"

সহজ একটা উদাহরণ নিয়ে মনে করা যাক, দেশে ক, খ এবং গ তিনটি পৃথক এবং সমান আকারের দল রয়েছে, আর কর্মনীতির বিকল্পও (policy alternatives) রয়েছে তিনটি, প, ফ, ব, যেগুলোর বিষয়ে প্রত্যেক দলেরই পছন্দের–ক্রম ভিন্ন রকম। নিচের তালিকায় তিনটি দলের (group) পছন্দের–ক্রম দেখানো হলো ঃ

www.pathagar.com

	দল	দল	দল
	ক	খ	গ
প্রথম পছন্দ	প	ফ	ব
দ্বিতীয় পছন্দ	ফ	ব	প
তৃতীয় পছন্দ	ব	প	ফ

অর্থাৎ 'ক' নামক দল 'ফ' এবং 'ব' এর চেয়ে 'প' নীতিই অধিক পছন্দ করে, ইত্যাদি। এই পছন্দের তালিকাটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে যদি 'প' নামক নীতিটি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে 'খ' এবং 'গ' দল একত্রে 'ব' নীতির পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবে। আবার যদি 'ব' নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করা যায়, তবে 'ক' এবং 'গ' দল একত্রে 'প' পছন্দ করবে, আর সেটাও আমাদের হাজির করবে আবার সেই গোড়ার অস্থায়ী অবস্থানে। হয় কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তেই পৌছানো যাবে না, নয় তো কোন বাহিরের কর্তৃপক্ষের দ্বারা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের আপত্তি থেকেই যাবে।

অ্যারোর ধাঁধা এক দীর্ঘ বিতর্ক এবং পরবর্তী ব্যাপক বিশ্লেষণের সূত্রপাত করে। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে যদি দল মাত্র দুটিই থাকে এবং পছন্দ করার জন্য যদি দুটিই বিকল্প থাকে, তবেই একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছনো সম্ভব, যা থেকে বোঝা যায় যে মার্কিন দুই–দলীয় ব্যবস্থা এবং যে কোন একটি আইন প্রণয়নের বিষয়ে 'হাঁ' 'না' ভোটের প্রচলনটা বাস্তব ভিত্তিক। আর যদি ভোটদাতাদের মধ্যে কোন মতাদর্শগত পার্থক্য না থাকে তবে কোন সমস্যাই থাকে না। কিন্তু একালের যৌগিক শিল্পোন্নত সমাজে পছন্দ করবার মত জটিল সব বিকল্প যেখানে রয়েছে, তেমন অবস্থায় বহু দল সমষ্টি হওয়া সম্ভব। অ্যারোর মূল বক্তব্যটা এখনো সত্য এবং সামাজিক পছন্দ সম্পর্কে প্রাচীন নিওক্লাসিক্যাল সিদ্ধান্তগুলো এখন আর অভ্রান্ত বলা চলে না ঃ জটিল শিল্পোন্নত পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এখন আর যুক্তিসংগত সামাজিক পছন্দ বলে কিছু থাকা সম্ভব নাও হতে পারে।

একটি নতুন দৃষ্টান্ত ?

বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষে আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্র বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। বহুবিধ সমস্যা একই সাথে কর্মহীনতা আর ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, তুলনামূলকভাবে একটা মন্দা অবস্থা, দূষিত পরিবেশ, জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি আর

www.pathagar.com

হ্রাসমান খাদ্য সরবরাহ এবং সেই সাথে একটি অস্থির আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, মনে হয় যেন এসব আজ অর্থনীতির পরিচিত বিশ্লেষণ পদ্ধতি আর সনাতন কর্মনীতির নাগালের বাহিরে। অর্থনীতি যেসব নানাবিধ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপক আকারের সমস্যায় জর্জরিত, তার বিশ্লেষণে এবং সমাধানে সেই স্ব-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি এবং সহায়ক সরকারী কর্মসূচী আর খুব একটা প্রাসংগিক বলে মনে হলো না।

নতুন সমস্যা আর পুরনো তত্ত্বের এমন সন্ধিক্ষণে, মানুষ যখন অপেক্ষাকৃত ভাল সমাধান খোঁজে, তখনই উদ্ভব হয় নতুন চিন্তাধারার। আজকের দিনও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৬০-এর দশকে একটি নতুন দৃষ্টিভংগির এবং আধুনিক অর্থনীতিকে বুঝবার একটি নতুন পন্থার উদ্ভব হয়েছে আর ১৯৭০-এর দশকে তা আরো জোরদার হয়েছে।

এই নতুন পন্থাটাকে ইংল্যান্ডে বলা হয় 'নিও-কেইনসীয়' (neo Keynesian) এবং যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় 'কেইনস্ পরবর্তী' (post Keynesian) পন্থা।

কেইন্‌সের থেকে এতে নেয়া হয়েছে একালের ব্যক্তিক অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার উপর গুরুত্ব দেয়া এবং অর্থনৈতিক আচারের পরিবেশে অনিশ্চয়তার আলামত। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা বা অনুমানটা যে বিনিয়োগের মাত্রাকে নিতান্তই পরিবর্তনশীল করে তুলেছে, সেই বৈশিষ্ট্যের উপর এতে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বিনিয়োগের সিদ্ধান্তটা বর্তমানেই নিতে হবে বটে কিন্তু মূলধন প্রকৃতির যন্ত্রপাতি দীর্ঘস্থায়ী স্বভাবের হয়ে থাকে, তাই এ থেকে কি হারে মুনাফা আসবে সেটা কিছুতেই নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশা যখন পরিবর্তিত হয়, (আর তা অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল ভাবে পরিবর্তিত হয়), তাই বিনিয়োগের সিদ্ধান্তেও যথেষ্ট উঠা-নামা ঘটে যার ফলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রায় পর্যাপ্ত দোলন সৃষ্টি হয়।

এই কেইনসীয় ভিত্তির উপর যোগ হয়েছে পোলিশ মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ মাইকেল কালেৎস্কীর (১৮৯৯-১৯৭০) কতকগুলো মৌলিক চিন্তাধারা। তিরিশের আর চল্লিশের দশকে কালেৎস্কী (Michael Kalecki) যে বিশ্লেষণ করেন, তাতে বৃহৎ-অর্থনীতির (macro-economics) অর্থনৈতিক কাজের মাত্রা, ক্ষুদ্র অর্থনীতির (micro-economics) মূল্য-নির্ধারণ, এবং আয়ের বন্টন তত্ত্বকে একত্রিত করা হয়। সহজভাবে, মোদ্দা কথায় তাঁর যুক্তিটা এই যে

www.pathagar.com

ব্যবসায়ের বিনিয়োগটাই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণের হার নির্ধারণ করে, যা স্থির করে দেয় মুনাফার হার, যেটা আবার নির্ধারণ করছে বিনিয়োগ ব্যয়। ঐ তিনটি বৃহৎ–অর্থনীতির 'চলকের' সাথে সমন্বিত হযে পরস্পরের দ্বারা নির্ধারিত একটা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে মূল্যটা স্থির হয়, কারণ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে মূল্য ধার্য করবে, তা থেকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অর্থটা মুনাফা হিসাবে অর্জিত হতে হবে।

'কেইনস্ পরবর্তী' অর্থনীতিতে পিয়েরো স্রাফা (জন্ম ১৮৯৮) নামক একজন ইটালীয় অর্থনীতিবিদেরও অবদান আছে, যিনি ১৯২০ দশকে মুসোলিনির ফ্যাসিজম্ থেকে ইংল্যান্ডে এসে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই কাজ করেছেন। ১৯৬০ সনে তিনি ৯০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন যার নামটা একটু অস্বাভাবিকঃ 'প্রডাক্শন অব কমোডিটিজ বাই মিনস্ অব কমোডিটিজ'। এটা ছিল একটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য গাণিতিক রচনা, যার আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থনীতিতে যে প্রকৌশলিক সম্পর্কগুলো দ্রব্যের উৎপাদন নির্ধারিত করে, তারই বর্ণনা। অর্থাৎ 'ক' নামক দ্রব্য প্রস্তুত করতে নির্দিষ্ট পরিমাণের শস্য এবং লৌহ প্রয়োজন হয় যে দুটি শ্রমিকদের খাদ্য এবং মধ্যবর্তী শিল্প দ্রব্যের প্রতীক, 'খ' নামক দ্রব্য প্রস্তুত করতে ভিন্ন পরিমাণে উপকরণগুলো লাগবে, ইত্যাদি। লক্ষ্য করুন, এই কথাগুলোর মধ্যে এক নতুন ধারণার প্রবর্তন হলো। উৎপন্ন সামগ্রী নির্ধারিত হচ্ছে সেগুলোর প্রস্তুতি পদ্ধতির প্রকৌশলিক সম্পর্কমালার দ্বারা, বাজারের চাহিদা এবং সরবরাহের পারস্পরিক কার্যক্রমের দ্বারা নয়।

আরো কিছু অর্থনীতিবিদ একই ধারায় চিন্তা করেন ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে, বিশেষভাবে রুশ অর্থনীতিবিদ এস.ভি. কাস্ত্রোভিচ (জন্ম ১৯১২) এবং রুশ–আমেরিকান ভাসিলি লিওনটিয়েফ (জন্ম ১৯০৬) যাঁরা দুইজনই স্বতন্ত্র ভাবে একটি ইন্পুট্–আউটপুট্ (input-output) বিশ্লেষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই ইন্পুট্ (যা উৎপাদনে ব্যবহার হয়) –আউটপুট্ (যা উৎপাদিত হয়) তত্ত্বগুলো অবশ্য ধরে নেয় যে উৎপাদন সম্পর্কগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য–সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাটা সম্ভবপর হবে–'কাস্ত্রোভিচ্ ব্যবস্থায়' কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা আর 'লিওন্টিয়েফ ব্যবস্থায়' বাজারের দ্বারা। স্রাফা আরো একধাপ এগিয়ে তত্ত্বটার পূর্ণ রূপ দিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে প্রকৌশলিক সম্পর্কগুলোর ভিত্তিতে উৎপাদনের একটা বিশিষ্ট ধরনের সাথে সমন্বিত মূল্য নির্ধারণ করাও সম্ভব, যদি মজুরী এবং মুনাফার মধ্যে দেয়া–নেয়া (trade-off) চলে।

www.pathagar.com

এই সিদ্ধান্তটা আবার কালেৎস্কীর বৃহৎ-অর্থনীতির সাথে সংযোজিত করা যায়, যাতে দেখা যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, বিনিয়োগ, মুনাফা এবং জিনিসের ধার্যমূল্য পরস্পরের প্রভাবে নির্ধারিত হয়। কালেৎস্কীর বৃহৎ-অর্থনীতির তত্ত্বে বর্ণিত 'মুনাফা' স্রাফার ক্ষুদ্র অর্থনীতির মধ্যে যে ফাঁকটা ছিল, আর মুনাফার মধ্যে বন্টনকৃত আয়কে সংজ্ঞায়িত করে সেই ফাঁক পূরণ করে দিচ্ছে। এর ফলে 'কেইনস্ পরবর্তীদের পক্ষে গোটা অর্থনীতিকে একটা ব্যবস্থা (system) হিসেবে বিশ্লেষণ করতে পারা সম্ভব হবে, যাতে প্রধান সবগুলো চলকই ক্রিয়ামূলকভাবে (functionally) একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

এ ধারণাগুলোর বিকাশ ঘটে প্রথম ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে, যেখানে জোয়ান রবিনসন ছিলেন এর প্রধান প্রবক্তা। অপূর্ণ প্রতিযোগিতা আর একচেটিয়া সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক অবদানের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ১৯৬০-এর দশকে তিনি প্রাচীনপন্থী চিন্তা ধারার প্রতি এক প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ স্বরূপ; প্রথমতঃ অর্থনীতিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকার কারণে বিনিয়োগ ব্যয়ে যে বিপুল বাড়া-কমার সম্ভাবনা আছে, এই মর্মে কেইন্সের জোরালো বক্তব্যটা পুরুদ্ধার করলেন। দ্বিতীয়তঃ রবিনসন নিওক্লাসিক্যাল ক্ষুদ্র-অর্থনীতির পুঁজি এবং সময় সাপেক্ষে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিবেচনার দুর্বল অংশটুকুর উপর আঘাত হানলেন।

এখানে প্রসংগটা হলো উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন-প্রকৃতির জিনিসের ভূমিকা। উৎপাদনের নিওক্লাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে ধরে নেয়া হয় যে উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায় নিয়ে আসবে। কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় তো উৎপাদন উপকরণগুলোর মূল্য, যেমন মূলধন। অবশ্য মূলধন জাতীয় দ্রব্য তার মূল্য লাভ করে যেসব চূড়ান্ত দ্রব্য তা দিয়ে উৎপন্ন হয়, তারই মূল্য থেকে। তার ফলে যুক্তিটা চক্রাকারের হয়ে পড়ছে ঃ উপকরণগুলোর (inputs) ব্যয় নির্ভর করছে যেসব বস্তু তা থেকে তৈরী হয়, তার মূল্যের উপর, কিন্তু ঐ বানানো জিনিসগুলোর তো মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না, যদি তাদের উৎপাদন-উপকরণের দাম না স্থির হয়। এই চক্রটা তেমন কোন সমস্যা নয়, যদি এই সবই একই সাথে ঘটে যায়—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা ঘটে না। উৎপাদন হতে একটা সময় লাগে আর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তার উৎপন্ন জিনিসের জন্য কি দাম পাবে, সেই তথ্য হাতে আসার আগেই তাদের ব্যবহৃত উপরণের মূল্য স্থির করতে হয়। তা ছাড়া যেহেতু স্বতন্ত্র পরিমাপক এককের সাহায্যে ঠিকভাবে মূলধনের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, আমরা এটা দেখাবো কি

www.pathagar.com

করে, এর যে লাভ, সেটা আদতেই উৎপাদনে এর অবদানের সমান? এই সমস্যা কাটানোর উপায় দুটি হলো, মার্কসের পদ্ধতিতে মূলধনকে সংজ্ঞায়িত করা, যথা, মূলধন একটা অন্তর্বর্তীকালীন দ্রব্য মাত্র, যার অবস্থান হলো শ্রম এবং চূড়ান্ত উৎপাদিত পণ্যের মাঝামাঝি ; অথবা চূড়ান্ত উৎপাদনের মূল্য ছাড়াই স্বতন্ত্র কোন পদ্ধতিতে মূলধনের সংজ্ঞা দেয়া, তার পরিমাপ করা, কিন্তু তা করা হয়নি। জোয়ান রবিনসন ১৯৫৩ সনে "দি প্রডাকশন ফাংশন্ অ্যান্ড দি থিওরী অব ক্যাপিট্যাল" নামক তাঁর এক প্রবন্ধে এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধ থেকে অতঃপর শুরু হলো মূলধনের প্রকৃতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মূল্য এবং আয়ের বন্টনের সাথে তার সম্পর্ক নিযে এক দীর্ঘ আর তিক্ত বিতর্ক।

পরবর্তী পর্যায়ে এই 'মূলধন বিতর্ক' সম্ভবতঃ অর্থনীতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী বিষয়ে পরিণত হতে পারে। রবিনসন ও তাঁর কেইনস্ 'পরবর্তী' সমর্থকরাই জয়লাভ করে। মূল্য নির্ধারণ এবং আয় বন্টন সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাগুলোকে যুক্তির দিক থেকে, বিশেষভাবে আধুনিক জগতের দীর্ঘায়ু মূলধন-সামগ্রী এবং জটিল প্রকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে, সামঞ্জস্যহীন এবং অপ্রাসংগিক বলে দেখানো হলো। যদি অর্থনীতিবিদদের তাত্ত্বিক প্রশ্নটা বাজার ব্যবস্থার মধ্যেই পণ্যের বিনিময় বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে দেখা যায় যে পুরনো চিন্তাধারা তার শক্তিমান সিদ্ধান্তগুলো বজায় রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু যদি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত প্রকৌশলিক পদ্ধতির দ্বারা স্থিরীকৃত মূলধন সামগ্রীর দীর্ঘ আয়ুর প্রভাব বিবেচনা করা যায়, তাহলে নিওক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ আর এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারে না। মূলধন বিতর্কের বিজয় মাল্যটা গোঁড়া-মতবাদের সমালোচক 'কেইনস্ পরবর্তী'দের কাছেই গেল।

'কেইনস্ পরবর্তী অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটছে। আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন একটি মতের বিকাশ হচ্ছে ঃ যে ক্ষেত্রে অর্থবাদীরা (monetarists) মনে করে যে টাকার সরবরাহটাই হলো জিনিসের মূল্যের একটি প্রধান নির্ধারক, এবং সনাতন কেইনসীয়রা মনে করে যে টাকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনা যাবে, সে ক্ষেত্রে, 'কেইনস্ পরবর্তী'রা যুক্তি দেখায় যে টাকার সরবরাহ ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তেমন একটা কাজের কাজ হবে না। বৃহৎ-ইউনিয়ন, বৃহৎ-ব্যবসা আর বৃহৎ-সরকার, এদের প্রত্যেকের, পরিবর্তনশীল উৎপাদনের মাত্রা আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের প্রেক্ষিতে নিজের নিজের আয় বেশী করতে বা বজায় রাখতে চেষ্টা করাকেই মুদ্রাস্ফীতির কারণ বলে ধরা হয়। অর্থনীতিকে একটি "দ্বৈত-ব্যবস্থা"

www.pathagar.com

হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলো, যার অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতটা প্রভাবিত হচ্ছে বড় ব্যবসায়ী আর একচেটিয়াভাবে নির্ধারিত মূল্যের দ্বারা, অপর খাতটা প্রতিযোগিতামূলক ছোট ব্যবসা নিয়ে গঠিত যার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃতভাবে কম এবং ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে, যদিও এই খাতে সনাতন প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তত্ত্বটা এখনো প্রাসংগিক। শ্রমের বাজারও বিশ্লেষণে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, প্রধান অংশ, যেখানে শিল্পের কারিগরী দক্ষতা, শ্রমিক ইউনিয়ন আর বড় ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলো খুব উন্নত; এবং অপ্রধান অংশের প্রকৌশলে শ্রমের ব্যবহার অধিক, সেখানে ইউনিয়নের সংখ্যা অল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আকারে ছোট এবং প্রতিযোগিতামূলক। 'কেইনস্ পরবর্তীদের দৃষ্টিতে, সাধারণ ভারসাম্যের (general equilibrium) কোন পূর্ব শর্ত নাই, দ্রব্যমূল্য প্রধানতঃ সরবরাহ আর চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রাটা পরিবর্তনশীল, প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া স্বভাবতঃ ভারসাম্যহীন, এবং আয়ের বন্টনটা শ্রম এবং পুঁজি, এই দুই প্রধান দাবীদারের মধ্যেকার সংগ্রাম এবং তাদের সাংগঠনিক শক্তির দ্বারা নির্ধারিত।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এই দৃষ্টিভংগীর অর্থ এই যে, সমন্বয় এবং সুশৃংখল পদ্ধতির কোন প্রবণতা থাকলেও তা অর্থনীতিতে পরিবর্তন, সংঘাত আর বিশৃংখলার মত বিপরীত প্রবণতার দ্বারা প্লাবিত হয়ে যাবে। যদি শৃংখলাপূর্ণ আর শ্রেয় ফল অর্জন করতে হয়ই, তবে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে ওকালতি করাটা 'কেইনস্ পরবর্তী'দের দৃষ্টিভংগীর একটি যুক্তিসংগত পরিণতি।

পুরনো মদের জন্য নতুন বোতল

অসমতা, ভারসাম্যহীনতা আর অর্থনীতিতে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার বিধান–সহ 'কেইনস্ পরবর্তী' অর্থনীতির অভ্যুদয়ের সাথেই এক নতুন ধরনের রক্ষণশীলতাও এসেছে, যাতে স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার শক্তির উপর অধিক নির্ভরতা অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারের ভূমিকা হ্রাস আর চাহিদা বৃদ্ধির চেয়ে বরং উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'কেইনস্ পরবর্তী' অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অর্থনৈতিক জগতে মার্কেন্টাইলিস্ট মতবাদের আবার পুনরভ্যুত্থান ঘটেছেঃ বাজার ব্যবস্থাটা স্বনিয়ন্ত্রিত নয়, তা আপনা থেকেই সমাজের জন্য কল্যাণকর ফলাফল সৃষ্টি করে না এবং, অতএব সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। অপর

www.pathagar.com

পক্ষে, নয়া রক্ষণশীলতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডাম স্মিথের আর অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক উদারপন্থীদের ধারণা–কাঠামোতে প্রত্যাবর্তনঃ বাজার ব্যবস্থা স্বনিয়ন্ত্রিত, তা কাজ করার ফলে সামাজিক কল্যাণমূলক ফল পাওয়া যায় আর যদি 'লেজে ফেরে' নীতিতে ফিরে যাওয়া যায়, তাতে যথেষ্ট উপকার হবে। যদি এসব কথা পাঠকের কাছে পূর্ব–পরিচিত বলে মনে হয়, তা হলে মনে রাখুন, ফাস্‌ফেল্ডের বুদ্ধিবাদী ইতিহাসের প্রথম সূত্রঃ কোন চিন্তাধারা যদি ভাল বলে মনে হয়, তাহলে জানবেন, অপর কেউ এটা প্রথমে ভেবেছে।

নয়া রক্ষণশীলতা 'লেজে ফেরে' মতবাদের পুন:রূপায়ণ করার জন্য একটি তত্ত্ব তুলে ধরলো। এটা অনেকাংশে কেইনসীয় অর্থনৈতিক নীতিমালার অর্থবিষয়ক সমলোচনা (monetarist critique) থেকে নেয়া হয়েছে, কিন্তু অর্থবাদীদের টাকার সরবরাহ নিয়ে যে প্রধান ভাবনা ছিল, এতে তা অতিক্রম করে কর্মনিয়োগ, মুদ্রাস্ফীতি, প্রত্যাশা (expectations) এবং অর্থনীতির 'সরবরাহের দিক' (supply-side), এইগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাদের বিশ্লেষণের প্রধান কথাটা নিম্নরূপঃ

বেকারত্বের একটা স্বাভাবিক হার (natural) আছে, ধরা যাক সেটা শতকরা ৫ ভাগ যেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার শূন্য। বাস্তবে বেকারত্বের হার এই স্বাভাবিক হারের চেয়ে নিচে নিয়ে যেতে (ধরা যাক শতকরা ৪ ভাগ) শুল্ক এবং আর্থিক নীতি ব্যবহার করে মোট চাহিদা বৃদ্ধির চেষ্টা করলে, তা আপাততঃ স্বল্প মেয়াদে সফল হবে, কিন্তু তাতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে। বেকারত্ব হ্রাসের সাথে সাথে মজুরী বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে (স্বভাবতঃ 'ফিলিপস্ কার্ভ' এই সম্পর্কটা দেখিয়ে দেয়) যার ফলে শ্রমের বাজার চড়া হয় আর শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর দরকষাকষির শক্তি বৃদ্ধি পায়। যখন মূল্য বৃদ্ধি হয়, তখন ভোক্তা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আর শ্রমিক ইউনিয়ন আশা করতে শুরু করে যে আরো মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। ক্রেতারা মূল্য বৃদ্ধি এড়িয়ে যাবার জন্য যা পরে কিনতো, তা এখনি কিনতে শুরু করে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও উৎপাদন উপাদান (inputs) অগ্রিম ক্রয় করতে শুরু করে, আর এই ভাবে ওসব জিনিসেরও দাম বাড়িয়ে ফেলে। ইউনিয়নগুলো মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে দেখে এখনি মজুরীবৃদ্ধি দাবী করে। গোটা অর্থনীতিই একটি চড়া মূল্যমানের দিকে এগিয়ে যায়। এই অবস্থায়, তাত্ত্বিক মতে, বেকারত্বের হারে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটতে শুরু করে ঃ এটার যে 'স্বাভাবিক' মাত্রা আছে, বেড়ে ঐ পর্যন্ত পৌছায়। মুদ্রাস্ফীতির চাপে মজুরী আর মূল্য পরিবর্তনের মধ্যে লেন–দেনকে (trade-

www.pathagar.com

off) এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, মজুরীর উচ্চ হার এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে 'ফিলিপস্ কার্ভ উপরের দিকে যায়'। তার ফলে, বেকারত্ব হ্রাসের জন্য প্রয়োগকৃত নীতিগুলো মূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়, আর বেকারত্ব লাঘবের জন্য এর কার্যকারিতা স্বল্প মেয়াদেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ব্যাপারটা কি জটিল? হ্যাঁ, বিতর্কমূলক? অবশ্যই, তত্ত্বের সবচেয়ে বিতর্কমূলক দুটি দিক হলো, প্রথমতঃ মুদ্রাস্ফীতির আশংকা মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়, যে কথাটা কিছুতেই প্রমাণ করা সম্ভব নয়; এবং দ্বিতীয়তঃ মূল্যের পরিবর্তনে বেকারত্বের আর মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে যে লেন-দেন (trade-off) হতে পারে, যে কথাটাও তত্ত্ব বা তথ্য যে কোন দিক দিয়েই প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। এ তত্ত্বের গোড়ায় রয়েছে 'যুক্তিপূর্ণ প্রত্যাশার' (rational expectation) ধারণা। লোকে যখন জানতে পারে যে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি থেকে মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়, তারা তাড়াতাড়িই এর সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। প্রথমে বেকারত্ব হ্রাস, অত:পর মুদ্রাস্ফীতি এবং তারপর বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়ে তা আবার 'স্বাভাবিক' মাত্রায় ফিরে যাওয়া, এ সবের বদলে কয়েকবারের অভিজ্ঞতার পর সময়- পরম্পরটা (time sequence) সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে আর পরে মধ্যবর্তী ধাপগুলো বাদ হয়ে যায়। অর্থনীতি তখন তাৎক্ষণিকভাবে মোট চাহিদা বৃদ্ধির পরিণতিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়, ওদিকে বেকারত্ব যেমন ছিল, তেমনই থেকে যায়।

এই বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া নীতিমালা ব্যবসায়ীদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক। সবচেয়ে সুস্পষ্ট নীতি-ব্যবস্থাপত্র হলো প্রাচীন কেইন্‌সীয় চাহিদা বৃদ্ধির কর্মসূচীটা বাতিল করা। মোট চাহিদা বৃদ্ধি শুধু মুদ্রাস্ফীতিই ডেকে আনে। বিপরীত ক্রমে, অর্থনীতিতে সরবরাহের দিকে (supply-side) প্রভাবিত করার কর্মসূচী খুব সহায়ক হতে পারে। ব্যবসার উপর ধার্য কর এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে। বাকিতে কর আদায় ব্যবস্থার (tax credit) সম্প্রসারণ করে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। উৎপাদনশীল শ্রমিকদের কাছ থেকে কল্যাণকর বা অন্যান্যভাবে দরিদ্রের নিকট আয় হস্তান্তর করা হ্রাস করতে হবে, আর সেই সাথে উৎপাদনশীল শ্রমিক এবং উৎপাদনশীল দরিদ্র উভয় দলকেই খেটে খেতে অধিক উৎসাহ দিতে হবে। মোটের উপর এদের প্রধান সুরটা হলো সরকারের ভূমিকা খর্ব করা আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা সম্প্রসারণ।

www.pathagar.com

'স্বাভাবিক' বেকারত্বের হারটাও কমিয়ে আনার দিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে। নয়া রক্ষণশীলরা আরো কিছু কর্মসূচী সমর্থন করে, (যা ইতিপূর্বে কেইনস্‌বাদী উদারপন্থীরাই তৈরী করে) তবে সাবধান হতে হবে যেন ওগুলোর ব্যয় আর উপকার (costs and benefits) সতর্কতার সাথে কষে দেখা হয়। অনুমোদিত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে অল্প দক্ষ শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বহুদিনের পশ্চাৎপদ এলাকাগুলো থেকে শ্রমিকদের বাইরে আসা সহজসাধ্য করা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মহিলাদের চাকুরী দেয়ার বৈষম্য হ্রাস করা এবং কর্মনিয়োগের সরকারী সহায়তা-ব্যবস্থার মান উন্নয়ন। কিন্তু নয়া রক্ষণশীলদের অনেকেই, ন্যূনতম মজুরী আইন বাতিল, বেকারত্ব বীমা ভাতার পরিমাণ হ্রাস এবং জাতীয় শ্রম-আইন সমূহের সংস্কার করে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর দরকষাকষির ক্ষমতা হ্রাস, এইগুলোর পক্ষে। "সরবরাহের-দিক প্রধান অর্থনীতি"র (supply-side economics) এই বিধানগুলোতে ধরে নেয়া হয়েছে যে আধুনিক ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক অর্থনীতির তলে তলে সদা বর্তমান শ্রেণী সংগ্রামকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারই একটি অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

ভবিষ্যতের অর্থনীতি

অর্থনীতি এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে ঃ এই শাস্ত্রের গতি এবং অবস্থানে এক নাটকীয় পরিবর্তন আসন্ন। কেইন্‌সীয় বৃহৎ অর্থনীতি আর নিওক্লাসিক্যাল ক্ষুদ্র-অর্থনীতির প্রাচীন চিন্তাধারার ভিত্তিতে যে ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল, যাকে আমরা নিওক্লসিক্যাল সংশ্লেষণ বলেছি, তা এক দশক আগেও যতটা গ্রাহ্য হতো এবং সম্মান পেতো, আজ আর তা পাচ্ছে না, এখন আর তা রাষ্ট্রীয় কর্মনীতিকে তেমন প্রভাবিত করছে না। তত্ত্ব এবং কর্মনীতির এই শূন্যতা পূরণের জন্য এক পুনর্গঠন আসতেই হবে।

নিওক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণটা যে ভেঙ্গে পড়লো, তার প্রধান কারণ এর অভ্যন্তরীণ যুক্তির কোন ত্রুটি নয়। এটা যে ঘটেছে তার কারণ, এই তত্ত্বটা যে জগতের একটি অংশ ছিল, আজ সেটাই এক সংকটে পৌছেছে। সেই জগতের প্রতিষ্ঠানগুলো এবং চিন্তার প্রকৃতি যেহেতু পরিবর্তিত হচ্ছে সুতরাং অর্থনীতির পরিবর্তন হবে। ১৯৮০-এর দশকের বৃহৎ-অর্থনীতি বিষয়ক সমস্যাগুলো ১৯৩০-এর দশকের সমস্যা থেকে একেবারেই ভিন্ন, তাই পঞ্চাশ বৎসর আগেকার দিনের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য প্রস্তুত কেইন্‌সীয় অর্থনীতিকে আজকের দিনের সমস্যাবলীর জন্য অনুপযুক্ত বলে দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

'ক্ষুদ্র-অর্থনীতির' পর্যায়ে বাজারে সমন্বয় যে পরিবেশে ঘটে এসেছে, এখন বৃহৎ-ব্যবসা, বৃহৎ-শ্রমিক আর বৃহৎ-সরকারের বিকাশ তাতে পরিবর্তন এনেছে। যৌথ দরকষাকষি, শ্রমের বাজারে নতুন সব কড়াকড়ি এবং জাতীয় শুল্ক এবং ব্যয় কর্মসূচী আর বন্টন নির্ধারণে হয়তোবা বাজার-শক্তির চেয়ে বেশীই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। আজকাল বড় কর্পোরেশনগুলোর বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ উৎপাদনের প্রকৃতি নির্ধারণে একটি প্রতিপত্তিশালী প্রভাব; তেমনই ক্রেতাদের চাহিদাকে প্রভাবিত করায় বিজ্ঞাপনও একটা কম প্রতিপত্তিশালী শক্তি নয়। এই শক্তিগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে না পারা বাজার বিনিময়ের প্রাচীন মডেল (orthodox model of market exchange) এবং ভারসাম্যের সমন্বয়কে (adjustment to equilibrium) ক্রমাগত অধিক অবাস্তব অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

অর্থনীতির পুনর্গঠনের সাধারণ গতিধারা কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। বিগত দুই শত বৎসরের সঞ্চিত মৌলিক জ্ঞান এবং ধরণাগুলোর অনেকটাই থেকে যাবে। কিন্তু এই সব চিন্তাধারাকে শুধু নির্মাণ কার্যের ইট পাথর হিসেবেই গণ্য করতে হবে, কারণ এগুলো শুধু এমন এক সাধারণ কাঠামোর অংশ বিশেষ, যেটা আর একত্রে থাকতে পারছে না। আগামীতে যে পুনর্গঠন হবে, তাতে ঐ সব ইট পাথর ভিন্নভাবে সাজানো হবে এবং তাতে অন্ততঃ যেটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটুকুর মেরামত করা হবে। আশা করা যায় যে প্রথমতঃ অর্থনৈতিক কার্যক্রম যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভিতরে সংঘটিত হয়, তা পরিবর্তন করার দিকে অধিক মনোযোগ দেয়া হবে। বিগত পঁচিশ বৎসরের একটা শিক্ষা এই যে সেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটা (institutional structure) ক্রমশঃ পরিবর্তিত এবং বিবর্ধিত হয়ে থাকে ; অত:পর তা অর্থনীতির কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তন-ধরনের বিশ্লেষণ, যেটা, উদাহরণ স্বরূপ মার্কস্, ভেব্‌লেন আর গলব্রেথের কাজের বৈশিষ্ট্য ছিল, দেখে মনে হচ্ছে তেমন বিশ্লেষণের উপর অধিক গুরুত্ব দেবার সময় এসে গিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্ভবতঃ নিশ্চয়তা আর চূড়ান্ত নির্ধারণ (certainty and determinateness) থেকে সরে এসে সন্দেহ আর দৈব ঘটনার (doubt and chance) জগতকেই বরং স্বীকার করে নেবে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের প্রথম জামানা শেষ হয়ে আসছে। সেই জামানার জগতটাকে পরিচিত সীমারেখার মধ্যে স্থায়ী কতকগুলো সম্পর্কের অবস্থানসহ বলে মনে করা হয়েছে, অনেকটা পুরনো নিউটনীয়

www.pathagar.com

পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে দেখা জগতের মত, যেখানে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর দ্বারা একটি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত ভারসাম্য পাওয়া যেত। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানই বলুন আর বিংশ শতাব্দীর দর্শনই বলুন, উভয়ই পৃথিবীকে যেভাবে দেখছে, তাতে কোন পরিষ্কার একটা সীমারেখা দৃশ্যমান নয়, আর সেই পৃথিবীতে দৈব আর অনিশ্চয়তা হলো বুনিয়াদি উপাদান। কোন কোন দিক দিয়ে অর্থনীতিও সেই একই অভিমতে আসছে। তা ছাড়া যুক্তির মাধ্যমে যে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব, বিংশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ সেই বিশ্বটাই ক্ষতির শিকার হয়েছে। ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, মন্দা আর মুদ্রাস্ফীতি, মৃত্যু-শিবির (extermination camps), দুর্ভিক্ষ বা ঐ ধরনের সন্ত্রাসের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সে বিশ্বাস বজায় রাখাও কঠিন। যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি যে সর্বোত্তম (optimal) ফলাফল এনে দেবে, এই ধারণার উপর সৃষ্ট একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব একালের একজন 'ক্যানডাইড' (candide) এর পক্ষে মেনে নেয়া ততটাই কঠিন হবে, যতটা কঠিন মনে হয়েছে আগের দিনের একজন 'ক্যানডাইড্, এর পক্ষে "এই সর্বোত্তম পৃথিবীতে যা কিছুই আছে তাই সর্বশ্রেষ্ঠ" ধরনের কথা মেনে নেয়া। পুরনো দিনের নিশ্চয়তা আর আত্ম-প্রত্যয় বিদায় নিয়েছে। যে অর্থনীতির বিকাশ হচ্ছে, তাতে দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন প্রতিফলিত থাকবে, যে পরিবর্তনের মূল নিহিত রয়েছে আধুনিক জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে।

তৃতীয়তঃ আগেকার দিনে তত্ত্ব এবং কর্মনীতিতে জাতীয়-ভিত্তিক (national) অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কর্মপন্থার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হতো, সেটা এখন অচল হয়ে পড়েছে। নতুন আন্তর্জাতিক টাকার বাজার আর বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক পরিক্রমা আর যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, একটি স্বাধীন শক্তি হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয়, পরস্পর প্রতিযোগিতা মতাদর্শসমূহের রেষারেষি, এই সবের থেকে বোঝা যাচ্ছে যে 'বৃহৎ এবং 'ক্ষুদ্র' উভয় শ্রেণীর অর্থনৈতিক সমস্যাই এখন আরো ব্যাপক এবং আন্তর্জাতিক প্রকৃতির হয়ে উঠবে। অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণের অর্থ এই যে এখন তত্ত্ব এবং কর্মনীতি উভয়কেই সেই গোটা পৃথিবীর সমস্যারই ব্যাখ্যা আর ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগী হতে হবে।

চতুর্থতঃ ভবিষ্যতের অর্থনীতিকে নিঃসন্দেহে 'রাজনৈতিক ক্ষমতার বিশ্লেষণ, তার উৎস, তার সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। বৃহৎ-ব্যবসা, বৃহৎ-শ্রমিক আর বৃহৎ-সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের সাথে

www.pathagar.com

জড়িত রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন এবং তা ব্যবহারের জন্য সুবিধা আর লাভের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে কোন দল অর্থনৈতিক শক্তিটাই ব্যবহার করতে পারছে আর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রাখতে পারছে, তার উপরঃ 'ক্ষমতা দখলের জন্য অর্থ, আর অর্থ রক্ষার জন্য ক্ষমতা' এখন আবার একটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর অর্থনীতির নিজস্ব প্রকৃতিতেই যে পরিবর্তন ঘটছে, তার ফলেই এটা সম্ভবপর হচ্ছে। রাজনৈতিক অর্থনীতির এই দিকগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় অর্থনীতিতেই–বহু যুগের সেই পুরনো 'ধনী আর দরিদ্রে'র (haves and have-nots) সংগ্রাম। আবার একবার অর্থনীতিবিদদের পরিবর্তনশীল ধারণাবলীর আর প্রতিষ্ঠানসমূহের (ভেবলেন আর গলব্রেথ) কাঠামোর মধ্যে লড়াই করতে হবেঃ সংঘাত (মার্ক্স) আর সঙ্গতি (অ্যাডাম স্মিথ) এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে।

মতাদর্শে সংঘাত, ক্ষমতার লড়াই আর আণবিক অস্ত্রের এই পৃথিবীতে এগুলো নিছক তাত্ত্বিক প্রশ্নই নয়। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজ তার নিজের ধ্বংসের উপায় সৃষ্টি করে রেখেছে। বর্তমান মানবগোষ্ঠী যদি আণবিক যুদ্ধ বা পরিবেশ বিষাক্তকরণ এড়াতে সফল হয়, তাহলেও ঐ সব মারাত্মক সম্ভাবনা পরবর্তী পুরুষের (next generation) মানব গোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তরিত হবে। সম্ভবতঃ আমাদের সময়ে অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টির প্রয়োজন, যা উত্তম পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে, এমন আয় বন্টনের ধরন সৃষ্টি করবে যা ন্যায়নীতিতে সমর্থনযোগ্য, আর গড়ে তুলবে এক বিশ্ব–ব্যবস্থা যেখানে আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত।

www.pathagar.com

অধ্যয়ন ইঙ্গিত

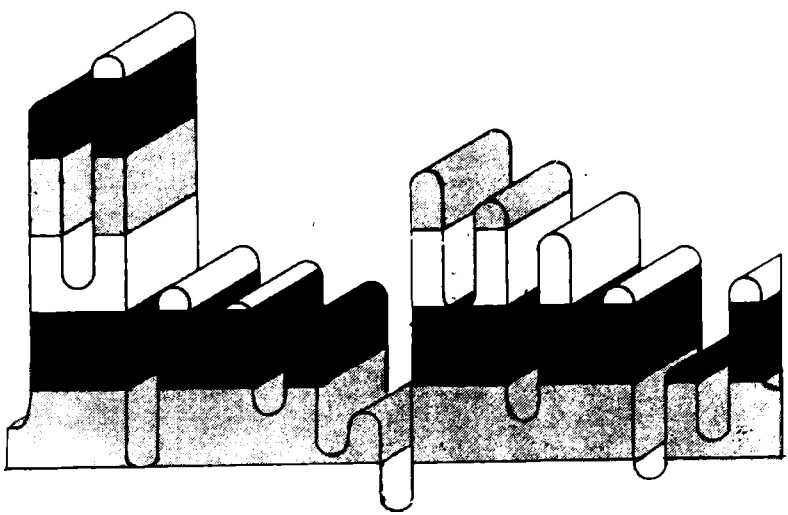

অর্থনীতির সাহিত্য যেমন ব্যাপক, তেমনই জটিল। এমন কি পেশাদার অর্থনীতিবিদদের পক্ষেও এখন আর এর সবটুকুর সাথে পরিচিত থাকা সম্ভব নয়, যদিও এক শতাব্দী আগে কার্ল মার্কসের পক্ষে সারা জীবন পড়াশুনা করার ফলে এই শাস্ত্রের যেখানে যা লেখা হয়েছিল তার প্রায় সবটাই পড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল।

অর্থনীতির ইতিহাস বিষয়ে জরিপমূলক বেশ কিছু ভাল পাঠ্য-পুস্তক রয়েছে। Erich Roll. *A History of Economic Thought* (third edition, 1956), John F. Bell, *A History of Economic Thought* (second edition, 1967), এবং Charles Gide and

www.pathagar.com

Charles Rist, *A History of Economic Doctrines* (second edition, 1948)। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে উপভোগ্য দুটি জরিপ হলো Leo Rodgin, *The Meaniny and Validity of Economic Theory* (1956), যাতে অর্থনৈতিক তত্ত্বের বাস্তব ব্যবহারের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে, এবং Joseph Schumpeter, *A History of Economic Analysis* (1954), একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ যাতে অর্থনীতির একটি বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশের উপর জোর দেয়া হয়েছে। আরো সাম্প্রতিককালের পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে Irene H. Rima, *Development of Economic Analysis* (revised, 1972), Mark Blaug, *Economic. Theory in Retrospect* (revised, 1968), এবং Robert B. Ekelund, Jr, and Robert F. Herbert, *A History of Economic Theory and Method* (1975) বইয়ের নামগুলোতে তত্ত্ব, বিশ্লেষণ আর পদ্ধতির উপর জোর দেয়া হয়েছে লক্ষ্য করুন। কয়েকটি সাম্প্রতিক গ্রন্থে আগের গোঁড়া মতবাদের সমালোচক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনঃজরিপ করা হয়েছে, যাতে দেখা যাবে চিন্তার পরিবর্তনের সাথে সাথে কেমন করে অতীতের পূর্ণ সমীক্ষা এসে পড়ছে: Maurice Dobb, *Theories of Value and Distribution since Adam Smith* (1973); Phyllis Deane, *The Evolution of Economic Ideas* (1978); এবং Guy Routh, *The Origin of Economic Ideas* (1975)।

ধনতন্ত্রের আদি কাহিনী সম্পর্কে ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভাল বইগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে , কিন্তু বাজার-অর্থনীতির অভ্যুদয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ বেশী নাই। যে দুটি বইয়ে তা আছে, সেগুলো হলো Karl Polanyi, *The Great Transformation* (1944; published paperback 1957) এবং Richard H. Tawny-র বিখ্যাত গ্রন্থ *Religion and the Rise of Capitalism* (1947)।

মার্কেন্টাইলিজম, ফিজিওক্রাসী এবং প্রথম অর্থনৈতিক উদারপন্থীবাদ সম্পর্কে একটি ভাল সংক্ষিপ্ত-সার হলো Arthur E. Monroe-এর *Early Economic Thought* (1945)। কিছুকাল আগে Barnard Mandeville-এর *The Fable of the Bees (1962)* গ্রন্থটির সুলভ সংস্করণ বের হবার ফলে এই কাজটি আধুনিক পাঠকদের কাছে আবার হাজির

www.pathagar.com

করা সম্ভব হয়েছে। অ্যাডাম স্মিথের আগের জামানার অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে যে দুটি গ্রন্থ, সেগুলোর নাম Edgar A. Johnson, *Predecessors of Adam Smith* (1937), এবং William Letwin, *The Origins of Scientific Economics* (1963)।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির সাহিত্য বিশাল। সবচেয়ে ভাল আলোচনাটা হলো Wesley Mitchell, *Lecture Notes on Types of Economic Theory* (1966), যেটা ১৯৩০-এর দশকে প্রথমে মিমিওগ্রাফ করে প্রকাশ করা হয়; এতে রয়েছে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া মিচেলের ক্লাসের বক্তৃতার নোট যা ছাত্রেরা সংগ্রহ করে, কিন্তু এটা পারদর্শী এবং সাধারণ পাঠক উভয়ের জন্যই অনন্য আকর্ষণীয়। এর চেয়ে কিছুটা জটিল, কিন্তু পড়া উচিত হবে Werner Stark, *The Ideal Foundations of Economic Thought (1944)* গ্রন্থটি। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির প্রধান কাজগুলোর সহজলভ্য সংস্করণ হলো Modern Library Giant edition of Adam Smith's *Wealth of Nations*, অ্যান আরবর থেকে সুলভ সংস্করণ Thomas Malthus-এর *Population: The First Essay:* এবং Dutton সুলভ সংস্করণে David Ricardo-এর *Principles of Political Economy and Taxation*। স্মিথের লেখা সহজ পাঠ্য নয়, ম্যালথাসের লেখা চিত্তগ্রাহী, আর রিকার্ডো বেশ কঠিন। সম্ভবতঃ সাধারণ পাঠকের জন্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির সবচেয়ে ভাল পূর্ণ জরিপ পাওয়া যাবে John Stuart Mill-এর *Principles of Political Economy* গ্রন্থে, যা ভাল সব গ্রন্থাগারেই আছে। Mill-এর *Autobiography* তাঁর শিক্ষা এবং প্রথম জীবনের ঘটনাবলীর চমৎকার বর্ণনা এবং *The Life of John Stuart Mill* by Michael St. John Packe (1954): গ্রন্থটিও পড়া উচিত। John Rae, *The Life of Adam Smith* (1965): first published in 1895) গ্রন্থটিতে প্রচুর তথ্য আছে, কিন্তু এটার লেখার ধরন খুব সুবিধার নয়। ম্যালথ্যাস বা রিকার্ডোর কোন ভাল জীবনী নাই, তবে তাঁদের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং আবশ্যকীয় কথা কেইন্‌সের ম্যালথাস সম্পর্কিত রচনায় পাওয়া যায়, যেটা আছে তাঁর *Essays and Sketches in Biography (1956)* গ্রন্থে, এতে আলফ্রেড মার্শাল এবং উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভনস্ সম্পর্কেও ভাল বর্ণনা আছে এবং *A Memoir of Ricardo* তাঁর এক ভাইয়ের দ্বারা লিখিত এবং তার সাথে আরো কিছু যোগ

www.pathagar.com

করে সেটা প্রকাশিত হয় Piero Sraffa, ed. *The Works and Correspondence of David Ricardo*, Vol. X (1955) গ্রন্থে। জেরেমী বেন্থাম এবং তাঁর প্রভাব সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা আছে Elie Halevy, *The Growth of Philosophic Radicalism* (1952) নামক গ্রন্থে আর বেন্থাম, জেমস্ মিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিল সম্পর্কে বিখ্যাত লেখা হলো Lesli Stephen, *The English Utilitarians* (1900; reprinted in1950)। যে দুটি বইয়ে ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক উদারপন্থী মতবাদের পার্থক্য সম্পর্কে জোরালো আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো হলো Harry K. Girvetz, *From Wealth to Welfare (1950)*, reprinted as *The Evolution of Liberalism (1963)* এবং William D. Grampp. *Economic Liberalism* (2 Vols, 1965। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির 'অর্থনৈতিক কর্মপন্থা' সম্পর্কে আলোচনা আছে তিনটি গ্রন্থেঃ Lionel Robbins. *The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy* (1961); Warren J. Samuels, *The Classical Theory of Economic Policy (1966);* এবং A.W. Coats, *The Classical Economists and Economic Policy* (1971)। সাম্প্রতিককালে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির 'পুনরায় ব্যাখ্যা' বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে Samuel Hollander, *The Economics of Adam Smith* (1973 ; Thomas Sowell, *Classical Economics Reconsidered* (1974); Robert V. Eagly, *The Structure of Classical Economic Theory* (1974); এবং D.P. O'Brien, *The Classical Economists* (1975)।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার উপর কয়েকটি সুন্দর উপস্থাপনা রয়েছে। সম্ভবতঃ সবচেয়ে উপভোগ্য আর উদ্দীপক গ্রন্থ হলো Edmund Wilson, *To the Finland Station* (1953), এখন যা সুলভ সংস্করণে পাওয়া যায়। অপর দুটি ব্যাপক জরিপ হলো Harry W. Laider, *Social-Economic Movements* (1948) এবং Philip Taft, *Movements for Economic Reform* (1950)। সমাজতান্ত্রিক রচনাবলীর একটি সুন্দর নির্বাচন হলো Albert Fried and Ronald Sanders eds, *Socialist Thought: A Documentary History* (1964)।

www.pathagar.com

Peter Kropotkin-এর *Memiors of a Revolutionist* (1906) হলো একজন প্রখ্যাত নৈরাজ্যবাদীর লেখা একটি মানবিক প্রতিবেদন যাতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সবচেয়ে জমকাল আমলের আর্কষণীয় বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

মার্কস্-এর সবচেয়ে সহজলভ্য সংস্করণ হলো Modern Library Giant এডিশনে *Capital*-এর প্রথম খণ্ড আর সম্পূর্ণ তিন খণ্ডের অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে Foreign Languages Publishing House, Moscow থেকে। অনভিজ্ঞ পাঠকরা প্রথমেই *Capital* সোজাসুজি পড়লে সুবিধা হবে না কিন্তু। প্রথম শুরু করার জন্য Ernest Mandel, *An Introduction to Marxist Economic Theory* (1969), chapters 1-2 পড়ে নেয়া ভাল। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের একটি চমৎকার প্রারম্ভিকা হিসেবে Marx-এর দু'টি ছোট বই পড়া যায় : *Wage-Labour and Capital* (1849) এবং *Value, Price and Profit* (1865), chapters 6-14। মার্কসের যে দু'টি লেখা মাত্র কিছুদিন আগেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে; তাতে জনগণের জন্য তাঁর মানবিক ভাবনা এবং তাঁর অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক বিচারের চিন্তাধারার স্বাদ পাওয়া যাবে ঃ *Economic and Philosophical Manuscripts of* 1844-এর অন্তর্গত "Estranged Labour" রচনায়; এবং *Pre-Capitalist Economic Formations* থেকে, এতে তাঁর প্রথম আমলের অপ্রকাশিত নোট বইয়ের অংশ বিশেষ আছে। যদি *Capital* বুঝতে পারা যায়, তবে তার সাথেই পড়া উচিত Paul M. Sweezy, *The Theory of Capitalist Development* (1942) , যা মার্কস্‌বাদী অর্থনীতির ইংরেজী ভাষায় সবচেয়ে ভাল সংক্ষিপ্ত-সার। মার্কসের শ্রেষ্ঠ জীবনী হলো Franz Mehring, *Karl Marx : The Story of His Life* (1936)। Friedrich Engles-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Condition of the Working Class in England in 1844* (1952, first published in1845) থেকে শিল্প-পুঁজিবাদের প্রথম যুগের একটি চিত্র পাওয়া যায়, যা *Capital* রচনার সময় মার্কস্ মনে রেখেছিলেন; যদি কেউ মার্কস্‌বাদ বুঝতে চায়, তার জন্য এটা অবশ্য পাঠ্য।

মার্কসের 'অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার এবং ইতিহাস মূল্যায়নের পদ্ধতি' (dialectical and historical method) বিষয়ক অধিকাংশ

www.pathagar.com

লেখাই লেখকের পূর্ব-ধারণা বা রাজনৈতিক সংস্কারের কারণে পক্ষপাতদুষ্ট। এই সব বিষয়ে মার্কস্ তাঁর জীবিতকালে বিশেষ কিছুই প্রকাশ করেননি, ব্যতিক্রম ছিল শুধু *A Contribution to the Critique of Political Economy* (1859) গ্রন্থের 'লেখকের ভূমিকাতে' সংক্ষিপ্ত দুই একটি প্যারা।

তাঁর প্রথম জীবনের প্রশিক্ষণ ছিল দর্শনশাস্ত্রে এবং তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার দার্শনিক পটভূমির বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে Sidney Hook, From Hegel *to Marx* (1950) গ্রন্থে। মার্কস্‌ের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'-এর (কথাটা মার্ক্‌সের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস্ কর্তৃক আবিষ্কৃত) ব্যাখ্যা দিয়েছেন Friedrich Engels তাঁর Part IV of *Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Philosophy* (1888) নামক রচনায়, কিন্তু এটা ছিল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির সরলীকরণ এবং দৃঢ়ীকরণ, যার পরিণতি ছিল Maurice Cornforth, *Dialectical Materialism: An Introduction* (3 vols, 1952-54 4th ed., 1971) গ্রন্থে স্ট্যালিন আমলের ব্যাখ্যা। মার্কস্‌ের প্রথম যুগের অপ্রকাশিত রচনাগুলোতে তাঁর চিন্তার কাঠামো, তারপর ক্রমান্বয়ে এঙ্গেলস্, লেনিন এবং স্ট্যালিনবাদীদের লেখাগুলো পাঠ করলে এটা বোঝা যায় যে কেমন করে সারগর্ভ দার্শনিক চিন্তাধারা শেষে এক রাজনৈতিক অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়। অবশ্য মার্কস্ এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার উপর দুটি দরকারী সমালোচনামূলক জরিপ রয়েছেঃ M.M. Bober, *Karl Marx's Interpretation of History* (1927, কিছুটা পুরনো হয়ে গিয়েছে অবশ্য) এবং Melvin Rader, *Marx's Interpretation of History* 1979)।

পরবর্তী সময়ের মার্কস্‌বাদী লেখার সম্পর্কে আমি কোন আলোচনা করি নি, যদিও সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস্‌ের প্রধান তত্ত্বটা আরো বিকশিত হয় V.I. Lenin-এর *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism* এবং Lenin-এর *State and Revolution* (1932) বইটাকে গোঁড়া সাম্যবাদী রাজনৈতিক কর্মপন্থার বাইবেল বলা চলে। 'শোধনবাদী' মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে প্রখ্যাত বিবরণ হলোঃ Eduard Bernstein, *Evolutionary Socialism* (1961) এবং আরো পরিমার্জিত রচনা হলো Karl Kautsky, *Social Democracy versus Communism* (1946)। Leon Trotsky-এর জবাব এবং ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ *The Defense of Terrorism* (1921) এবং *The Permanent Revolution*

www.pathagar.com

(1965), এই দুটি গ্রন্থ চীনা কমিউনিস্টদের পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকের অনুসরণ করা নীতিগুলো বুঝবার জন্য বিশেষ মূল্যবান অবদান।

ব্যক্তিতাবাদের দর্শন এবং যে পরিবেশ থেকে এর উদ্ভব হয়েছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন উপভোগ্য গ্রন্থ বর্তমান। আমার পছন্দসই হলো Sidney Fine, *Laissez Faire and the General-Welfare State* (1964), তার পরেই উল্লেখযোগ্য Richard Hofstadter, *Social Darwinism in American Thought* (1955)। আরো কিছুটা বৈশিষ্ট্যমূলক কিন্তু সমান উপভোগ্য গ্রন্থ হলো Edward C. Kirkland, *Dream and Thought in the Business Community* (1956)। ব্যক্তিতাবাদী এবং তাদের বিপরীত মতাবলম্বীদের রচনায় সংক্ষিপ্ত সংকলনগুলোর মধ্যে রয়েছে, E. David Cronon, *Government and the Economy : Some Nineteenth Century Views* (1960) এবং *Democracy and the Gospel of Wealth* (1949)। মহাসমৃদ্ধির ঐ যুগের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস গ্রন্থ হলোঃ Charles Francis Adams. Jr. and Henry Adams, *Chapters of Eire* (1956): Gustavus Myer, *History of the Great American Fortunes* (1936); এবং Matthew Josephson, *The Robber Barons* (1934)। অবশ্য ব্যক্তিতাবাদের স্বাদ বুঝতে হলে এই মতবাদের প্রবক্তাদের নিকট থেকেই তা সবচেয়ে ভালভাবে পাওয়া যাবে ঃ Herbert Spencer, *Social Statics* (1851): William G. Sumner, *Essays* (1934); এবং Andrew Carnegie, *Triumphant Democracy* (1886), *The Gospel of Wealth* (1900). *The Empire of Business* (1902),এবং *Autobiography* (1920).

নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির উপর কোন ভাল সার্বিক জরিপ নেই এবং পাণ্ডিত্য বিবর্জিত এ বিষয়ে সরল ব্যাখ্যামূলক লেখাও বড় বেশী নেই। Alfred Marshall-এর *Principles of Economics* (eighth edition, 1920) তারিক্কি ধরনের হলেও কঠিন নয়; নিওক্লাসিক্যাল ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য বিবরণ হিসেবে এটার মূল্য এখনো স্বীকৃত। ভূমিকা হিসেবে Cambridge Economic Handbook গ্রন্থমালার তিনটি ছোট বই পড়া অপেক্ষাকৃত ভাল ঃ Hubert Henderson, *Supply and Demand (1958);* E.A.G. Rabinson, *The Structure of Competitive*

www.pathagar.com

Industry (1959); এবং Dennis H. Robertson, *Money* (1959)। তিনটিরই লেখকগণ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, তাঁরা সকলেই মার্শালের ছাত্র এবং অনুসারী আর এগুলোর প্রত্যেকটাই লেখা হয়েছে তেমন পাঠক শ্রেণীর জন্য যাদের অর্থনীতি শাস্ত্রের সাথে কোন পূর্ব–পরিচয় নাই।

যদিও আধুনিক অর্থনীতির জরিপ অনেকটা নির্বাচনমূলক হতে বাধ্য তবুও দুটি সর্বজনীন গ্রন্থ হলো T.W. Hutchison, *A Review of Economic Doctrines : 1870-1929* (1953) যেটা মূলতঃ প্রধান চিন্তাধারাগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এবং Ben B. Seligman, *Main Currents in Modern Economics* (1962), যেখানে মোটামুটি পাঠ্যবস্তু হিসেবে অর্থনীতির অনুশীলনে যেসব সামাজিক তত্ত্ব আর রাজনৈতিক সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়, তার পূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা পাওয়া যাবে। Paul T. Homan, *Contemporary Economic Thought* (1928) একটি পুরনো হলেও দরকারী বই, যেখানে নিওক্লাসিক্যাল তাত্ত্বিকদের সাথে ভেব্‌লেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানপন্থীদের মতানৈক্যের উপর জোর দেয়া হয়েছে। Abram L. Harris, *Economics and Social Reform* (1958) গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মোটামুটি একই বটে, কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিত আরো ব্যাপক এবং দৃষ্টিকোণ আরো দীর্ঘ মেয়াদী। G. L. S. Shackle, *The Years of High Theory: Intervention and Tradition in Economic Thought* (1967) গ্রন্থে ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সময়ের অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক অর্থনীতির একটি সুন্দর জরিপ হলো Wiliam Breit and Roger L. Ransom. *The Academic Scribblers* (1971)।

Veblen এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানবাদীদের প্রশংসামূলক জরিপ হলো Allan G. Gruchy, *Modern Economic Thought* (1947)। Gruchy-এর *Contemporary Economic Thought : The Contribution of Neo-Institutional Economists* (1972) আগের কাজটিকে বর্তমানের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। Rexford G. Tugwell, ed, *The Trend of Economics* (1924) গ্রন্থে প্রধান মার্কিন প্রতিষ্ঠানবাদী অর্থনীতিবিদদের রচনা–সংগ্রহ স্থান পেয়েছে , যেগুলো গোঁড়া অর্থনীতির সমালোচনা করেছে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের সুপারিশ করেছে। একই বিষয়ের আলোচনার আরো কয়েকটি বই হলো J.M. Clark,

www.pathagar.com

Preface to Social Economics (1936) এবং *The Social Control of Business* (1939), এবং Wesley Mitchell -এর রচনা সংগ্রহ *The Backward Art of Spending Money* (1937)। John R. Commons লিখতেন প্রচুর, কিন্তু তা ছিল ভোঁতা বড় বড় শব্দপূর্ণ, তাঁর বইগুলো পড়া প্রায় অসম্ভব, ব্যতিক্রম শুধু একটি তাঁর অপূর্ব আত্মজীবনী, *Myself* (1934; Published in paperback, 1963)। Thorstein Veblen-এর চিন্তার শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ হয়েছে তাঁর *The Theory of the Leisure Class (1899:* published *in* paperback (1954) এবং *The Theory of Business Enterprise* (1904) গ্রন্থ দু'টিতে। *The Place of Science in Modern Civilization* (1919) গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীও উপভোগ্য।

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ পরিচিতি এখনো পর্যন্ত George Bernard Shaw, ed. *Fabian Essays* (1948) বইটিই রয়ে গিয়েছে। John A. Hobson-এর প্রায় সবগুলো বইই বাঁধাই করা সংস্করণে পুনর্মূদ্রিত হয়েছে; সুলভ সংস্করণে পাওয়া যায় একমাত্র *Imperialism* (1965)। R.W. Tawney-এর তিনটি প্রধান গ্রন্থ যা সুলভে পাওয়া যায়, সেগুলি হলোঃ *Religion and the rise of Capitalism* (1947). The Acquisitive Society (1960), এবং Equality (1961)। সামাজিক সমস্যার উপর পোপের বাণী, *Rerum Novarum. Quadragesimo Anno* এবং *Mater et Magistra* এখন The American Press কিম্বা Paulist Press থেকে প্রকাশিত ছোট বইয়ের আকারে সহজলভ্য।

সাধারণ পাঠকের জন্য Keynes-এর *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) পড়ে বুঝতে পারা বেশ কঠিন। তার চেয়ে *The Economic Consequences of the Peace* (1920), *The Means to Prosperity* (1933) কিংবা *Essays and Sketches in Biography* (1956) দিয়ে শুরু করা ভাল। General Theory-এর সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিকা হিসেবে দু'টি ভাল বই হলো Dudley Dillard, *The Economics of John Maynard Keynes* (1948), এবং Alvin Hansen, *A Guide to Keynes* (1953)। R.F. Harrod, *The Life of John Maynard Keynes*

www.pathagar.com

(1951) একটি সম্পূর্ণ জীবনী, আর Saymour Harrris, *John Maynard Keynes* (1955) আকারে ছোট, কিন্তু এতে কেইন্‌সের ধারণাগুলোর বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাধারণ পাঠকের জন্য Robert Lekachman, *The Age of Keynes* (1966) একটি চমৎকার গ্রন্থ।

সোভিয়েট অর্থনীতি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ আছে। Maurice Dobb, *Soviet Economic Development Since 1917* (1948) বইটা পুরানো বটে, কিন্তু ১৯২০ সনে যে বর্তমান পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার আগের বিতর্কগুলো এই বইয়ে যত সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে, তা আর কোথাও অত ভাল নেই। মূল বিতর্কটা সুন্দরভাবে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে Nicolas Spulber, *Foundations of Soviet Startegy for Economic Growth* (1964) গ্রন্থে। সোভিয়েট অর্থনীতি সম্পর্কে অপর তিনটি সাম্প্রতিক জরিপ হলো Robert W. Campbell, *Soviet—Type Economics* (third edition, 1974), Alec Nove, *The Soviet Economy* (revised edition (1969); এবং Nicolas Spulber, *The Soviet Economy* (revised edition, 1969)। পরিকল্পনার তত্ত্ব সম্পর্কিত বিতর্কের সবচেয়ে ভাল বিবরণ হলো Oskar Lange and Fred M. Taylor, *On the Economic Theory of Socialsim* (1938); Friedrich A. Hayek, *The Road to Serfdom* (1944); এবং John M. Clark. *Alternative to Serfdom* (1948)। বাজারভিত্তিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি উপভোগ্য আলোচনা রয়েছে যার অন্তর্গত Branko Horvat, *Towards a Theory of Planned Economy* (1964); এবং Ota Sik, *Plan and Market under Socialism* (1967) এবং *The Third Way* (1976)। পশ্চিম ইউরোপীয় মার্কস্‌বাদের 'নয়া শোধনবাদ' যেটাকে মডেল হিসেবে গ্রহণের অযোগ্য বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে Santiago Carrillo, *Eurocommunism and the State* (1978) গ্রন্থে। Horvat হলেন একজন প্রখ্যাত যুগশ্রাভ অর্থনীতিবিদ, Sik হলেন চেকোস্লোভাকিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান যিনি বর্তমানে সুইজারল্যান্ডে বাস করছেন এবং Carillo হলে একজন স্প্যানিস মার্কস্‌বাদী নেতা। চীনা অর্থনীতিতে এত দ্রুত পরিবর্তন করা হয় যে সে বিষয়ে প্রায় যে কোন লেখাই

www.pathagar.com

ছাপানোর আগেই পুরনো হয়ে যায়। তবুও John G. Gurley, *China's Economy and the Maoist Strategy* (1977) মাও-সে-তুং আমলের উন্নয়নের একটি সুন্দর বিশ্লেষণ।

আধুনিক অর্থনৈতিক সাহিত্যে অনুন্নত দেশগুলির সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে Barbara Ward, *The Rich Nations and the Poor Nations* (1962,) Pierre Moussa, *The Underprivileged Nations* (1963) এবং L.J. Zimmerman, *Poor Lands, Rich land: The Widening Gap* (1965), Gunar Myrdal-এর *An International Economy* (1956) গ্রন্থে অনুন্নত অবস্থার সমস্যা নিয়ে এত আলোচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের অর্থনীতিতে সবচেয়ে দরকারী অবদান রেখেছে, *The Rich Lands and Poor* নামে এর একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৯৫৭ সালে প্রকাশ করা হয়। Walt W. Rostow-এর *The Stages of Economic Growth* (1960)-এর শেষের পরিচ্ছেদগুলো পড়া উচিত। এই বিষয়ের উপর সম্প্রতি একটি ছোট বই বের হয়েছে Edward Marcus and Mildred Rendl Marcus, *Economic Progress and the Developing World* (1971)।

পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার পরিবর্তনশীল অর্থনীতি সম্পর্কে এত বেশী লেখা হয়েছে যে এর কোনটা নিয়ে আরম্ভ করা মুস্কিল। দুটি মৌলিক গ্রন্থ দিয়েই শুরু হোক ঃ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942), এবং Karl Polanyi, *The Great Transformation* (1957)। মার্কিন অর্থনীতিতে পরিবর্তনশীল সংগঠন সম্পর্কে লেখা বইগুলোর অন্তর্গত Sumner H. Slichter. *The American Economy* (1948), Adolf A. Berle, *The American Economic Republic* (1965); Gardner C. Means, *The Corporate Revolution in America* (1964), Soloman Fabricant. *The Trend of Government Activity in the United States Since 1900* (1952); এবং Eli Ginzberg, *The Pluralistic Economy* (1965)। মুক্ত বিশ্বের পরিবর্তনশীল অর্থনীতির একটি সামগ্রিক চিন্তা পাওয়া যায় তিনটি গ্রন্থে একত্রে ঃ Gunnar Myrdal, *Beyond the Welfare*

www.pathagar.com

State (1960). Angus Maddison, Economic *Growth in the West* (1964) এবং Andrew Shonfield, *Modern Capitalism (1965)। এই তিনটি বই থেকে বোঝা যায় পশ্চিমা দেশগুলো বর্তমান ভিন্ন* ভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আর কল্যাণমূখী রাষ্ট্রের দিকে কতটা অগ্রসর হয়েছে।

নিওক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ বহু শ্রেণীর অর্থনীতিবিদদের লেখার মধ্যে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে যে এ সম্পর্কে অল্প কিছু পড়বার উপকরণ উল্লেখ করা অসম্ভব। আগ্রহী পাঠক Paul Samuelson-এর পাঠ্যপুস্তক *Economics* (eleventh edition 1980) দেখতে পারেন, যদি কারো অঙ্কশাস্ত্রের দক্ষতা থাকে, তিনি Samuelson-এর *Foundations of Economic Analysis* (1947)পড়তে পারেন, কিম্বা Samuelson-এর *Collected Scientific Papers* (1966)-এর মধ্যে একবার ডুব দিয়ে দেখতে পারেন। কেইনসীয় শুল্কনীতি আর সেই সাথে নিওক্লাসিক্যাল জনকল্যাণমূলক অর্থনীতির নব-সংস্করণ হিসাবে বিখ্যাত প্রতিবেদন হলো Abba P. Lerner. *The Economics of Control* (1944)। তার পরেও রয়েছে প্রেসিডেন্টের Council of Economic Advisers-এর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত বৎসরগুলোর *Annual Reports*, যাতে রয়েছে কেইনস্ পরবর্তী বৃহৎ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মনীতির বাস্তব প্রয়োগের ধারা বিবরণ। কেইনসীয় তত্ত্বের অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে Michael Stewart, *Keynes and After* (1967) এবং Herbet Sterin. *The Fiscal Revolution in America* (1969) দুটি উল্লেখযোগ্য দলিল। কেইনসীয় অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ সমালোচনা পাওয়া যাবে Axel Leijonhufvud, *On Keynesian Economics and the Eonomics of Keynes* (1968)।

জন কেনেথ গলব্রেথ আর মিল্টন ফ্রিডম্যানের লেখাগুলোতে হস্তক্ষেপবাদী উদারপন্থী আর 'লেজেফেরে' পন্থী রক্ষণশীলদের এক চমৎকার বৈপরীত্য দেখা যায় সাম্প্রতিক অর্থনীতিতে। Galbraith-এর প্রধান বইগুলো হলো *American Capitalism* (1952), *The Affluent Society* (1958), *The New Industrial State* (1968), এবং *Economics and the Public Purpose* (1973)। সাধারণ পাঠকের পক্ষে Friedman খুব সহজবোধ্য নয়, তবে *Capitalism and*

www.pathagar.com

Freedom (1962) এর ব্যতিক্রম। তাঁর অর্থ বিষয়ক তত্ত্ব দেয়া হয়েছে *The Optimum Quantity of Money and Other Essays* (1969) গ্রন্থে, বড় এবং কঠিন *Monetary History of the United States 1867-1960* (1963) যেটায় তাঁর সহযোগী লেখিকা ছিলেন Anna Schwartz এবং *Dollars and Deficits* (1968) নামক প্রকাশিত রচনাবলীতে। তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে *Essays in Positive Economics* (1953) গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে। মার্কসবাদী অর্থনীতির পুনরাগমন সম্পর্কে প্রধান কাজগুলো হলোঃ Paul A. Baran, *The Political Economy of Growth* (1957); Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, *Monopoly Capital* (1966); Earnest Mandel, *Marxist Economic Theory* (1967) Andre Gunder Frank, *Capitalism and Underdevelopent in Latin America* (1967) গ্রন্থটি অর্থনৈতিক সমস্যাবলীতে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের প্রয়োগ বিষয়ে একটি প্রভাবশালী অবদান। একই বিষয়ের আর একটি বই হলোঃ Samir Amin. *Accumulation on a World Scale : A Critique of the Theory of Underdevelopment* (2 vols., 1974); Immanuel Wallerstein তাঁর *The Modern World System* (2 vols., 1976 and 1980) গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ একটি বিশ্ব-ব্যবস্থা, যাতে সব সময়ই পুঁজিবাদী কেন্দ্র থেকে আশপাশের অঞ্চলগুলোর শোষণ এ ব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব হয়ে আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে বামপন্থী সমলোচনা আগেই শুরু হয়েছে। Leon Trotsky, *The Revolution Betrayed (1937)* ছিল সেখানকার আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কঠিন আক্রমণ। ট্রটস্কির অবস্থান বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে Isaac Deutscher, *Russia After Stalin* (1953) এবং *Russia in Transition* (1957) গ্রন্থগুলোতে। অতি সাম্প্রতিককালে, Charles Battleheim, *Class Struggles in the USSR* (2 vols., 1977-78) গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সোভিয়েট স্বৈরতন্ত্র হলো সমাজতন্ত্রী সমাজের মধ্যেই এক নতুন ধরনের শ্রেণী সংগ্রামের ফলশ্রুতি। কিছুটা পুঁজিবাদী মিশ্র-কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালের বিরামহীন স্থিতিশীলতার কারণে রাষ্ট্র সম্পর্কে গোটা মার্কস্‌বাদী তত্ত্বটাই সাম্প্রতিককালে তন্ন তন্ন করে পুন:বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মার্কস্‌বাদী

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অর্থনীতির এই পুনরুদ্ভব বিষয়ের উপর লেখা দু'টি প্রধান গ্রন্থ হলোঃ Ralph Miliband, *The State in Capitalist Society* (1969) এবং Nicos Ponlantzas, *Political Power and Social Classes* (1973)।

ইতিমধ্যে তথাকথিত "ফ্রাংফুর্ট স্কুল" নামক একদল জার্মান মার্কস্‌বাদী, মার্ক্সের প্রথম আমলের মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলোর পুনরুদ্ভব ঘটিয়েছেঃ Herbert Marcuse, *Soviet Marxism : A Critical Analysis* (1958); Erich Fromm, *Marx's Concept of Man* (1961); Jurgen Habermas, *Theory and Practice* (1973) এবং *Legitimation* Crisis (1975)। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সমালোচনামূলক একটি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ লেখা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, তা হলো Michael Harrington, *The Twilight of Capitalism* (1976)।

সমসাময়িক অর্থনীতিতে সংকট–যুগের লেখা সম্পর্ক সতর্কভাবে নথি সংগ্রহের কাজটা এখনো অসম্পূর্ণই আছে। দারিদ্র্যের বিদ্যমানতা সম্পর্কে জোরালো ভাবে লেখা গ্রন্থ হলো Michael Harington. *The Other America* (revised edition 1970)। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য লেখাগুলোর মধ্যে রয়েছে Oscar Ornati, *Poverty Amid Affluence* (1966); এবং David Hamilton, *A Primer on the Economics of Poverty* (1968)। আয় এবং সম্পদ বন্টনের অপর প্রান্তটা দেখিয়েছেন G. William Domhof, *Who Rules America ?* (1967), এবং Ferdinand Lundberg, *The Rich and the Super-Rich* (1968) গ্রন্থ দুটিতে। সমতামূলক আয়ের বন্টন অর্জনের সমস্যা আলোচিত হয়েছে Arthur M. Okun, *Equality and Efficiency : The Big Trade Off* (1975) গ্রন্থে।

একালের অর্থনীতির সমালোচনার সন্ধান পাওয়া যাবে যে গ্রন্থগুলোতে সেগুলো হলো Benjamin Ward, *What's Wrong with Economics ?* (1972): Jesse G. Schwartz and E.K. Hunt, eds, *A Critique of Economic Theory : Selected Readings (1972);* এবং Robert Lekachman, *Economists at Bay* (1976)। সামাজিক পছন্দের তত্ত্ব বিষয়ে Arrow-এর যে গ্রন্থটি

www.pathagar.com

এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে, তা ছাড়া বিখ্যাত লেখাগুলোর মধ্যে রয়েছে Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (1957); Mancur Olson, *The Logic of Collective Action* (revised edition, 1971); এবং James M. Buchanan and Gordon Tullock, *The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutional Democracy* (1962)।

কেইন্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ক আলোচনার মধ্যে রয়েছে James Tobin, *National Economic Policy* (1966); Walter W. Heller, *New Dimensions of Political Economy* (1967); এবং Arthur M. Okun, *The Political Economy of Prosperity (1970)*। অর্থবাদী-কেইনসীয় যুক্তির উদাহরণ হলো Milton Friedman and Walter W. Heller, *Monetary vs. Fiscal Policy : A Dialogue* (1969), যেখানে এই দুই লেখকের মধ্যে একটি বিতর্ক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেইন্‌স্-পরবর্তী সংশ্লেষণের সামাজিক দর্শন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঠাণ্ডা যুদ্ধ কৌশলের সাথে তার সম্পর্কের উপর সবচেয়ে ভাল আলোচনা সম্ভবতঃ Eugene V. Rostow, *Planning for Freedom (1959)*, যে গ্রন্থে 'পরিকল্পনা'কে কেইন্‌সীয় অর্থনৈতিক নীতির এবং স্বাধীনতা'কে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক অর্থনীতির লক্ষণ বলে ধরা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত সুরের এবং দরকারী আলোচনা হলো Harry Magdoff, *The Age of Imperialism: The Economics of U.S. Foreign Policy* (1969) অথবা Seymour Melman, *The Permanent War Economy* (1976)। Richard J. Barnet and Ronald E. Mueller রচিত *Gobal Reach: The Power of the Multinational Corporation* (1975) গ্রন্থটি বহুজাতিক কর্পোরেশন সম্পর্কে তীব্র সমালোচনামূলক, কিন্তু এতে দেশের অভ্যন্তরের এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর প্রভাব সম্পর্কিত যে-গভীর আলোচনা রয়েছে তা অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থেই দেখা যাবে।

প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা খাদ্য, সম্পদ আর পরিবেশ দূষণ, এগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের উপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে *Growth and Its Implications for the Future*, Part I, Hearings, Subcommittee on Fisheries and Wildlife, US House of

www.pathagar.com

Representatives (1973) নামক প্রকাশনীতে। আর একটি বই পুরনো হলেও সম্প্রতি নতুন যৌক্তিকতা পেয়েছে, K.William Kapp, *The Social Costs of Private Enterprise* (1950)। Lester R. Brown. *In the Human Interest : A Strategy to Stabilize World Population* (1974) গ্রন্থটিতে জনসংখ্যা সমস্যার একটি সুন্দর আলোচনা আছে। পরিবর্তনহীন অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Herman E. Daly, ed., *Toward a Steady-State Economy* (1973) এবং Mancur Olson and Hans H. Landsberg, eds., *The No-Growth Society* (1973)। বর্তমান গ্রন্থের ভিতরে উল্লিখিত দু'টি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হলো, Robert L. Heilbroner, *An Inquiry into the Human Prospect* (1975) এবং E. L. Schumacher, *Small is Beautiful* (1973), যেখানে ঐ বৃহত্তর সমস্যাগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য আলোচিত হয়েছে; অপরদিকে Nicholas Georgescu Roegen, *The Entrophy Law and the Economic Process* (1971) গ্রন্থটি ক্রমশঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পদার্থগত সীমাবদ্ধতার বিষয়ে একটি অপরিহার্য অবদান বলে বিবেচিত হচ্ছে।

কেইনস্ পরবর্তী অর্থনীতির সাহিত্য ক্রমবর্ধমান কিন্তু অর্থনীতিবিদ নয় এমন লোকদের সহজে বুঝবার মত একমাত্র গ্রন্থ হলো Alfred S. Eichner (ed.) , *A Guide to Post Keynesian Economics* (1978)। এছাড়া Michael Kalecki, *Essays in the Theory of Economic Fluctuations* (1939) এবং Piero Sraffa, *Production of Commodities by Means of Commodities* (1960), এবং Joan Robinson-এর প্রবন্ধ, 'The Production Function and the Theory of Capital' (1953) এগুলো হলো শুধু পেশাদারদের বোধগম্য রচনা, আর মূলধন বিতর্কের উপর লেখা দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো, Geoffrey C. Harcourt, *Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital* (1972) এবং Mark Blaug, *The Cambridge Revolution : Success or Failure ?* (1974)। কেইনস্ পরবর্তী মার্কিন চিন্তাধারার উদাহরণ হলো Sidney Weintraub, *Capitalism's Inflation and Unemployment Cirsis* (1978), Paul Davidson, *Money*

www.pathagar.com

and the Real World (2nd ed, 1978), এবং Alfred এবং Alfred S. Eichner, *The Megacorp and Oligopoly* (1976)।

নয়া রক্ষণশীলতা সম্পর্কে কোন একক পাঠ্যগ্রন্থ নেই। অত্যন্ত জনপ্রিয় করে লেখা একটি বই, Milton and Rose Friedman, *Free to Chose : A Personal Statement* (1980), বইটিতে অর্থনীতি অপেক্ষা মতবাদ আর কর্মনীতিই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

স্বাভাবিক সুদের হার বিষয়ক অনুমানের প্রসঙ্গে একটি ভাল আলোচানা পাওয়া যাবে, Milton Friedman, "Nobel Lecture: Inflation and Unemloyment", Journal of Political Economy. Vol. 85 (June 1977), pp 451-472, বিশেষভাবে pp, 456-459।

নয়া রক্ষণশীলরা যে 'বেকারত্ব আর মজুরী হারের মধ্যে দেয়া-নেয়ার' প্রসঙ্গকে 'বেকারত্ব আর দ্রব্যমূল্যের মধ্যে বিনিময়ে' রূপান্তরিত করেছে, সেই বিষয়ের উপর একটি প্রারম্ভিক রচনা হলো W.A. Phillips, "The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the U.K. 1861-1967," *Economica,* Vol. 25 (Nov. 1958). 283-299। 'যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশার তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে Thomas J. Sargent and Neil Wallace, "Rational Expectations and the Theory of Economic Policy", *Journal of Monetary Economics,* Vol. 2 (April,1976), pp. 169-183 প্রবন্ধে। পেশাভিত্তিক পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলো অবশ্যই অত্যন্ত নির্বাচিত পাঠকসমাজের বোধ্য এবং তা সাধারণ পাঠকের জন্য নয়।

সবশেষে, আমার নিজের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করবো যেখানে, এই ধারণার পূর্ণ আলোচনা আছে, যে বৃহৎ-ব্যবসা আর বৃহৎ-সরকারের মধ্যে দৃশ্যত একটা সংঘাত থাকলেও অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ক্ষমতার ঐ দুই কেন্দ্রের মধ্যে যে একটা মৈত্রী গড়ে উঠছে, তার ফলে আমরা 'যৌথ-রাষ্ট্রে'র স্বৈরাচারের (authoritarianism) দিকে এগিয়ে চলেছি ঃ Daniel R. Fusfeld, "The Rise of the Corporate State in America," *Journal of Economic Issues,* March 1972।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com